ASRUKANA DEVI.

দ্বিতীয় পর্ব্ব—মরণোত্তর

জ্যোতি-প্রকাশালয়
২০৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশিকা—শ্রীশেফালিকা ঘোষ
ভারত বুক এজেন্সি
২০৬, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রচনা সমাপ্তি
রাত্রিশেষ
১৪ই আগষ্ট, ১৯৪৬

প্রচ্ছদপট-শিল্পী—শ্রীপ্রভাত কর্মকার

মূল্য : চারি টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীকার্তিকচন্দ্র দে
নিউ মদন প্রেস
৯৫, বেচু চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯
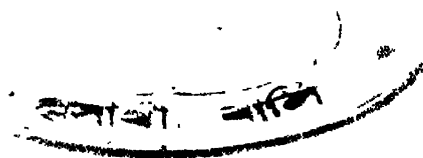
অগ্রজা—

শ্রীমতী পরমেশ্বরী দেবী

শ্রীচরণকমলেষু—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ—(মন্বন্তর) ১ম পর্ব্ব ; ২য় সংস্করণ

হে মোর দুর্ভাগা দেশ—(মরণোত্তর) ২য় পর্ব্ব

হে মোর দুর্ভাগা দেশ—(মৃত্যুঞ্জয়) ৩য় পর্ব্ব

(ইং ১৯৪৮, জুন মাসে বাহির হইবে)

লেখকের অন্যান্য বই

জ্যোতির্গময়—৪৲

চিতাবহ্নিমান—৩৷৹

জীবন-রুদ্র—৩৷৹

ওঁ রাত্রিরূপা বিশ্ব-প্রসূতি নমস্তে ॥

কালরাত্রি, মহারাত্রি, মোহরাত্রি নিরন্ধ্র অন্ধকারের নৈঃশব্দ্যে বেপমানা —সৃজনবেদনার অনিবার্য্যতায় অশান্ত; ইতিহাসের অবিস্মরণীয় অধ্যায় থেকে আজকার মৃত্যুময় বর্ত্তমানের কঠোর ভূমিতে অভিব্যক্ত; অনাগত ভবিষ্যের বলিষ্ঠ সম্ভাবনার সংকেতে আনন্দ-চঞ্চল;—রাত্রি-মাতার তিমির-গর্ভ বিদীর্ণ করে জীবনান্দকর জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য প্রসূত হবেন; প্রসূতি রাত্রি-জননী তাই মৃত্যুর হিম-শীতল অঙ্গে জীবনের চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলেছেন ...মরণোত্তর সেই জীবনের মহিমময় প্রকাশ উষার অবির্ভাবাবেশে আরক্ত হয়ে উঠছে দিকে দিকে...।

গাঢ় উজ্জল শোণিতাভা,—রক্তচঞ্চল জীবনাগ্নি, মৃত্যুপথকে অবহেলে অতিক্রম করবার জন্য প্রলয়ঙ্কর বিজয়োল্লাস...রাত্রিমাতার ক্রোড়দেশ আচ্ছন্ন করে ছিল, প্লাবিত করেছিল মাতঃ ধরিত্রীর সর্ব্ব অঙ্গ—পরিপূর্ণ করেছিল আকাশের অন্ধকার-কলঙ্কিত বক্ষস্থল ...।

যুগ-প্রসবিত্রী রাত্রিজননী বেদনার্ত্তা, কিন্তু সন্তানের আগমন-সংকেতে সর্ব্বাঙ্গে তাঁর আনন্দ-দ্যোতনা;—মন্বন্তরে মৃত, মারীভয়ে ভীত, মহারণে ক্ষত-বিক্ষত যুগ-পূর্ব্বের দুইশত কোটি সন্তানের শ্মশানে বসে তিনি মরণোত্তর সন্তানের জন্মমন্ত্র জপ করছিলেন...আজ সেই সন্তান আসছে...মরণোত্তর পৃথিবীর পরিত্রাণায়।

মানুষের জগতকে মানুষ ধ্বংস করেছে—অমানুষ হ'য়ে ইতিহাসকে কলঙ্ক-মলিন করেছে—অতিমানুষ হ'য়ে মানুষের সাধ্যাতীত শক্তিকে আয়ত্ত করেছে তার ভ্রাতৃশ্মশানের চিতা রচনা করবার জন্য...মরণকে অতিক্রম করবার চেষ্টায় মরণকেই বরণ করেছে আপনার রাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং ব্যষ্টিক জীবনে...রাত্রি-জননী সন্তানের বাল্যলীলা দেখছিলেন। যুদ্ধশ্রান্ত, জীবনের অভিযানে বিড়ম্বিত, বিজয়লাভেও জয়গৌরবহীন সন্তান অর্জ্জুনের মত স্বজন হত্যার পাপের ভয়ে অবসন্নবৎ বলেছিল...ন কাঙ্খে বিজয়ং কৃষ্ণ... কিন্তু বিজয় সে লাভ করেছে...এখন রাজ্য পরিচালনের জন্য চাই তার শান্তি, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন, খাদ্য-পরিধেয়, প্রতিষ্ঠা; কিন্তু তারও পূর্ব্বে চাই এই কালরাত্রির কোলে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে বিশ্রাম করে নেওয়া।

সারা পৃথিবীর আজ সেই বিশ্রামের ক্ষণ; আলস্যে আর অবসন্নতায় আর্ত্ত পৃথিবীর মহামানুষের দল আজ নিজের শক্তির মত্ততায় মাতালের

মতই টলছে--অবিশ্বাসের অমানুষিকতায় অস্বীকার করছে আপনার জনের আত্মীয়তা; হিংসা, দ্বেষ আর দ্বন্দ্বের সন্দেহাতীত কদর্য্যতায় শান্তির ঘুম তাদের চোখের কোলে ক্রমাগত-দুঃস্বপ্ন দেখাচ্ছে—চমকে উঠছে মানুষ, ঐ বুঝি আবার কে এল ঘাতক, ঐ বুঝি কে লাগালো তার সুখের ঘরে আগুন!

ওদের মধ্যে অতিবুদ্ধিমান কেউ কেউ এই গভীর প্রলয়রাত্রির অন্ধকারের আশ্রয়ে অপরকে বন্দী করে নিজকে নিরাতঙ্ক করতে চায়—আণবিক শক্তির অগাধ ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ করতে চায় নিজের অপ্রশস্ত গৃহদুর্গ, অর্থনীতির বেড়াজালে অবরুদ্ধ করতে চায় অপরের অগ্রগতিপথ, কিম্বা, আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতাকে করতে চায় শৃঙ্খলিত। কেউবা অপরের গৃহে বিভেদ আর বিদ্বেষ জাগিয়ে আপনার শক্তিকে অটুট রাখতে চাইছে—আবার মধ্যস্থতার মঙ্গ আড়ম্বরে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে তাদের বিভেদ-বিদ্বেষ ঘুচিয়ে একাত্ম হবার ইচ্ছাকে। পৃথিবীর সেই কাল-রাত্রিক্ষণ বড় দীর্ঘ স্থায়ী।

কিন্তু সেই দীর্ঘ রাত্রিও শেষ হয়ে এলো। মরণোত্তর পৃথিবী জাগছে,—জাগছে জীবনের স্পন্দনে, গণচেতার চৈতন্যে, আত্ম বিলুপ্তির আতঙ্কে, অতিমানবতার আশঙ্কায়; রাত্রিমাতা নবচৈতন্য-যুগের সৃষ্টি করছেন, যে যুগে মানুষ শুধু মানুষই;—রাজনীতিতে আর সমাজনীতিতে,—আত্মীয়তায় আর আত্মরক্ষার চেষ্টায়, ইতিহাসের অনিবার্য্য পরিণতিতে জাগছে। সিন্ধু-শতদ্রু-বিপাসার সামমন্ত্রধ্বনি, গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্রের উপনিষদ-স্তোত্র, কৃষ্ণা, কাবেরী গোদাবরীর মধু-গীতিছন্দ, আগামী উষার স্তব-বন্দনায় উৎসারিত হয়ে উঠছে। শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য, বোধিসত্ত্বের সঙ্ঘ-শরণ্য, চন্দ্রগুপ্ত-অশোক-পৃথ্বিরাজের গণচৈতন্য আবার হয়তো জাগবে—তাই রাত্রিমাতার এই দুবার প্রসববেদনা—তাই শোণিতাপ্লুতা পৃথিবী—তাই খণ্ডিতা ভারতজননী! মরণোত্তর সেই শিশুর আবাহন সঙ্গীত বুঝি এই কালরাত্রি শেষের কুটিল রাজনীতিচক্রের আঘূর্ণনে, অভিমন্ত্রিত হবে,—উদ্ঘোষিত হবে, উৎসারিত হবে।

জীবনের জয়ধ্বনিতে মৃত্যুমালিন্য নিঃশেষে ক্ষয় করে দাও, হে রাত্রি, হে সূর্য্য প্রসবিত্রি, হে বিশ্বজননি, দীর্ঘ শত শতাব্দির নিদ্রাজড়িত আঁখিপাতে জেলে দাও বীর্যবত্তার হোমাগ্নি, কণ্ঠে দাও বিশ্বপ্রেমের সামমন্ত্র আর অন্তরে জাগ্রত রাখ মহা ঋষির অমোঘ বাণী..."নায়মাত্মা বলহানেন লভ্যঃ॥"

লোকাধীশ লেকচার দিচ্ছে ঃ শাস্ত্রী [illegible]

—অবসর-বিনোদনের জন্য রচিত গল্প সাহিত্য হলেও সৎ-সাহিত্য নয়; রহস্য-ঘন ঘটনার আবর্তে ভেসে যাওয়া রোমান্টিক সাহিত্য মানুষের মনকে উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে কদাচিৎ সক্ষম; প্যাসনের পঙ্কিল মৃত্তিকায় যে-সাহিত্যের জন্ম, সে-সাহিত্যে ক্ষয়-বীজাণু আছে, মানুষের মনকে সে-সাহিত্য ক্ষয়িষ্ণু করে। জীবনকে যাঁরা নিয়তির কালো কষ্টি পাথরে যাচাই করে নিতে জানেন—মনকে যাঁরা মানুষের শক্তিশালী মননশীলতায় লালন করতে চান—হৃদয়কে যাঁরা অনুভূতির অভিসার-পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান পরমানুভূতির স্বর্ণময় প্রকোষ্ঠে, সাহিত্য যেখানে সৎ, চিৎ, এবং আনন্দে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, সৎসাহিত্য তাঁদেরই জন্য এবং সত্যকার সাহিত্যিক তাঁদেরই জন্য তাঁর লেখনী ধারণ করবেন।

প্রকাণ্ড মাঠের মাধ্যে সমবেত লোকগুলি অধিকাংশই যুবক, কলেজের ছাত্র। একজন প্রশ্ন করলেন—এ রকম সৎসাহিত্যিক এদেশে কয়জন জন্মেছেন?

—অনেক এবং আরো অনেকেই জন্মাবেন। পাঠক যদি তৈরী হন তাহলে সাহিত্য-পরিবেশককে আসতেই হবে। আপনারা পাঠক, আপনারা দাবী করুন, অসৎ সাহিত্যকে নির্মম ভাবে নির্বাসিত করুন আপনাদের গ্রন্থাগার থেকে, আপনারা চান যে-সাহিত্য জীবনকে উন্নত করতে না পারবে, যে সাহিত্য মানুষের পথ-প্রদর্শক না হবে, যে-সাহিত্য মানুষের মনে আশা এবং উদ্দীপনার সৃষ্টি না করবে—আমাদের বর্তমান জীবনে তার ঠাঁই নেই। অবশ্য একথা মনে রাখতেই হবে যে সাহিত্যের মূল কথা হোল রস। রসে পরিণত না হ'লে সাহিত্য আর সাহিত্য থাকে না, কিন্তু সেই রসের ভেতর দিয়েই জাতীয় জীবনের পুষ্টির খোরাক যোগাতে হবে—জাতীয় জীবনের গ্লানিকে দূরীভূত করতে হবে, জাতিকে দৃঢ়পদে অগ্রগামী হতে সাহায্য করতে হবে।

—সাহিত্যের ভেতর দিয়েই জাতীয় উন্নতি হতে পারে, এই কথাই আপনি বলছেন ?

—জাতীয় উন্নতি বিধানের আরো বহুবিধ উপায় আছে, কিন্তু সাহিত্য জাতির জীবনীশক্তি—জাতির প্রাণশক্তি। কোনো একটা ইন্দ্রিয়, যেমন চোখ বা কাণ নষ্ট হলেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে—কিন্তু প্রাণ চলে গেলে দশটা ইন্দ্রিয়ের সবকয়টা থেকেও তার কোন কাজ হয় না। তাই বলছি সাহিত্যকে, সৎসাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে জাতি কখনো মরে না—মরতে পারে না, মরে গেলেও তার প্রাণশক্তি অনাগত সহস্রাব্দ বেঁচে থাকবে তার সাহিত্যের মধ্যে। বৈদিক যুগ তাই আজো বেঁচে আছে বৈদিক সাহিত্যে—উপনিষদের বিরাট সাহিত্যে এখনো আমরা সেই যুগের প্রাণধারার সন্ধান পাচ্ছি—বৌদ্ধ যুগের বিশ্ববিজয়ী সাহিত্য আজও বৌদ্ধ-জীবনকে সঞ্জীবিত রেখেছে। সাহিত্যের মধ্যে যে সঞ্জীবনী শক্তি আছে তা মৃতকল্প জাতিকে আবার নবযৌবন দিতে সমর্থ; সে রস অমৃত রস। সে-রস জাতীয় জীবনকে দৃপ্ত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে এগিয়ে নিয়ে যাবে আলোকের পথে, যে-পথ মনুষ্যত্বের পথ, ভূমার পথ—চিরশরণের পথ।

—সাহিত্যের আদর্শ দিনে দিনে বদলায়। আজকার সাহিত্য একশো বছর পরে হয়তো কেউ পড়বে না। তখন নতুন যুগের নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হবে।

—সাহিত্য রস-স্বরূপ। তার আদর্শ চিরকালই রসের প্রকাশ করা, পরিবেশ করা; নতুন যুগে সেই রস নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকাশিত হবে, এইমাত্র প্রভেদ; সৎসাহিত্য কোনোদিনই মরে না, তার প্রমাণ প্রাচীন সৎসাহিত্যে আমরা নিত্যই পাচ্ছি। সাহিত্য জীবনকে যে আলোক দান করে, যে রসে সঞ্জীবিত করে—যে-সঙ্গীতে অনুপ্রাণিত, উদ্দীপ্ত করে, তা চিরদিনই সমান। মানুষের জীবনাদর্শ বদলায়, আজকার বিধান কাল হয়তো অকেজো হয়ে যায়, কিন্তু হৃদয়ানুভূতির পরিবর্ত্তন হয় সামান্যই। তাই

যে-সাহিত্য হৃদয়কে রসে পরিপ্লুত করতে পারে, তার ক্ষয় নাই, সে অমৃত, এবং অমর।—লোকাধীশ দৃঢ়-গম্ভীর স্বরে বললো।

ওঁরা আর কিছু তর্ক তুললেন না। লোকাধীশ একজন সাহিত্যিক এবং বর্ত্তমানে তার দুএকখানা বই বাজারে বেশ নাম করেছে। বাংলায় সাহিত্যের আদর চিরদিনই, কিন্তু সাহিত্যিককে বাংলার অধিবাসীরা বড়ই কৃপার চক্ষে দেখে থাকেন। অধুনা সেই মনোবৃত্তির কিঞ্চিত পরিবর্ত্তন হয়েছে—লোকাধীশের বক্তৃতা শুনতে এতগুলি যুবকের মাঠের মধ্যে এসে দাঁড়ানো তার প্রমাণ। ওঁরা লোকাধীশকে সাদর আহ্বান করেছেন। পুষ্পমাল্য দিয়েছেন এবং সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁর কথাও শুনছেন। তর্কের মধ্যে কোনো কিছুর মীমাংসা হওয়া দুষ্কর, তাই লোকাধীশকে ওঁরা বলে যেতে বললেন। ওর বক্তব্যের প্রায় সবই শেষ হয়েছে, শুধু বাকি দুটো কথা, বললো,—জাতিকে জীবিত রাখতে হবে সাহিত্যের মধ্যে, এবং সাহিত্যকেও জীবিত রাখতে হবে জাতির মধ্যে! এরা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধযুক্ত। একের অভাবে অন্যের টিকে থাকা অসম্ভব। তাই আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি, আপনারা সৎসাহিত্য প্রচারে আমাকে সাহায্য করুন। যে-সাহিত্য বজ্রগর্জ্জনে জাতিকে জানিয়ে দেবে তার দুঃখের কথা, তার দুর্ভাগ্যের আশঙ্কা, তার নীতির ভ্রান্তি, তার সমাজের গ্লানি, তার জীবনের ক্ষয়শীলতা,—যে সাহিত্য জাতিকে রুদ্রমন্ত্রে দীক্ষা দেবে, জীবনকে চির-যৌবনের শক্তিতে অপরাহত রাখবে—মনকে মনুষ্যত্বের উন্নততর স্তরে উঠিয়ে নিয়ে যাবে—মানুষে মানুষে ঐক্য-বন্ধনের মিলনরাখি বেঁধে দেবে—সেই সাহিত্য সৃষ্টি করান; এই দুর্ভাগা দেশ দুর্ভাগ্যের অন্ধতমসায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে—এর সাংস্কৃতিক চেতনা আজ বিলুপ্ত প্রায়, পরশাসনে এ দেশ প্রায় পঙ্ককুণ্ডের মত আবিল হয়ে উঠেছে—পরদেশের, পরনীতির, পরসমাজের দৃষ্টান্তমুগ্ধ এই হতভাগ্য দেশ আজ মুমূর্ষু! একে জাগিয়ে তুলতে সর্ব্বাগ্রে সচেষ্ট হয়েছে এদেশের সাহিত্যিক। বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্র-শরৎ একথা ভাল করেই

বুঝেছিলেন, তাই বন্দেমাতরমের আবির্ভাব,—তাই "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ঈশ্বর"—তাই "জনগণমন অধিনায়ককে" আমরা লাভ করেছি। ওঁদের পথকেই আমরা অনুসরণ করবো।

সভা ভঙ্গ হলে ওঁরা লোকাধীশকে নিয়ে গেলেন ঘরোয়া আলোচনা করবার জন্য। ওর সঙ্গে একটি মেয়ে—কৃষ্ণা! সে কিছু বলে নি: এতক্ষণে শুধু একটি কথা বললো,

—এ দেশের বিশ্ববিজয়ী যৌবন শক্তি শৃঙ্খলিত, তোমরা একে মুক্ত করো ভাই সব, জন্মভূমি তবেই মুক্তি পাবে।

ওর কথাটাকে জোরালো করবার জন্য লোকাধীশ বললো—যৌবন শুধু শৃঙ্খলিত নয়, যৌবন আজ বিকৃত, বিপথগামী; শৃঙ্খলের বেদনা সে অনুভব করে কিন্তু সুনির্দ্দিষ্ট পন্থায় তার বন্ধনমুক্তির চেষ্টা সে করতে পারেনা। সে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে তো উঠছেই, আত্মপ্রত্যয় সে হারাচ্ছে—আপনার সব-ভালোটুকু বিসর্জ্জন দিয়ে সে পরের মতো করে নিজকে গড়তে চাইছে। —এই "ভয়াবহ পরধর্ম্ম" তার আত্মনাশের হেতু! পরধর্ম্ম অর্থাৎ পরের দেশের আচার-বিচার-ব্যবহার সম্মত করে নিজকে গড়তে যাওয়া। ঋষি বলেছেন:—"নিজেদের পুরোপুরি ইউরোপীয় করে গড়তে পারলে আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি, আমাদের যুগ-মার্জ্জিত বুদ্ধি এবং আমাদের সহনশীলতার সঙ্গে আমাদের আত্মশোধনের ও আত্মসংগঠনের প্রয়াস চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়ে যেতে পারতো; কিন্তু তা হতে পারলোনা; জীবনের স্পন্দন এখনো আমাদের সর্ব্বদেহে; পাঞ্জাবের ধর্ম্ম আন্দোলন, মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক চেতনা এবং বাঙ্গলার নব জাগ্রত সাহিত্য-চেতনা তার মূর্ত্ত প্রকাশ। কিন্তু…যতদিন জাতির বুদ্ধি এবং নিষ্ঠা জাতির ধর্ম্ম সাধনার অনুকূল না হবে, ততদিন ভারতের মুক্তি সুদূরপরাহত!"—এই জাতীয় ধর্ম্মসাধনার পথেই জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সাহিত্যের মধ্যে।

—ধর্ম্ম বলতে আপনি কি বোঝাতে চান? জনৈক যুবক প্রশ্ন করলো!

—ধর্ম্ম কোশাকুশি বা ফুলচন্দনে আবদ্ধ নেই। মূর্ত্তি গড়ে সার্ব্বজনীন পূজার ঢাকঢোলেও তা থাকা সম্ভব নয়। প্রত্যেক মানুষের প্রাণশক্তি যে শক্তিতে ধৃত থাকে—প্রত্যেক জাতির জাতীয়তা যে বৈশিষ্ট্যে সংহত থাকে, প্রত্যেক দেশের দেশাত্মবোধ যে অমূর্ত্ত সংস্কৃতিতে সচেতন থাকে—তাই হল সেই মানুষের, সেই জাতির এবং সেই দেশের ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম বনে গিয়ে গেরুয়া পরা বা মন্দিরে গিয়ে আরতি করা ধর্ম্ম নয়! এ ধর্ম্ম জীবন-ধর্ম্ম, মানব-ধর্ম্ম।

কৃষ্ণা ওর কথাটায় কথা যোগ করে বললো,—জীবনকে ধারণ, পোষণ এবং রক্ষা করার জন্য যা প্রয়োজন, তাই আমাদের ধর্ম্ম—অবশ্য সেই ধারণ, পোষণ এবং রক্ষণকার্য্য মানবত্বের বিরোধী না হয়, কারণ মূলতঃ আমরা মানুষ।

লোকাধীশ গলায় আরো জোর দিয়ে ওদের বললো আবার,—আজকার বাংলা বিবেকানন্দের বাংলা। শ্রীভগবান রামকৃষ্ণের সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়কারী সাম্য, মৈত্রী আর শান্তির বাণী প্রচার করে সেই বীর সন্ন্যাসী আমাদের বলে গেলেন, 'তোমার জাতির বিশিষ্ট ধর্ম্মভাবটিকে জাগিয়ে তোলো, যেখানে ছোট বড়, উন্নত অবনত সকলেই সাধারণ মনুষ্যত্বের মহান মন্দির-তলে এসে দাঁড়াবে।" মানুষের মধ্যে জীবনের স্পন্দন, আত্মসম্মানের আভিজাত্য এবং দেশাত্মবোধের দুর্জ্জয় বীর্য জাগিয়ে তুলতে হবে—তবে হবে জাতির উদ্ধার, ভারতের মুক্তি, মানুষের শান্তি-সম্মিলন।

যুবকের দল ওদের নিয়ে গিয়ে একটা ছোট হলঘরে বসালো! লোকাধীশ তার নবরচিত—"মৃৎপুত্তলী" বইখানা ওদের দিল। বইটি ছোট কিন্তু এতে সে লিখেছে, মানুষের জীবন আজ কিভাবে মাটির পুতুলের মত অসাহয়তার আবর্ত্তে নেমেছে। ধ্বংশ আজ কিভাবে সৃষ্টিকে পরাহত করছে; পালন-শক্তি আজ কি কদর্যতার মধ্যে অপ-পালকের হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছে। ওর ভাষা গুরুগম্ভীর, ওর কথনভঙ্গী অত্যন্ত জোরালো এবং ওর দৃষ্টিভঙ্গী অতি তীক্ষ্ম, অগ্নিক্ষরা দৃষ্টি!—কারো খাতিরে সে কিছু লেখেনা—

কোনো কিছুর প্রত্যাশায় সে লেখে না—কোনো দলের স্বার্থের জন্যও সে লেখে না। সে লেখে জীবনের অনুভূত সত্য—জীবনায়নের বেদবাণী,—তাই বইখানি যথেষ্ট আদৃত হয়েছে সুধী সমাজে; আবার অনাদৃতও হয়েছে বহু ব্যক্তির কাছে। দু' একজন লোকাধীশকে পত্র লিখে গালাগাল দিয়েছে পর্য্যন্ত। বাংলাদেশের অতি উৎসাহী অনেক পাঠক সুযোগ পেলেই এক হাত দেখে নিতে চায়। সাহিত্য বিচার করতে বসে তারা রসের বিচার করে না, করে অশ্লিলতার বিচার—আর খোঁজে কোন্ সুযোগে লেখক-ব্যাচারাকে দুটো গালাগাল দিয়ে কলম-কণ্ডুতি নিবারণ হবে। অবশ্য আজকাল এরকম ভাবটা কমে আসছে। বাংলার পাঠক আজ সাহিত্য-বিচার করতে চাইছেন এবং করছেনও কিন্তু এখনো বহু ব্যক্তি আছেন, যাঁরা—বিশখানা বইএর লেখকের একখানা মাত্র বই পড়ে কিম্বা কিছু না পড়েই তাঁর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে চান।—কিন্তু এ সব কথা বলে কোনো লাভ নেই। জাতির চরিত্র যতদিন সবল এবং সুস্থ না হবে, ততদিন এরকম চলবে। ব্যষ্টিগতভাবে যতদিন না আমরা আত্ম-চেতনক্ষম হব—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে যতদিন না আমরা প্রতিষ্ঠিত হব—স্বচিন্তায় আমরা যতদিন না চিন্তিত হব, ততদিন এরকম চলবে। মহাকবি কালিদাস বলেছিলেন—

সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরং ভজন্তে।
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয় বুদ্ধিঃ॥

পরের মুখে ঝাল খাওয়া স্বভাবের লোক অনেক বেশি, তাই কবি ভবভূতি বহু দুঃখেই লিখেছিলেন—

উৎপৎস্যতেহস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মাঃ।
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বি॥

তথাপি সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে, তথাপি মানুষকে বোঝাতে হবে, সাহিত্যই জাতীয় জীবনে শোণিতস্রোত প্রবাহিত রাখে; সাহিত্যিকের স্থান দেশনেতাদের পুরোভাগেই হওয়া উচিৎ—অবশ্য সৎ-সাহিত্যিকের।

লোকাধীশ যখন এই সব কথা বলছিল সেই হলঘরে চা খেতে খেতে তখন অকস্মাৎ কে একজন কোণ থেকে বলে উঠলো,

—আপনাকেই তাহলে রাষ্ট্রনেতার জায়গায় বসিয়ে দেওয়া যাক, কেমন ?

—সাহিত্যিক তো কোনো জায়গায় বসতে চায় না, সে চায় শুধু বলে যেতে তার অন্তরের কথাগুলি—শুধু তার জীবনের উপলব্ধ সত্যগুলিই সে প্রকাশ করে।

—বেশ তো, তাই করবেন দিল্লীতে গিয়ে !

বিদ্রূপ। এতক্ষণে ভালোকরে বুঝলো লোকাধীশ ! এর পর হয়তো লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু লোকাধীশ ভয় পাবার লোক নয়। তবু তার দুঃখ হোল, দুঃখ হোল এই জন্য যে এত পরিশ্রম করে এমন ভাবে সাহিত্য-সৃষ্টি, না খেয়ে না ঘুমিয়ে দেশের মানুষের জন্য এই সাধনা—সব যেন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে এদের কাছে ! এরা তরুণ, এরা যৌবন-চঞ্চল জীবনকণা, এরাই জাতির ভবিষ্যৎ ভরসা, অথচ এদের মেরুদণ্ড যেন বাঁকা হয়ে গেছে ! অপুষ্টিকর ইউরোপীয় সাহিত্য আর ঐ ইউরোপেরই বিকৃতি জীবন-আদর্শ এদের মনের কাছে সবসময় ধরা হয় ! ইউরোপের ভালো পুষ্টিকর—প্রগতিময় আদর্শগুলি যেন এদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে—কিন্তু এর একমাত্র প্রতিকার রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা।

নীরবে জলযোগ শেষ করে লোকাধীশ ওদের ধন্যবাদ দিয়ে শুধু বললো,—পুষ্পমাল্য পরবার জন্য আমি সাহিত্যচর্চা করিনে, সভাপতিত্ব করে বাণী শোনাবার ইচ্ছাও আমার নেই—আমার সাধনা নীরব-প্রায়ান্ধকার গৃহকোণেই নিবদ্ধ থাকা উচিৎ—কিন্তু আমার সাধনা আমার জন্য নয়—আমার দেশের জন্যই। বড় দুঃখিত হলেন যে আমি ব্যর্থ হচ্ছি, আমার সাধনা সিদ্ধির পথে যাচ্ছে না। কিন্তু আপনাদের দুঃখের কারণ কিছু নেই। অসংখ্য সাহিত্যিক এই পথেই আসছেন। জাতিকে তাঁরা অনন্ত শক্তিতে শক্তিমান করবেন :—আমার সাধনা ব্যর্থ হবার সমস্ত দুঃখ একা আমারই থাক—নমস্কার।

কৃষ্ণাকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল ; অন্ধকার রাত্রি।

স্বাহা তার সাড়ে তিন বছরের ছেলেটাকে সামলাতে পারছে না। কী ভীষণ দামাল যে ও হয়েছে! ওর কাকার কাছেই যা একটু শান্ত থাকে; কিন্তু কাকা আজ চার-পাঁচ দিন গেছে সহরে,—কবে ফিরবে, কিছু ঠিক নাই।

উঠোনের এক কোণায় তুলসীমঞ্চ;—সেখানে গত সন্ধ্যায় জ্বালা মৃৎপ্রদীপটি খোকা গিয়ে ধরলো—নিবন্ত প্রদীপের কালিটুকু মুখে-গালে লেপে নিল—কী চমৎকার যে ওকে দেখাচ্ছে সেই অবস্থায়! যেন আস্ত হনুমান।

—লঙ্কা-দাহন করে এলি নাকি রে হনুমান?

স্বাহা ঘরের কোণ থেকে উঁকি দিয়ে দেখলো, সেঁজুতি। হাতে ফুলের সাজি,—সেটা নামিয়ে রেখে খোকাকে কোলে নিচ্ছে। সেঁজুতির কাছেও খোকা ভালই থাকে—তাই বললো—হনুকে একবার নিয়ে যা তো ভাই।

—কেন বৌদি, খুবই জ্বালাচ্ছে নাকি?

—জ্বালাচ্ছে! ঘর সংসার জ্বালিয়ে দিল

—তা হনুমান তো লঙ্কা পোড়াতেই জন্মায় বৌদি।

তাই বুঝি ঘর পুড়িয়ে অভ্যেস করে নিচ্ছে? স্বাহা হেসেই বললো।

—পোড়াক্! জীবনকে অগ্নিশুদ্ধ করে রাখতে পারলে তবে তো ও অগ্নিহোত্রী।

স্বাহা কথাটার জবাব দিল না, ঘরের কাজ করতে লাগলো হাসিমুখে। সেঁজুতি খোকাকে কোলে তুলে, কাঁধে চড়িয়ে, আকাশের পানে ছুঁড়ে লুফে নিয়ে খেলা করতে লাগলো। ছেলেটা মহানন্দে হাসছে। সেঁজুতি বলল:

—অত হাসছিস কেন রে হনুমান? সীতাকে চুরি করে নিয়ে গেছে; এখনো উদ্ধার হোল না—আর তুই কিনা হাস্‌ছিস্?

—কে সীতা? কোন্ সীতা?—পিছনে বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন শুনে সেঁজুতি তাকিয়ে দেখলো সুবোধবাবু; এই গ্রামের নবীন জমিদার এবং এই পরিবারের সঙ্গে জ্ঞাতিত্বে সম্পর্কিত।

—সীতা, আর্য্য-সংস্কৃতির বাহিকা,—জানো না সুবোধদা? সীতা কৃষি লক্ষ্মী, কলা-লক্ষ্মী, কূল-লক্ষ্মী; তাকে যে অনার্যরা হরণ করেছে!

—সে তো ত্রেতাযুগের কথা রে ?—সুবোধ হেসেই বললো !

—নাঃ ! এই যুগেরই কথা ! তুমি যে অনার্য্যদের হাতে বন্দী, তাই জানো না। বলেই সেঁজুতি ওর মুখের পানে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকালো। যুবক সুবোধ এই অসামান্যা সুন্দরী তরুণীর ব্যঙ্গ সইতে কষ্টবোধ করছে, তীক্ষ্ণ স্বরেই বললো—আমি বন্দী—তোরা সব মুক্ত আছিস তো ? তাহলেই সীতার উদ্ধার হবে !

—হবে ; তবে দেরী হবে সুবোধদা ! কারণ তোমাদের মতন দেবতা আর অপদেবতারা রাবণকে সাহায্য করছে ! ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য সনদ পাওয়ার পর থেকে রাজত্ব পাওয়া পর্য্যন্ত সময়টা আমাদের সীতাকে চুরি করবার পরামর্শ দিয়ে, তোমরাই সাহায্য করেছ ওদেরকে এই দেশটা শুধু শাসন করতে নয়, সকল রকমে শোষণ করতে। ওরা কৃষিকে উৎখাত করেছে, শিল্পকে ধ্বংস করেছে—আর ওদেরকে সাহায্য করেছ এইসব কাজে তোমরাই। এখনো করছো। তোমরা শুধু অপদেবতা নও, তোমরা উপসর্গ-বিসর্গ !

হিঃ হিঃ হিঃ—হেসে উঠলো সেঁজুতি ! হাসি ওর কারণে অকারণে জাগে ! নূপুর বাজার মত মিষ্টি হাসি, তীক্ষ্ণ তির্য্যক হাসি,—মানুষকে বিভ্রান্ত করে দেয়। সুবোধ বেশ রেগেছে ভেতরে, কিন্তু স্বাহা ঘরের কাজ করতে করতে সেঁজুতির কথা শুনছিল, বাইরে বেরিয়ে এসে বললো—

—মানুষকে অকারণে এমন বিদ্রূপ করিস কেন সেঁজুতি ? ছিঃ—এসো ঠাকুরপো, কি মনে করে ভাই এতো সকালে ?—স্বাহা সাদর আহ্বান করলো।

—অকারণে নয় বৌদি, ইতিহাস খুলে আমি দেখিয়ে দিতে পারি—কোম্পানীর আমল থেকে এ পর্য্যন্ত এই দেশটার শাসন শোষণ করবার কাজে সাহায্য করেছে এই জমিদার শ্রেণী—সেঁজুতি বললো—আর জান বৌদি—তাঁতীকে তাঁত-ছাড়া করেছে, কামারকে হাতুড়ি-ছাড়া করেছে, কুমারকে চাকা-ছাড়া করেছে, জেলেকে জাল-ছাড়া করেছে এই এরাই ! এরাই কোম্পানীর

স্বার্থ আর নিজের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্ত নীলকুঠির অত্যাচার চালাতে সাহায্য করেছে, মানুষকে বৃত্তিহীন করতে প্ররোচিত করেছে, কৃষককে ভূমিহীন করতে সাহায্য করেছে। এই সম্মানিত জমিদারী প্রথা দেশের সর্ব্বনাশ করেছে! দেশের সাংস্কৃতিক ভাঙনে ওরাই বিদেশীকে সাহায্য করে করে রাজাবাহাদুর, রায়বাহাদুর হয়েছে, পাক্‌দেওয়া পাক্‌ড়ী মাথায় পরে আর আচকানের আলখেল্লা গায়ে দিয়ে ওরাই সর্ব্বাগ্রে বিদেশীর দরবারে গিয়ে বসেছে। ওদের হাতে ন্যস্ত গণশক্তির বজ্রের ওরা নির্ম্মমভাবে, নির্লজ্জভাবে অপব্যবহার করেছে। ওদের উপর বিশ্বাস করে গরীব প্রজা আজ মরতে বসেছে, দেশ শ্মশান হতে বসেছে—সাতার সর্ব্বনাশ হতে বসেছে!

সেঁজুতি থামলো! ব্যাচারা সুবোধ হাঁ করে তাকিয়েছিল ওর দিকে। ওর কথাবলার ভঙ্গী অতিশয় তীক্ষ্ণ এবং অত্যন্ত মাধুর্য্যমাথা। ব্যঙ্গ এবং বিষ তাতে যতই থাক্, সে ভঙ্গী নিশ্চয় উপভোগ্য যে কোনো যুবকের চোখে। মেয়েটা যেন গাল-দিলেও-মিষ্টি-লাগে গোছের। স্বাহা মৃদু হেসে বললো—তোর কথাগুলোর বেশির ভাগ সত্যি হলেও সব সত্যি নয়। ওঁরা ভালোও বিস্তর করেছেন, কিন্তু তার জন্য একা সুবোধকে দায়ী করেছিস কেন?

—কারণ উনি আমাদের আত্মীয়, সেই-সত্যতার লজ্জাটা ঢাকতে পারছি না।

সেঁজুতি খোকাকে কোলে নিয়ে ওদিককার ফুলবাগানে চলে গেল। সুবোধ যেন রাগ আর অনুরাগ দুটোকেই সামলাবার জন্য হাসলো একটু, বললো, —ওর মেজাজটাই ঐ রকম বৌদি; যাক্‌গে—বড়দা কৈ?

ভোরেই বেরিয়েছেন। ফিরতে হয়তো দুপুর হবে। কেন?

—একটা কথা ছিল! আচ্ছা তোমাকেই বলে যাই, দাদাকে বুঝিয়ে বলো! চিরকাল তো আর জেলখেটে মানুষের চলে না বৌদি; তারপর ঐ যে সোনার মত ছেলে, ওর জন্যও তো ভাবতে হবে! তাই—সুবোধ একটু এগিয়ে এল স্বাহার দিকে; কেউ যেন শুনতে না পায় এমনি চাপা গলায় বললো—নদীর ওপারে একটা মিল্ করবার চেষ্টা করছি আমি; স্বদেশী শিল্প-সত্র বা ঐ রকম

একটা নাম দেব। বড়দাকে ঐ প্রতিষ্ঠানের মাথা অর্থাৎ ডিরেকটার করতে হবে ; ওঁকে কাজ কিছুই করতে হবে না, শুধু নামটা রাখবার অনুমতি দিন ; কারখানায় ওঁর শেয়ার—না-না—খোকার নামেই শেয়ারগুলো রাখা হবে ; বড়দার কোনো সম্পত্তি রাখা উচিৎ নয়, উনি যেমন কংগ্রেস-সেবক আছেন, তেমনি থাকবেন ! ওঁর নামে কোনো অংশ রাখা হবে না ; তোমার আর খোকার নামেই শো-দুই শেয়ার রেখে দেওয়া হবে ! তুমি ওঁকে বলে রেখো বৌদি—আমি সন্ধ্যায় আবার আসবো।

—কিন্তু আমাদের তো শেয়ার কিনবার টাকা নেই ঠাকুরপো !

—টাকা তো দরকার নাই। শুধু দাদার নামটা দিলেই হবে।

স্বাহা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হাসলো, বললো—বুঝেছি। তুমি ওঁকেও ধনিক শ্রেণীতে আনতে চাও ! না ঠাকুরপো, আমরা সবাই শ্রমিকই থাকতে চাই। মাফ্ করো !

সুবোধ একটুক্ষণ চুপ থেকে বললো,—তুমি ঠিক বুঝলে না বৌদি। আচ্ছা, আমি সন্ধ্যায় এলেই কথা হবে।—ও বেরিয়ে গেল।

"নটরাজের প্রলয়নাচন সুরু হয়েছে'

চলেছে জীবন-স্রোত মৃত্যুর মহোৎসবের মধ্যে ; মৃত্যুকে ওরা পরাহত করে জীবনের রথচক্র চালিত করবে—চমকিত করে দেবে মরণ-দেবতাকে।

চলমান জীবন কিন্তু অবিচলিত নিষ্ঠায় চলতে পারছে না। বিশাল বারিধির বক্ষে ওরা যেন মৃৎপুত্তলী—মরণ-সাগর এমনি করে ওদের গ্রাস করছে, গলিয়ে দিচ্ছে, মৃৎপঙ্কে মিলিয়ে দিচ্ছে, যেন জীবন ঐ সাগরের বুদ্‌বুদের চেয়েও ক্ষণস্থায়ী।"

—না—সুদৃঢ় কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করলেন সন্ন্যাসী—শ্রোতারা চমকে উঠলো আওয়াজে।

এই মৃত্যুকে পরাভূত করেও জীবন বেঁচে থাকবে—অটুট রাখবে তার চলমানতাকে।

—কিন্তু মানুষের মহাদুর্দ্দিন সুরু হয়েছে। জীবনকে বাঁচিয়ে রাখা দূরে থাক, জাগিয়ে রাখাই কঠিন। যেটুকু সময় সে বাঁচবে, সেই সময়টুকু অন্ততঃ সজ্ঞানে বেঁচে থাকা দরকার।

—সে অজ্ঞান হলেও ক্ষতি নাই; তার চিতাভস্মে সে পরবর্ত্তীকে রেখে যাবে—রেখে যাবে তার ঐতিহ্য, তার ব্যর্থতার গ্লানি, তার সাফল্যের গৌরব,—তার সাধনার শেষ লক্ষ্য—মনুষ্যত্ব! পরবর্ত্তী জীবন-স্রোত সেই লক্ষ্যের পানে এগিয়ে যাবে—মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হবে, সিদ্ধিলাভ করবে মনুষ্যজীবনে; মৃত্যু সেখানে মৃত্যুঞ্জয় মহাকাল; তার ক্ষয় নাই, লয় নাই; বিলয় নাই। তিনি প্রাণের প্রথম উদ্গাতা, তিনই প্রাণের সর্ব্বশেষ আশ্রয়! তিনি অবিনশ্বর।

শ্রোতারা আর তর্ক করতে চাইল না। জানে, তর্কে এঁকে পরাস্ত করা অসম্ভব এবং এঁর কথার প্রতিবাদে শিলায় শিলায় ঘর্ষণ জনিত অগ্নি উঠবে, দাবানল জ্বলে উঠবে, তাই ওরা নীরবে শুনে গেল।

ওদের সংখ্যা মাত্র দ্বাদশ জন। বক্তা একাই সেই সন্ন্যাসী। এই দ্বাদশ ব্যক্তি ওঁর কাছে সাধনার মন্ত্র নিয়েছে, 'মানুষের জীবনকে মনুষ্যত্বের পথে নিয়ে গিয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়ে দিতে হবে।'—ব্যাপারটা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে অত্যদ্ভুত কিন্তু বৈজ্ঞানিক। এ্যাটোম বোমের আবিষ্কার নিয়ে যখন সারা পৃথিবী মাথা ঘামাচ্ছে, মানুষের সমাজ-সংসার-সভ্যতা যখন মহাযুদ্ধের মারণাস্ত্রের আঘাতে মৃত্যুপথযাত্রী, ইনি সেই সময় আবির্ভূত হলেন। "সম্ভবামি যুগে যুগে" —কথাটা এই সন্ন্যাসীর আবির্ভাবে সত্য হয়ে উঠবে কি না জানা নেই, কিন্তু ওরা বিশ্বাস করে—ঐ দ্বাদশ শিষ্য!

সভাভঙ্গের পর ওরা যে-যার চলে গেল—রইলেন একা সেই সন্ন্যাসী। ঠিক সন্ন্যাসী ইনি নন—সাধন ভজন বা জপতপ নিয়ে ইনি কোন সময়ই কালহরণ করেন না। কি করেন, তাও বিশেষ জানা নেই,—শুধু এঁর বাহ্যিক বেশ

গৈরিকধারী সন্ন্যাসীর মত। জটা-শ্মশ্রু-গুম্ফে আচ্ছন্ন মুখ—কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমাল্য, নয়নে জ্যোতির্ম্ময়তা! পরিচয়,—

বিপ্লব-যুগের এক বরেণ্য সন্তান উনি,—মাতৃভূমির মুক্তি-সাধনা-যজ্ঞের একজন শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক; জীবনকে উনি কালাপানির পার থেকে ফিরিয়ে এনেছেন জাতির মুক্তিসাধনার সমিধ হবার জন্য! কিন্তু ওঁর মত এবং পথ এ যুগের অন্য সকলের থেকে পৃথক! ঠিক পৃথক বলা চলে না,—ওঁর মত এবং পথ কিঞ্চিৎ দুনিরীক্ষ্য, কিছুটা অবাস্তব বলে মনে হয় সাধারণ লোকের কাছে: তাই উনি সামান্য কয়েকজন শিষ্য-সহযাত্রী নিয়ে এই অসামান্য সাধনায় রত আছেন। যারা ওঁর মতে বিশ্বাসী নয়, ওঁর কর্ম্মচক্রে তাদের ঠাঁই হবে না। উনি নেতা, চালক, ওঁর বিরুদ্ধবাদীর এদলে থাকা চলে না।

নীচে থেকে উনি পাহাড়ের উপর উঠতে লাগলেন। সানুদেশের গভীর বনভূমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সন্ধ্যার অন্ধকারে। একটি গুহার কাছে এসে ডাকলেন- রামী-মা!

—যাই বাবা!—বলে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। গৈরিকবাসা তপস্বিনী। কালো রঙ, চোখ দুটি বড় বড় এবং অত্যন্ত উজ্জ্বল,—দেহের আভায় ওর আভ্যন্তরীণ মনঃশক্তির বিকাশ! কিন্তু মেয়েটি ধোপার মেয়ে। অকারণ অপযশ-কলঙ্ক ওকে নীড়ছাড়া করেছে। ও এসে আশ্রয় নিয়েছে এই সন্ন্যাসীর আশ্রমে। এখানে ওকে পৌঁছে দিয়ে গেছে ইন্দ্রজিত, ঐ সন্ন্যাসীর অনেক শিষ্য। সন্ন্যাসী ওকে এক মুহূর্ত্ত দেখলেন, তারপর বললেন—আমি কয়েকদিনের জন্য একবার বাইরে যাব মা; আট দশ দিন পরে ফিরবো: তোর একা থাকতে কি কষ্ট হবে?

—না বাবা, কষ্ট কি? তবে এই বনে একা থাকতে বড় ভয় করে!

—ভয় কিরে বেটি!—সাধু হাসলেন; সে হাসি মেঘের হাসির মত গম্ভীর।

—চোর-ডাকাতের ভয় না বাবা, বনশূয়োর, নেকড়ে বাঘ, হেঁড়োল, এই সবের ভয়; চোর ডাকাত আমার আর নিবে কি?

—কোনো ভয় নাই। সন্ধ্যার পর আর বেরুস না। আগুন জেলে দিবি গুহার সামনে। আচ্ছা, তোর ক'দিনের খাবার আছে মা? দিন দশ চলবে তো?

—না বাবা, কাল সকালেই খাবার নেই!

—চাল আমার ঘরে কিছু রয়েছে মা—আয়, তোকে দিই। ওতে তোর চার-পাঁচ দিন চলে যাবে। এর মধ্যে যদি আমাদের কেউ এসে পড়ে তো তার কাছে আবার চাল পাবি; আর যদি কেউ না আসে, তাহলে গ্রামেই যাস একদিন ভিক্ষা করতে—পারবি না?

—হাঁ, পারবো!

—আয়,—বলে সন্ন্যাসী ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। আরো অনেকখানি উঁচুতে তাঁর আশ্রম-গুহা। রামীর উঠতে কষ্ট হচ্ছে; সে হাঁফাচ্ছে। সন্ন্যাসী বললেন—তুই এখানেই দাঁড়িয়ে থাক—আমি এনে দিচ্ছি চালগুলো।

উনি চলে গেলেন উপরে। নির্জ্জন পর্ব্বত ভূমিতে রামী একা দাঁড়িয়ে। ওর গৃহজীবন আজ আরণ্যক জীবনে পরিণত হয়েছে। একদিন ওর বাবা-মা ছিল; স্বামীও ছিল,—ছিল সুখ এবং সৌভাগ্য। আজ সে সব স্মৃতি ওর মন থেকে প্রায় মুছে এসেছে, তবু যেন একান্ত একলা হলে সেই বিস্মৃত দিনের কথাগুলো জেগে ওঠে অন্তরের অন্তস্থলে। কিন্তু ওর আগেকার জীবন আরো সুন্দর, আরো বলিষ্ঠ এবং ঋজু! এ সত্য ওর অশিক্ষিত মন অনুভব করতে পারে, তাই এমন একাকীত্বের ভয়ঙ্কর আবেষ্টনেও রামী ভয় পেল না। আকাশের পানে তাকালো, বনভূমির দিকে চাইল, চেয়ে দেখলো নিজের অতীত জীবনের পানে; তারপর ভবিষ্যতের দিকে। ভবিষ্যৎ ওর কিছু নাই। ও কোন আশায় নিজকে বন্দী রাখে না আর। এই সন্ন্যাসী এবং তাঁর শিষ্যবৃন্দ এখন ওর সহায়-সম্পত্তি। তাদের সেবাই ওর জীবনের একমাত্র ব্রত। কিন্তু তারা সকলে কিসের জন্য ঘর-সংসার ছেড়ে এতদূরে এই বিজন পাহাড়ে আছে—কিসের শলা-পরামর্শ করে, কোন্ মহতোমহীয়ান সাধনায় তারা নিযুক্ত—রামী তার কিছুই

বোঝে না। রামীর চোখে এই সন্ন্যাসী এবং তাঁর শিষ্যবৃন্দই দেবতা।—একান্তে দাঁড়িয়ে সে বনভূমির বিশাল বিস্তারের পানে তাকিয়ে ভাবছিল—তার জীবন একটা মহৎ কাজের সেবাধিকার পেয়েছে, এইতেই সে ধন্য। ভগবান তাকে নিশ্চয় শ্রীচরণে ঠাঁই দেবেন—ভগবান,—যে ভগবান এই সন্ন্যাসীদের উপাস্য। কিন্তু সে ভগবান কে এবং কি, রামী কোনো দিন ঠিকমত জানতে পারে নি। "দেশ-ভগবান,—"জন্মভূমি-মাতা"—"জীবন-দেবতা" এসব কথা ওর কাছে একান্তই রহস্যময়।

সন্ন্যাসী ফিরে এলেন একটা চটের থলেতে দু' তিন সের চাল নিয়ে। থলেটা রামীর হাতে দিয়ে বললেন—কেউ যদি এসে শুধোয় যে এই পাহাড়ে তুমি একা কেন থাক—তাহলে কি বলবি রামী মা?

—বলবো যে—রামী মৃদু হেসে থেমে গেল, ঢোক্ গিল্লো—তারপর বললো, বলবো যে গাঁ থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে; না কি বলবো বাবা?

—হ্যাঁ, সত্যি কথাই বলিস মা! সত্যই সর্ব্বত্র জয়ী হয়। আচ্ছা, আমি চল্লাম।

রামী প্রণাম করলো। সন্ন্যাসী পাহাড়ের একটা সুঁড়ি পথ ধরে ধীরে ধীরে নেমে গেলেন। স্তব্ধ রাত্রি যেন অনন্তকালের জন্য থেমে গেছে। কবে শেষ হবে? কবে?...

দক্ষিণ ভারতের একটি গুহা। বিজন বন, আর বহু পুরাতন ললিতকলার স্মৃতি সম্বল করে দীর্ঘকাল যেন প্রতীক্ষা করছিল মানুষের আবির্ভাবের। বৌদ্ধ যুগের গুহা বলেই ঐতিহাসিক এস্থানকে চিহ্নিত করবেন; কিন্তু ঐ গুহা জানে, সে আরো অনেক, অনেক বেশী বৃদ্ধ! তার অঙ্গে অঙ্গে ক্ষোদিত আছে বৈদিকযুগের লিপি, ব্রাহ্মণগরিমার ইতিহাস,—বৌদ্ধযুগপূর্ব্ব গণ-আন্দোলন,

এবং পরবর্ত্তী বৌদ্ধযুগের শিল্প-কুশলতা, শ্রমণগণের থেরীগাথা, মহাস্থবীরের মহাবাণী। ভারতের ইতিহাসের অমর অবদান লুকিয়ে রয়েছে ঐ গুহার প্রতি প্রস্তরে। এই ইতিহাস আজ অনাবিষ্কৃত, গুপ্ত, কিন্তু একদিন সেই শুভ প্রভাত আসবে যেদিন সারা ভারতের শিলালিপি আর তাম্রশাসন জাতির গৌরবময় পুরাকথাকে জগতের চোখে জলন্ত করে তুলবে—ইন্দ্রজিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল।

কাল সে কোণার্ক মন্দির দেখে এসেছে—তার আগে গিয়েছিল শ্রীক্ষেত্রের মন্দির দেখতে। আজ এসেছে এখানে ; ওর সঙ্গে এক গুরুভাই।

—এখানে কি তোমার কাজ ইন্দ্রদা ?—গুরুভাই অজয় প্রশ্ন করলো !

—কাজ !—ইন্দ্রজিত নিজের চিন্তায় যেন ধাক্কা খেযে জেগে উঠলো ; বললো,—কাজ আমাদের সারা ভারতে, ভারতের বাইরেও, যাকে বহির্ভারত বলা হয়। আমাদের দেখাতে হবে যে ভারতীয় সভ্যতা কি ভাবে কত দূর দূর দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, সুমাত্রা, মালয়, কম্বোজ, চম্পু, কম্বোডিয়াতে ভারতের বেদপুরাণ কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল সেই সুপ্রাচীন যুগে। জাতির ইতিহাস রচনা করতে হবে অজয়।

—ইতিহাস ! ওতে কি সত্যিকার স্বাধীনতা আসবে ?

—হ্যাঁ—ইতিহাসই স্বাধীনতার ভিত্তিভূমি ! অর্থাৎ আমাদের ঐতিহ্য বা **tradition** আমাদের উত্তরকালের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে। যে জাতির ইতিহাস নাই, তার স্বরাট হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। ইতিহাস পূর্ব্বপুরুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিজয়-পরাজয়ের নিরীখ্—তাঁদের অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে, উদ্দীপ্ত করে, চালিত করে ! আমাদের ধর্ম্মসাধনা, কর্ম্মসাধনা, আমাদের ত্যাগ এবং ভোগপ্রবণতাকে ঐ ইতিহাসই নিয়ন্ত্রিত করবে। আমাদের জীবনকে গৌরবময় মৃত্যুর পথে নিয়ে যাবে—মৃত্যু যেখানে অমৃত হয়ে আছে !

ইন্দ্রজিতের কথাগুলো বেশ জোর আওয়াজে বেরুচ্ছে ; দূর গিরিগাত্রে তার

প্রতিধ্বনি জাগছে। বহুদূরে দেখা গেল একজন গৈরিকবাসা সন্ন্যাসিনীকে। তিনি এই দিকেই এগিয়ে আসছেন। এই নিতান্ত নির্জ্জন পাহাড়ের শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যভূমিতে কে ঐ নারী! ইন্দ্রজিত এবং অজয় আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে রইল। প্রতীক হাতে সন্ন্যাসিনী এগিয়ে আসছেন। ইন্দ্রজিত ওঁকে প্রণাম করবার জন্য কিছুটা এগিয়ে গেল, পিছনে অজয়।

—নমস্তে!—ইন্দ্রজিত আর অজয় দণ্ডবৎ প্রণাম করলো ওঁকে। সন্ন্যাসিনী মধুর হেসে বললেন,

—মৃত্যুঞ্জয়ী হও!—তোমরা কি বিহারীনাথ পাহাড়ের গুরুজীর শিষ্য?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!—ইন্দ্রজিৎ সবিনয়ে উত্তর দিল, আপনি কি তাঁকে চেনেন?

—হ্যাঁ—আমিও তাঁর শিষ্যা! একসঙ্গেই সরকারের অতিথি হয়েছিলাম। এসো, আমার আশ্রমে এসো! তোমাদের 'প্রতীক' দেখেই চিনতে পারলাম, তোমরা ওঁরই শিষ্য!

ওঁর পেছনে পেছনে চলতে চলতে ইন্দ্রজিত শুধুলো—এই প্রতীকচিহ্নের অর্থ কি আপনি জানেন মা! গুরুদেবকে প্রশ্ন করে উত্তর পাইনি; উনি বলেছেন,—সময় হলেই জানাবো!

—হ্যাঁ। সময় হয়েছে।—এসো, আমি ওর অর্থ তোমাদের জানিয়ে দেব। সময় অর্থে এখানে ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞের পূর্ণাহুতির সময় বুঝবে। যদিও সেই পরম প্রত্যাশিত দিনটি আসতে এখনো কিছুদিন বাকী আছে, তবু ঐ প্রতীকের অর্থ তোমাদের জানা দরকার এখন।

—এখনো কিছুদিন দেরী আছে!—ইন্দ্রজিত যেন চমকে উঠলো।

—তুমি কি মনে কর যে ইংরাজ এদেশ ছাড়লেই ভারতবর্ষ স্বরাট্ হয়ে যাবে?—না; এখনো অনেক দুর্ভোগ, অনেক দুর্গতি ভুগতে হবে আমাদের। সে দুর্গতির জন্য ইংরাজের কুশাসনই শুধু দায়ী নয়—দায়ী আমাদের সুদীর্ঘ হাজার বছরের পরাধীনতা, পরমুখাপেক্ষিতা, পরদ্বেষ-প্রবণতা, পরানুকরণ-প্রিয়তা,—দায়ী আমাদের জাড্য, ক্লৈব্য, কাপুরুষতা,—আমাদের অনাচার,

অস্পৃশ্যতাবোধ, আত্মপ্রবঞ্চনা!—আমাদের গণমন, যে-মন পৃথিবীর সব মানুষের থেকে সজাগ মন ছিল, তাকে আমরা শুধু ঘুম পাড়িয়েই ক্ষান্ত হইনি, তাকে আমরা কোকেন খাইয়ে রেখেছি এতকাল—কোকেন, অর্থে তাঁবেদারী—ক্রীতদাসত্ব! গণমনকে আমরা চিন্তাশীলতার আলোক থেকে সুদূরে সরিয়ে নিয়ে গেছি ধনীর বিলাসের আওতায়—মানুষের মন যেখানে কদর্য্যতায় ভিজে স্যাঁৎসেঁতে হয়ে যায়; কামনার বিষাক্ত কীটানু যেখানে বাসা বাঁধে, লোভের স্বার্থপরতা যেখানে অজেয় হয়ে মানবত্বের মৃত্যু ডেকে আনে।

সন্ন্যাসিনী থামলেন এতখানা কথা বলে। ওঁর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর বনভূমিকে সঙ্গীতময় করে তুলছিল, কিন্তু ইন্দ্রজিৎ এখন সঙ্গীতের পিয়াসী নয়। ওর অন্তরের জ্বালা ওকে উষ্ণ কণ্ঠে ঘোষণা করালো—ইতিহাস যদি আপনার কথাই সমর্থন করে, আমি প্রতিবাদ করবো না, কিন্তু সেই জাড্য, ক্লৈব্য, কাপুরুষতা ঘোচাতে আরো দীর্ঘদিন লাগবে কেন? কী ভেবে আপনি একথা বললেন?

—লাগবে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বিষ নষ্ট করা, দেশীয় রাজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারের মীমাংসা এবং নিজদিকে স্বাধীনতা রক্ষার যোগ্য করে তোলার জন্য সময় দিতেই হবে।

সন্ন্যাসিনীর আশ্রয়-গুহার দ্বারেই এসে পৌছেছে ওরা। উনি ভেতরে ঢুকে কম্বলে ওদের বসতে বললেন। মৃন্ময় ভৃঙ্গার থেকে সুস্বাদু পানীয় আর কয়েকটি নারিকেল নাড়ু দিলেন ওদের জলযোগ করবার জন্য। তারপর বলতে লাগলেন,

—অখণ্ড ভারতের মহিমময় রূপ ঐ প্রতীকে জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে। অর্দ্ধস্ফুট শতদল-কমলের পটভূমিকা ভারতের সমগ্রতার প্রতীকে। পদ্ম ভারতের নিজস্ব পুষ্প এবং যে কোনো ভারতীয় ধর্মে এর স্থান আছে, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ সকল ধর্মেই। পদ্ম সূর্যের প্রিয়া—ভারতও সূর্য্যের উপাসনা করে। এই পদ্মের পটভূমিকার উপর ঈশানকোণ থেকে নৈরীতকোণ পর্যন্ত তির্য্যকভঙ্গীতে অধিষ্ঠিত ত্রিশূল—স্বত্ত, রজ, তম,—সৃজন, পালন, লয়,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ত্রিগুণাত্মক প্রকাশ—সমগ্র হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মকথা। অগ্নিকোণে পদ্মের বৃন্তটি বহির্ভারতীয়

এবং বৃহত্তর এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সংযোগ-চিহ্ন। ত্রিশূলের অপর পার্শ্বে উদয়-সূর্য্যের হিরণ্যাভ রশ্মি সমগ্র পটভূমিকে আলোকিত করছে। পদ্মের বর্ণ গৈরিকাভ, শূল শ্বেতাভ আর সূর্য্য হিরণ্যাভ;—সমগ্র ভারতের জন্য এই একাত্মবোধক প্রতীকের পরিকল্পনা সত্যই বিস্ময়কর! এই পরিকল্পনা আমাদের গুরু মহারাজের; বিহারীনাথ পাহাড়ে বসে ধ্যাননেত্রে তিনি দেখেছেন ভারতের এই অপরূপ রূপ!

সন্ন্যাসিনী থামলেন।

নীচে ছোট্ট একটি নদী—এখান থেকেই বেশ দেখা যাচ্ছিল তার রূপোর মত চিক্‌চিকে অঙ্গখানি; সন্ন্যাসিনী সেই দিকে চেয়ে আছেন।

ওঁর চোখ দুটি জ্বল জ্বল করছিল; যেন উষার শুক তারা, নবীন প্রভাতের বার্তা বয়ে এনেছে আকাশের মুক্ত তোরণদ্বারে। ইন্দ্রজিৎ দেখলো সেই স্থিরোজ্জ্বল আঁখি, বললো—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত আজও অপাংক্তেয়; তার প্রতীকচিহ্নের মূল্য কি মা?

—অপাংক্তেয় থাকবে না, আঁধার আকাশে উষার অরুণিমা দেখা দিয়েছে; আন্তর্জাতিক এশিয়া সম্মেলন অবিলম্বে সংঘটিত হোল; এর ফল কি হবে, অনুমান কর!—অতীত যুগে, অশোকের ব্যবস্থায় একবার নিখিল প্রাচ্য জাতীয় সম্মিলন হয়েছিল। ইতিহাসের কথা বিশ্বাস করলে দেখা যায় যে, ভারতই সেদিন নেতৃত্ব করেছিল এশিয়ার জাতিসঙ্ঘের। আজো স্বাধীন এবং আত্মমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ভারত সমগ্র এসিয়া এবং সমগ্র পৃথিবীর জাতি-সঙ্ঘের মৈত্রীবন্ধনের কাজে নেতৃত্ব করতে পারবে। সে শক্তি আছে ভারতের আধ্যাত্মিক আত্মচেতনার মধ্যে; শুধু সেই চৈতন্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ভারতই করবে অন্য দেশের মানুষের আত্মার বিকাশ। একাজ কঠিন, তাই, একাজ করার অধিকার একমাত্র ভারতীয় আত্মদর্শনের!…সন্ন্যাসিনী থেমে কি যেন ভাবতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন—ভারতের নবজাগ্রত যৌবন আজ অস্থির হয়ে উঠেছে। একে সুশৃঙ্খলতার পথে এগিয়ে নিয়ে

যেতে হবে—মানুষের প্রাণকেন্দ্রে মনুষ্যত্বের জাগ্রতির আবাহন করতে হবে ; সেই কাজের ভার আজ তোমাদের উপর পড়েছে।

ইন্দ্রজিত জিজ্ঞাসা করলো—আমাদের দ্বারা এতো বড় কাজ কেমন করে হতে পারবে মা ?

—পারবে ; তোমরাই এই মহত্তোমহিয়ান কাজ করবার অধিকার পেয়েছ উত্তরাধিকারসূত্রে ; দ্বন্দ-কলহ যতই বড় হোক, ভেদনীতির অস্ত্র যতই শানিত হোক, ভারত সে সমস্ত অতিক্রম করেও এশিয়ার, তথা পৃথিবীর মুক্তিদূত রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে—তবে আজ নয়।

—বুঝলাম, কিন্তু···

—ওর মধ্যে কোনো কিন্তু নাই ইন্দ্রজিত !

ইন্দ্রজিত ওঁর কথাগুলো নিজের মনের মধ্যে পুনরালোচনা করছে ! সন্ন্যাসিনী দূর নীলিসার পানে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন। অনেকক্ষণ সকলেই নিস্তব্ধ—যেন ভাবগম্ভীর কোনো একটা ভাব ওঁদের ভাষাহারা করেছে। এই স্তব্ধতার মধ্যে দিনের আলোক এগিয়ে যাচ্ছে অন্তিমতার দিকে। সন্ন্যাসিনী বললেন ঃ—বেশ দেখা যাচ্ছে যে যুদ্ধপূর্ব্ব যুগ থেকে যুদ্ধোত্তর যুগের এই বিচ্ছিন্ন এবং বিভক্ত, শোষিত এবং শাসিত এশিয়ার মানুষগুলি এক অখণ্ড মৈত্রির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে উন্নততর জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করবার জন্য আগ্রহান্বিত। এশিয়াবাসী বিশ্বাস করে যে, যে-কোনো 'প্যাকট' বা ব্যক্তিগত মৈত্রীর চেয়ে সাংস্কৃতিক মৈত্রী অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য এবং কার্য্যকরী। এই সাংস্কৃতিক মিলনের সেতু রচনা করবে ভারত। তারই ঐতিহাসিক শুভ মুহূর্ত্ত আজ এসেছে।

ইন্দ্রজিত বললো—এবার পৃথিবীর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে শান্তি-সম্মিলন করলেন তাতে এমন দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যা পৃথিবীর আগামী ইতিহাসে চিরস্থায়িত্ব লাভ করবে ; একটি হোলো, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ সম্বন্ধে প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ দ্বারা হিংসাদ্বেষপূর্ণ

জগতের মনুষ্যত্ববোধকে এক প্রচণ্ড নৈতিক শক্তি দান করা হয়েছে। মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন করা বা তার সাধারণ অধিকারে হস্তক্ষেপ করা মনুষ্যত্বের ন্যায়নীতিসম্মত নয় এটাই প্রমাণ হচ্ছে। মানুষ হিসাবে কোনো দেশকেই অন্য দেশ থেকে পৃথক করা চলেনা।

ইন্দ্রজিত একটুক্ষণ থেমে বললো—অন্য ঘটনাটি ঘটেছে ইরানে; সে ঘটনা আরো ব্যাপক। রাশিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের কূটনৈতিক সম্বন্ধ সেখানে বহুকাল থেকে চলছিল, বর্ত্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে প্রভাব বিস্তার করেছে আর ইরানের দারিদ্র্য এবং অশিক্ষা ইত্যাদির সুযোগ নিয়ে যে খেলা সেখানে চলছে তার ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াবে, বলা কঠিন।

সন্ন্যাসিনী চুপ করে শুনছিলেন, এতক্ষণে বললেন—সেই কথাই বলছি! এশিয়ার আত্মচেতনা জেগে উঠেছে, আর সেটা বিশেষভাবে জেগেছে ভারতের জাতীয় জীবনে। ইরানের মতই চীন এবং অন্যান্য উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশগুলিতে ইরানের মতই জটিল সমস্যা রয়েছে! এই সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে অতীতে এবং বর্ত্তমানকালে সে-সব প্রাচ্য দেশ সাম্রাজ্যবাদী জাতি কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হয়েছে তাদের একত্র হয়ে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা। ইরান, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্ম, ইন্দোচীন, আফগানিস্থান ইত্যাদি দেশের নেতৃত্ব করবে স্বাধীন ভারত—কারণ ভারতই এইসব দেশের মর্ম্মবেদনা বোঝে। আর স্বাধীন ভারতই সমগ্র এশিয়ার পরিত্রাতা হতে পারে, এই জন্যই স্বাধীনতা লাভের এই সঙ্কটময় মূহুর্ত্তে ভারতের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীর সুষ্ঠু পরিচালনা এবং জনমতকে সুগঠিত করা একান্ত প্রয়োজন।

—আমরা তার জন্য যা-কিছু করতে পারি, করবো! আমাদের পথ ব'লে দিন মা।

ইন্দ্রজিতের কথায় সন্ন্যাসিনী আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন—যে ধর্ম্মকে ছেড়ে ভারত আজ অধঃপতিত, যে মানবধর্ম্ম-বিরুদ্ধ আচরণ করে ভারত আজ ভ্রাতৃবিদ্বেষী, পরধর্ম্ম চর্চ্চায় অবনত, পরানুকরণে

অন্ধ, ভারতকে আবার তার সেই সনাতন উদার মানবধর্ম্মে উন্নত করতে হলে চাই সদ্ধর্ম্মের শিক্ষা। মন্দির বা মূর্ত্তির মধ্যে নয়,—শুচি-অশুচির আচারে নয়, আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরে নয়—আপন আপন অন্তরের মাহাত্ম্যে, মনের নিষ্ঠায়, প্রাণের শুচিতায় ; জাতির একত্রীভূত শক্তিকে জাতীয়তা-মন্দিরে জাগ্রত করতে হবে। এই দুর্ভাগা দেশকে আবার তার সৌভাগ্যের সূর্য্যালোকে নিয়ে যেতে হলে চাই এই দেশের প্রাণমন্ত্রের পুরশ্চরণ।

—সে মন্ত্র কি মা ?—ইন্দ্রজিত সাগ্রহে শুধুলো।

—উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্য বরান নিবোধতঃ—ওঠো, জাগো, তোমার প্রাপ্য আদায় করে নাও !—কি ব্যষ্টিগতভাবে, কি রাষ্ট্রগতভাবে এই-ই একমাত্র মন্ত্র। তোমার প্রাপ্য তোমাকে পেতেই হবে। তুমি অর্থাৎ প্রত্যেকটি ব্যষ্টিগত জীবন অক্লান্ত পদে চলবে তোমাদের ইপ্সিত বস্তুকে লাভ করতে। দুর্ব্বল হলে চলবে না, ভেঙে পড়লে চলবে না ; 'সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমানং যো ন তন্দ্রয়তে—চরণ'। ঐ সূর্য্য সৃষ্টির আদিম দিন থেকে চলে আসছেন অক্লান্তভাবে, অতএব চরৈবেতি, এগিয়ে চল···

সন্ন্যাসিনীর মধুর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর স্তব্ধ গিরিকন্দরকে সঙ্গীতময় করে তুলছে। ইন্দ্রজিত মুগ্ধ হয়ে শুনছে, যেন ভারতমাতার মূর্ত্ত কণ্ঠস্বর ! কিন্তু ইন্দ্রজিত ক্লান্ত ; কিছুক্ষণ ওকে বিশ্রাম করতে বললেন সন্ন্যাসিনী।

কৃষ্ণার সঙ্গে লোকাধীশ এসে পৌছালো। লোকাধীশের সাহিত্য-শিষ্যা কৃষ্ণা ! নিজেও সাহিত্যিক হয়ে উঠেছে।

মোহিতবাবু অপেক্ষা করছিলেন ; কাবেরী "লনে" কয়েকটা চেয়ার সাজিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করছিল। লোকাধীশের আগমন বার্ত্তা পেয়ে ছুটে এলো অভ্যর্থনা করতে। কৃষ্ণাকে সে আজই প্রথম দেখলো। কে মেয়েটি ?

কাবেরীর অনুচ্চারিত প্রশ্ন অন্তরেই গোপন রইল। মোহিতবাবু ইতিমধ্যে সাদর অভ্যর্থনা করে ওদের বসিয়েছেন। কাবেরী উভয়কেই নমস্কার করে কৃষ্ণাকে বললো—আপনি বুঝি এঁর গ্রামেরই মেয়ে?

—না; আমি কৃষ্ণা; শুনলাম, আপনার নাম কাবেরী, তাই দেখতে এলাম।

—কৃষ্ণা নাম আপনার! বেশ তো নামটি—কাবেরী যেন খুসী হয়ে উঠলো। কিন্তু কোথায় ওর বাড়ী এবং লোকাধীশের সঙ্গে সম্পর্কটা কি, তা তো জানা গেল না; তাই জিজ্ঞাসা করলো,

—সেঁজুতি দেবী কোথায়? তিনি তো আসেন নি?

—না—লোকাধীশ বললো—ওর বুড়ো বাবা অসুস্থ, তাই দেশে গেছে। তাছাড়া, ওর দাদা বোধহয় শিগ্রী মুক্তি পাবে; বাড়ীতে অন্য কেউ নাই; আমার বৌদি একা সবদিক সামলাতে পারছিলেন না—তাই গেল!

—আশা করি, শীগ্রিই ফিরে আসবেন?

প্রশ্নটা অকারণ, তবু নারীমনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যের কি একটা দুর্নিরীক্ষ্য কুটিলতা যেন লুকিয়ে রয়েছে ঐ প্রশ্নে। লোকাধীশকে কাবেরীর ভাল লাগে; সেঁজুতির প্রভাব লোকাধীশের মনে নিশ্চয় অগাধ, এই ধারণা ছিল কাবেরীর। কিন্তু আজ এই নবাগতা মেয়েটিকে দেখে সে যেন নিজের দিকটা আরও অকিঞ্চিতকর দেখলো; যেন সেঁজুতির স্নিগ্ধ আলোতে সে নিজে কিঞ্চিৎ সুস্পষ্ট হতে পারে। কিন্তু লোকাধীশ নিতান্ত নির্লিপ্তের মতই উত্তর দিল,

—শিগ্রী আসবার সম্ভাবনা নেই! দেশেও সে ভালরকম কাজ করছে। তার দাদা এসে হয়তো তার সহায়ক হবে, তাছাড়া বৌদি আছে। আমার দাদাও আছেন।

কাবেরী একটুক্ষণ চুপকরে থেকে হঠাৎ বলে উঠলো,

—এমন সুন্দর অপরাহ্ণে ঘরের মধ্যে কেন? চলুন 'লন'এ যাই।

মোহিতবাবুও কন্যাকে সমর্থন করলেন। সকলেই উঠে এলো 'লন'এর

শ্যামল ঘাসের উপর পাতা বেতের চেয়ারে ; কাবেরী সাদরে সকলকে বসিয়ে চা পরিবেশন আরম্ভ করলো। কথাও চলছে। মোহিতবাবুই আরম্ভ করলেন, —পৃথিবীতে আজ এত বেশি সমস্যা যে ভাবলে ভয় হয়।

—হ্যাঁ, কিন্তু প্রধান সমস্যা মাত্র দুটি—লোকাধীশ উত্তরে বললো—তার প্রথম এবং প্রধান হচ্ছে এই পৃথিবীতে কতকগুলি মানুষের স্বার্থপরতায় সৃষ্ট দারিদ্র্য ; দ্বিতীয়টি হচ্ছে বর্ত্তমান পৃথিবীতে ধনপ্রান রক্ষা করে শান্তিতে বসবাসের অনিশ্চয়তা। এর মূলে বর্ত্তমানের মানুষের নৈতিক অধঃপতন।

—এ ছাড়া আরো তো অনেক তীব্র সমস্যা রয়েছে,—কাবেরী বললো—দেশগত ব্যবধান, জাতিগত ঈর্ষা, সমাজগত বৈষম্য—মানুষের প্রাচীন অন্ধ সংস্কার, অজ্ঞতা, জাড্য—এগুলোও তো বড় সমস্যা।

—ওর মূলে আগের সমস্যা দুটোই কাজ করছে ;—লোকাধীশ উত্তর দিল—কতকগুলি স্বার্থান্বেষী মানুষের চেষ্টায় পৃথিবীর জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশই সুযোগ পায় না নিজকে বৈজ্ঞানিক সত্য-শিক্ষার আলোকে আনতে। সেই ক্ষুদ্র স্বার্থপর অংশই 'ইজম্' এর মোহজাল বিস্তার করে আজকার পৃথিবীকে চালাচ্ছে। পুঁজিবাদই বলুন, আর সাম্যবাদই বলুন, কোনো ব্যবস্থাই সকল মানুষের ন্যায্য অধিকার দান করতে পারলো না। পৃথিবীতে কতকগুলি মানুষ জ্ঞানে বিজ্ঞানে আশ্চর্য্য রকমে এগিয়েছে এই অর্দ্ধশতাব্দির মধ্যে। কিন্তু তাদের অগ্রগতি ধ্বংসই সৃষ্টি করেছে, শান্তি বা নিরাপত্তার পথ দেখাতে পারে নি ; বরং শান্তি এবং নিরপত্তাকে আরো বিপন্ন করেছে। তাই আজ দেশে দেশে এত সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস—অধিকার কেড়ে নেবার ভয়ে অধিকতর উচ্চশ্রেণীর মারণাস্ত্র তৈরীর প্রচেষ্টা।

—কারণ নিজেকে রক্ষা করবার প্রবৃত্তিই মানুষের মজ্জাগত—মোহিতবাবু বললেন।

—কিন্তু নিজকে রক্ষা করবার জন্য অপরকে আঘাত বা পীড়ন করার কোনো অধিকার নেই। অপরকে আঘাত করতে গিয়েই আপনি নিজের

নিরাপত্তা বিপন্ন করছেন! নিজকে নিরাপদ করবার চেষ্টাই আপনাকে বেশি বিপন্ন করছে, সঙ্গে সঙ্গে আপনার মানবোচিত নৈতিক জ্ঞান নষ্ট করে দিচ্ছে। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষের পৃথিবীর ইতিহাসে। এই পঁয়ত্রিশ বছরের ইতিহাস, মানুষের নৈতিক জ্ঞানের ধ্বংসের ইতিহাস—নিজকে নিরাপদ করবার স্বার্থপঙ্কিল ইতিহাস,—অপরকে পীড়ন করবার দানবীর ইতিহাস—অপরের অধিকার ক্ষুণ্ণ করার জন্য একনায়কত্বের ইতিহাস। মানুষ আজ এত বেশি স্বার্থপঙ্কিল যে নিজকে রক্ষা করবার জন্য সে নিজের মনুষ্যত্ব-জ্ঞান পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে ত্রুটি করছে না। এই নৈতিক সংকটই বর্ত্তমান পৃথিবীর চরম সংকট। এর থেকে উদ্ধার না পেলে মানবতার মুক্তি নেই।

কাবেরী চা পান বন্ধ করে লোকাধীশের উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় মুখের পানে তাকিয়ে ছিল। ওর কথাগুলো কতকটা বক্তৃতার মত, কতকটা প্রাণের আগুনে জ্বালাময়, কিন্তু ওর বচনভঙ্গী এতই সুন্দর যে কাবেরী মুগ্ধ না হয়ে পারছিল না। মোহিতবাবু মেয়েকেই বললেন—চা জুড়িয়ে যাচ্ছে রে মা!

—হ্যাঁ, খাই!—কাবেরী মুখ নামালো পেয়ালার পানে। মোহিতবাবু আবার বললেন,

—আপনার কি মনে হয়, এই দুর্নীতিই আজকার অশান্তির জন্য দায়ী!

—নিশ্চয়!—লোকাধীশের কণ্ঠে সুনিশ্চয়তার দৃঢ়তা। সে একচুমুক চা পান করে আবার বললো—আজকার দিনে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করতে মানুষের কয়েকটা ঘণ্টা মাত্র লাগে। শিল্প, বাণিজ্য এবং খাদ্য আজকার মানুষের এতখানি আয়ত্তে যে সারা পৃথিবীতে সে তা বিস্তারিত করতে পারে অতি অল্পায়াসে, এর জন্য বিজ্ঞান তার বড়ো সহায়—কিন্তু মানুষের নৈতিক মানদণ্ড এতখানি নেমে গেছে যে পৃথিবীর এক অংশের খাদ্যে অনটন ঘটিয়ে সে অন্য অংশের সম্পদ বৃদ্ধি করতে চায়, এক দেশের পরাধীনতার সুযোগ নিয়ে, অন্য দেশের স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় করতে চায়, একজনের অধিকার ক্ষুণ্ণ করে আরেক

জনের অধিকার বিস্তার করে। একদিন ছিল, যখন জারের অত্যাচার বা বেলজিয়ম কঙ্গোয় ক্রীতদাসের দুঃখ, আর্মেনিয়ান এবং ইহুদিদের বাসভূমি-ত্যাগ ইত্যাদি মানবত্বের বিরোধী কাজ সারা পৃথিবীর মানুষকে বিচলিত করতো, কিন্তু আজ পরাধীন জাতিগুলির শতশত মানুষ কারাগারে ; সহস্র অত্যাচারে জর্জ্জরিত পৃথিবীর অর্দ্ধেক মানুষ,—ভেদে-বিভেদে-বিদ্বেষে বহু দেশের মানুষ আজ মৃত্যু-পথের যাত্রী—কিন্তু কে তা দেখছে ? কোন শান্তিচুক্তি, বা বিশ্ব-শান্তি-সম্মেলন ? ওঁদের জাতীয়তাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ যত প্রসারিত হচ্ছে, এই সব হতভাগ্য দেশের শাসন-বৈষম্য, জাতি-বৈষম্য, সমাজ-বৈষম্য ততই বাড়ছে ! কে এর জন্য দায়ী ? মানুষের স্বার্থপর বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ছাড়া কাকে দায়ী করবেন ? এই স্বার্থপরতাই তার নৈতিক অধঃপতনের মূলে।

লোকাধীশের কথাগুলোতে এমন তেজস্বী এবং নির্ভীক সত্য রয়েছে যে মোহিতবাবুও কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন। কৃষ্ণা এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোনো কথাই বলে নি। এতক্ষণে বললো,

—মানুষ তার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে এগিয়ে যাবেই ; তাকে তো থামানো যাবে না।

—না—তাকে থামাতে বলছি না। তার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে তার হৃদয়বৃত্তিকে যোগ করতে বলছি ; নইলে মানুষের এক অংশের সুবিধাবাদী মনোবৃত্তিই অন্য অংশের অগ্রগতি শৃঙ্খলিত করে রাখবে ; কাজেই অপর অংশের নিরাপত্তা বিপন্ন থাকবেই। এই অংশটাই বর্ত্তমান সভ্যতার এবং সাম্রাজ্যবাদের, তথা সারা পৃথিবীর অশান্তির মূলে।

—আপনার কথা যদি মেনেই নেওয়া যায়, তাহলে এর প্রতিকারের উপায় কি ?—মোহিত বাবু শুধুলেন।

—এর যা প্রতিকার, প্রতিষেধক, তা এই অবহেলিত ভারতেরই যুগসঞ্চিত মানব-বেদে মানবত্ব-রসায়ন রূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। রাজনীতির সঙ্গে মানব-নীতি যোগ করতে পাশ্চাত্য জগত কখনো শেখেনি, কিন্তু ভারত সেইটাই

চিরদিন করেছে। রাজনীতিতে তাই ভারত বহুবার ঠকে গেছে, বহু পরাজয় বরণ করেছে—পৃথ্বীরাজের সঙ্গে ঘোরীর প্রথম যুদ্ধ থেকে এ পর্য্যন্ত তার বহু প্রমান আপনি পাবেন—কিন্তু মানবনীতিতে ভারত চিরদিনই অজেয় ছিল, এখনো আছে। এখনো, আজকার এই স্বার্থপঙ্কিল রাজনৈতিক কূটিলতার দিনেও ভারতের রাজনীতির শ্রেষ্ঠ পুরোহিত রাজনীতির সঙ্গে হৃদয়বৃত্তিকে জড়িয়ে অহিংসার সিদ্ধমন্ত্র প্রচার করছেন। মানুষের নৈতিক জ্ঞানকে স্নেহসিঞ্চনে বর্দ্ধিত করবার আর কি বেশি ঐতিহাসিক উদাহরণ চান আপনি?

মোহিতবাবু জানেন, লোকাধীশ কংগ্রেস-সেবক এবং মহাত্মাজীর ভক্ত। তিনি মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

একটি যুবক এসে উপস্থিত হোল ঠিক এই সময়—সুন্দর লাবণ্যময় চেহারা। পোষাকে পরিচ্ছদে এই ধনীগৃহের সম্পূর্ণ উপযুক্ত অতিথি। কাবেরী হাত তুলে সুন্দর ভঙ্গিতে অভিবাদন করলো।

—এসো মলয়! কানপুর থেকে কবে এলে?—মোহিতবাবু শুধুলেন।

—কাল সন্ধ্যায়।—বলে বসলো মলয় একটা খালি চেয়ারে। অতঃপর পরিচয় দানের পালা। লোকাধীশের পরিচয় দিতে গিয়ে কাবেরী বললো,

—এঁর নাম লোকাধীশ। 'শিকল অলঙ্কার' বইখানার বিখ্যাত লেখক; আর উনি ওঁর বান্ধবী শ্রীমতী কৃষ্ণা দেবী।

—ওঃ! নমস্কার, নমস্কার!—মলয়বাবু সোচ্ছ্বাসে নমস্কার জানালো উভয়কে, কিন্তু মলয়বাবুর কোনো পরিচয়ই কাবেরী দেয়নি, তাই লকু বলল,

—ওঁর পরিচয়টাও দেওয়া প্রয়োজন!

—আমি শুধু মলয়! কানপুরে কারবার করি; সাহিত্যের ধার দিয়েও যাই না!

—কিন্তু আপনার নামটাতেই যে সাহিত্যের গন্ধ রয়েছে—'মলয় বহিলে হায়'...লোকাধীশ হাসির সঙ্গে বললো।

—ওটা আমার মা-বাবার কবিত্বপ্রীতির পরিচয়। আমি ওর জন্য দায়ী

নই। আমি কঠোর বাস্তববাদী, কবিতার ছোঁয়াচকেও ভয় করি।—মৃদু মৃদু হাসতে লাগল মলয়।

—তাহলে তো আমাদের সান্নিধ্য বেশিক্ষণ সহ্য হবে না আপনার। লোকাধীশের কণ্ঠে একটুখানি উষ্ণ বিদ্রূপ; কিন্তু কাবেরী সামলে নিল,

—ওঁর মা-বাবার রক্তটা ওঁর মধ্যেও রয়েছে; সেটাই ওঁকে সহ্য করাবে; অবশ্য উনি ওঁর বর্ত্তমান বাস্তববাদের ভাঙনের ভয় করতে পারেন কিন্তু ওঁর বাস্তববাদ অত হালকা হবে কেন?

—ভয়ে ভয়েই সহ্য করতে হবে। তবে ভেবে পাইনে যে গল্প-কবিতা লিখে মানুষের কি উপকার হয়। পড়েই বা কি হয়। আপনি আমায় বুঝিয়ে দিতে পারেন?

—না।—লোকাধীশ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো।—যে মানুষ না বুঝবার জন্য উগ্র হয়ে রয়েছে, এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় উন্মুখ হয়ে আছে, তাকে বোঝাতে যাবার অপচেষ্টার সময় কৈ? আর সময় দিলেও সেটা অপব্যয় হবে। তার চেয়ে আজকার মত উঠি আমরা!

ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু—মোহিতবাবু এবং কাবেরী অনুভব করলো, কিন্তু মলয় কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে বলে চললো.

—ইনিয়ে-বিনিয়ে কতকগুলো গল্প শোনালে সময় হয়তো কেটে যায় ভালই, কিন্তু অত সময় নষ্ট করি কেমন করে? বিলেতের পড়ার বই কখানা পড়ে আসবার পর থেকে আমি কোনো বই পড়েছি বলে মনে পড়ে না। কোনো প্রয়োজনও হয় না। আজ দরকার দেশের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করা; শিল্পের প্রসার, বাণিজ্যের বিস্তার, বিজ্ঞানের আবিষ্কার আজ প্রয়োজন—মলয় চায়ে চুমুক দিয়ে বললো—আধুনিক যুগ অগ্রগতির যুগ—গল্পে মসগুল হয়ে ঘরের কোণে বসে থাকবার যুগ এ নয়। এ যুদ্ধের,—জীবনযুদ্ধের যুগসন্ধি!

সমর্থন লাভের জন্য মলয় সগর্বে তাকালো মোহিতবাবুর পানে। তার নিশ্চিত ধারণা, মোহিতবাবুর সমর্থন সে পাবে। কিন্তু মোহিতবাবু নীচুপানে তাকিয়ে, আর কাবেরী লোকাধীশের দিকে চেয়ে।

প্রায় হতাশ হয়ে মলয় আবার বললো—মানুষকে আজ বাঁচতে হবে—যে কোনো উপায়ে টি'কে থাকতে হবে।

—মানুষ আবহমান কাল বেঁচে আসছে, বেঁচেই আছে এবং গল্প-কবিতাও তার সঙ্গে বেঁচে আছে। এই গল্প-কবিতাই তাকে বাঁচিয়ে এনেছে সেই সুপ্রাচীন যুগ থেকে,—লোকাধীশ থামলো,

—গল্পকবিতা ?

—হ্যাঁ, গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ, বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ, বাইবেল-কোরান-দোহা। মানুষের বেঁচে থাকাটা কিসে প্রমাণ হয় জানেন ? এরোপ্লেনে চড়ে কাণপুর থেকে কলকাতায় এলে নয়—বিরাট কারবারকে বিরাটতর করে ফাঁপিয়ে সোনার টাকায় পকেট ভারী করলেও নয়—অন্নপানভোজনে ইন্দ্রত্ব অর্জ্জন করলেও নয়—মানুষের বেঁচে থাকাটা প্রমাণ হয় তার মনুষ্যোচিত জীবনের ছন্দে, আনন্দে, অনুভূতিতে। গল্প-কবিতা সেই মানবানুভূতিটাই জাগ্রত করে দেয়—মানুষের যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ। নইলে আপনার থেকে একটা মৌমাছি অনেক বেশী ঐশ্বর্য্যবান। তার পাখা আছে ঈশ্বরদত্ত, সেও উড়তে পারে ; তার গৃহ আপনার থেকে সুন্দর, তার খাদ্য আপনার থেকে সুস্বাদু, তার পরিবার আপনার থেকে একনিষ্ঠ, তার আবেষ্টনী আপনার থেকে উদার। আপনি কতকগুলো রাসায়নিক প্রক্রিয়ার চাম্‌ড়ার উপর রং করতে শিখেছেন, মৌমাছি তার নিজের প্রয়োজনে আরো অনেক বেশি আবিষ্কার করেছে কি না, আপনি জানেন কি ? আপনার বিজ্ঞান সৃষ্টি করছে ক্রমাগত অভাববোধ, আর অশান্তি ; মৌমাছির বিজ্ঞান তাকে শত শতাব্দি এগিয়ে এনেছে তার জীবনের পথে। এই জগতে যে-কোনো রকমে টিকে থাকাটাই শুধু বড় কথা নয়—মানুষকে মানুষের মতই টিকে থাকতে হবে এবং সকল মানুষকেই। আপনি একা টিকে থাকলে তো চলবে না—আপনার পারিপার্শ্বিক সকলকে টিকিয়ে রাখবার কাজও আপনারই মনুষ্যত্বের কাজ। সেই মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে সাহিত্য! কিন্তু সকলেই তো আর মানুষ হতে চায় না ; অনেকে আছে যাঁরা আহার-নিদ্রা-

মৈথুনের জৈবিক প্রয়োজনকেই টিকে থাকা মনে করেন—তাও সকলের জন্য নয়, শুধু নিজের জন্য! তাদেরকে বোঝাতে যাওয়া—বাঘকে অহিংস হবার উপদেশ দেওয়ার মত নিরর্থক।

লোকাধীশ তার দীর্ঘ এবং তপ্ত বক্তৃতা শেষ করে উঠতে যাচ্ছে, কাবেরী বললো--ব্যাপারটা অপ্রিয় দাঁড়াচ্ছে। বসুন আর একটু।—মলয়কে বললো, —উনি সাহিত্যিক, ওঁকে এভাবে আক্রমণ করা আপনার উচিৎ হয়নি। ওঁর যা ধর্ম্ম আপনার ধর্ম্ম তা না হতে পারে। কেউ যদি চাঁপা ফুল হয় তো সে কেন বেগুনের ফুল হোল না বলে গাল দেবার কারো অধিকার নেই; আপনি অসাহিত্যিক বলে সাহিত্যিকের নিন্দে করার কোনো অধিকার নেই আপনার। হোতে পারে, আপনি চামড়া রংকরার কাজে লক্ষ টাকা অর্জ্জন করেন,—উনি ওঁর বিচিত্র সৃষ্টিতে কোটি মানুষের মনে রং ধরিয়ে দেন—কে বেশি বড়, কে বেশি মহৎ, পৃথিবীর ইতিহাস তা ভালই জানে। আপনি গল্প কবিতার মূল্য বোঝেন না বলে পৃথিবী থেকে গল্প কবিতা লোপ পাবে না।

কাবেরী যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণা লক্ষ্য করে বললো মৃদুকণ্ঠে, —থামুন কাবেরী দেবী—ওঁকে অতটা কোণঠাসা করবেন না; নিজের কথাটা একটু বড় করে বলা ওঁর অভ্যাস, নইলে সাহিত্যকে ভালো উনিও বাসেন অর্থাৎ সাহিত্য আর সাহিত্যিকের উপর শ্রদ্ধা ওঁর গোচরীভূত মনের অজ্ঞাতে রয়েছে।

—আপনি ঠিকই বলেছেন; ধন্যবাদ—মলয় ত্বরিতে কৃষ্ণার কথাটা ধরে বললো—সত্যিকার শ্রদ্ধা এবং প্রণতি রয়েছে আমার প্রত্যেক সাহিত্যিকের উদ্দেশে। আমি জানি যে আমার যে ক্ষমতা নেই, তাঁদের সেই ক্ষমতা আছে। কিন্তু ঐ ক্ষমতা দ্বারা পৃথিবীর অগ্রগতির কি সাহায্য হয়, সেইটাই আমি বুঝতে পারি না।

—বুঝবার সামান্য চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবেন—কৃষ্ণা বললো,—ধনতন্ত্রের উপাসনায় আপনি অত্যধিক ব্যস্ত, তাই সে চেষ্টা করেন নি। তবে আমাদের

বলবার কথা এই যে পৃথিবীতে ধনের প্রয়োজন যতখানি, আনন্দরসের প্রয়োজন তার থেকে বেশী। শুধু ধন, জন এবং যৌবন নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না—ওগুলো তার অগ্রগতির পরিচয়ও নয়। ভেবে দেখুন, কোনো একটা অনাবিষ্কৃত দ্বীপে হয়ত একজন সর্দ্দার বিরাট ভূখণ্ডের একছত্র মালিক হয়ে আছে। সেই দেশের শস্য সম্পদ, খনিজ সম্পদ, সবই হয়ত তার আয়ত্তে। বহু মানুষের উপর প্রভুত্বও সে করে—সুতরাং সে জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি একজন। কিন্তু তার শ্রেষ্ঠত্ব আপনি স্বীকার করবেন না; তাকে বলবেন, সে অসভ্য! কেন বলবেন? আপনার থেকে সে কম সুখী নয়। তবু বলবেন, কারণ তার সাংস্কৃতিক গৌরবের কিছুই নাই। এই সংস্কৃতিকে এগিযে নিয়ে চলে সাহিত্য,—তাই সাহিত্য জাতীয় জীবনে এত বড় সম্পদ। 'আরব্য রজনীর' দিন থেকে আজকার এ্যাটোম ব্যোমের দিন পর্য্যন্ত সাহিত্যই মানুষকে এগিয়ে এনেছে—; কৃষ্ণা থামলো।

ব্যাপারটার বেশ লঘু পরিণতি লাভ হচ্ছে কৃষ্ণার সুমিষ্ট কথায়! মলয় কৃষ্ণার চোখের কৃষ্ণ তারকার দীপ্তিতে আত্ম সমর্পণ করে বললো,

—আমি সর্ব্বান্তকরণে স্বীকার করছি যে মানুষের সাংস্কৃতিক গৌরবকে রক্ষা করে তার শিল্প এবং সাহিত্য! কিন্তু সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধার তেমন সচেতনতা তো দেখতে পাইনে আমাদের জাতীয় জীবনে?

—শ্রদ্ধা ঠিকই আছে, তবে সচেতন নেই। সাহিত্যের উপর শ্রদ্ধা আছে এই জাতির রক্তের প্রবহমানতায়। বৈদিক সাহিত্যের যুগ থেকে পৌরাণিক সাহিত্যের যুগ, তারপর গীতিকাব্যের যুগ এবং আধুনিক দিনের বৈপ্লবিক যুগের সাহিত্য সমান শ্রদ্ধাই আকর্ষণ করে আসছে জাতির,—কিন্তু জাতীয় জীবনে সেই শ্রদ্ধা ততখানি সচেতন নয়—তার বড়ো প্রমাণ আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক জীবনে সাহিত্যের স্থান এখনো স্বল্পপরিসর; এরও কারণ রয়েছে; জাতীয় শিক্ষা বিদেশীর কবলিত; জাতীয় জীবন পরানুকরণে অপুষ্ট এবং জাতীয় সাহিত্য বৈদেশিকতার প্রভাবে ক্ষীয়মান। আরো কারণ, আমাদের সাহিত্য ছিল ধর্ম্মমুখীন,

এবং সমাজমুখীন। বর্ত্তমান জীবনধারার সঙ্গে মিলিয়ে আমরা আজও তাকে বৈপ্লবিক রূপ দিতে পারি নি;—সাহিত্য আজও জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সুদৃঢ় ইঙ্গিত দিতে অক্ষম হচ্ছে; কিন্তু এই দিন শীঘ্রই অপগত হবে; সাহিত্যই আনবে নবীন দিন, নব সূর্য্যালোক!

—সেই আগামী দিনকে আমার প্রণতি জানাচ্ছি।

বলে মলয় আলোচনাটা থামালো। কৃষ্ণাও আর বেশি কিছু বলতে চায় না। এবার মোহিতবাবু বললেন সকলকেই,

—আমাদের জাতীয় অন্তর আজ আর্ত্তনাদ করছে নানা সমস্যায়। সকলের উপর আমাদের ব্যক্তিগত বিলাস-প্রিয়তা আমাদিকে রসাতলে নিয়ে যেতে চাইছে। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা। কিন্তু সে স্বাধীনতা তো গাছের ফল নয়। তাকে পেতে হলে প্রাণের তপস্যা প্রয়োজন; যাঁরা যেভাবে সে তপস্যা করছেন, তাঁরা সকলে নমস্য। মলয় নিশ্চয় একথা স্বীকার করবে।

—নিশ্চয় করবো। এইটাই তো বর্ত্তমান যুগের একমাত্র সত্য কথা।

—সকল যুগেরই একমাত্র সত্য কথা—মোহিতবাবু বললেন,—সকল যুগের সত্যই হোল—মানুষ তার স্বাধীন স্বত্তায় বেঁচে থাকবে। যেখানে, যে যুগে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে, সেইখানে, সেই যুগেই জেগেছে বিপ্লব। আর সেই বিপ্লবকে যারা এগিয়ে এনেছেন তাঁরা সকলেই নমস্য।

—আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তার অন্তরটা অগ্নিগর্ভ; কিন্তু উপরের শ্যামল তরু-বল্লরী, সরিৎ-সাগর, আকাশ-বাতাস দেখে তো বুঝবার উপায় নেই যে মাতা ধরিত্রী সর্ব্বক্ষণ অন্তরে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে রেখেছেন জীবনভ্রূণের সৃষ্টির জন্য। জীবনই হোমাগ্নিকণা—এই আগুন অন্তরের বিপ্লবের আগুন, স্বাধীনতার হোমাগ্নি। প্রত্যেকের অন্তরেই সে আগুন রয়েছে, তা জ্ঞাতসারেই হোক, আর অজ্ঞাতসারেই হোক।—লোকাধীশ কথাগুলো বলে একবার চাইলো মলয়ের পানে, তারপর বললো,—

—যিনি সে অগ্নিকে অস্বীকার করেন, তিনি হয় জেগে ঘুমোন, নয় জীবিত নেই।

ওর কথার অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম সত্যকে অনুভব করবার মত তীক্ষ্ণ অনুভূতি মলয়ের নাই,—কাবেরী জানে, তাই হেসে বললো—জেগে ঘুমোনেই এযুগের নীতি। ব্যক্তিগত জীবনের বাইরে আজকার মানুষ আসতে চাইছে না—ধরিত্রীর মতই তারা উপরের শ্যামল শ্রী জাগিয়ে অন্তরের অগ্নিকে চেপে রাখতে চাইছে, অস্বীকার করছে।

—প্রমাণ?—মলয় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো।

—প্রমাণ চোখ মেলে চাইলেই দেখতে পাবেন—কাবেরীর কণ্ঠে অসীম আলস্য।—মানুষ সমস্যা এড়িয়ে যেতে চাইছে। যে কোনো রকমে বর্ত্তমানকে ঠেকিয়ে রাখাটাই বড় বলে মনে করেছে। নিজের সামান্য কয়েক বছরের পরমায়ুটাকেই ভোগে আর উপভোগে পূর্ণ করে তুলতে চাইছে জীবনে। আজকার পৃথিবীতে আর সর্ব্বমানবের কল্যাণকর ধর্ম্ম বা সমাজনীতি জন্মায় না।

—কেন? শ্রমিক জীবনের মুক্তি? সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রসার?

—ওগুলো সব থিয়োরী!—কাবেরী হেসেই বললো—কতক মানুষ ঐসব থিওরী নিয়ে খুবই মাতামাতি করছে বটে, কিন্তু রোগের মূল ওতে যাবে না। বৃহত্তর মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য কতকগুলো মজুরের মজুরী বাড়ানোই যথেষ্ট নয়। সব মানুষকে সমান করার ইচ্ছার মূলেও মানুষের ব্যক্তিগত বড় হবার আকাঙ্ক্ষা কুঠার হানছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে; আর ব্যক্তি স্বাধীনতা মানুষকে বিভ্রান্তই করছে, কারণ, ব্যক্তিত্ববোধটাই সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে এযুগে।

কাবেরির কথায় প্রতিবাদ করতে হলে বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করা প্রয়োজন মলয়ের, কিন্তু লোকাধীশের আর আলোচনা চালাবার ইচ্ছা নেই। বললো,

—এ আলোচনা এখন শেষ হবে না। আমাদের অন্যত্র যেতে হবে। বিদায় চাইছি!—ও উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণা উঠে নমস্কার জানালো সকলকে।

ওরা বেরিয়ে গেল। মলয় চেয়ে রয়েছে কাবেরীর পানে। অবশ্য কৃষ্ণার গমনছন্দ এবং দেহসৌষ্ঠব ওকে যথেষ্ট আকর্ষণ করেছে। কিন্তু ওরা তো চলেই গেল। মলয় দেখছে, কাবেরী কিছুটা বিমনা হয়ে উঠেছে এর মধ্যে!

—ওদের মতকে তুমি অত বেশি সমর্থন করো কেন, কাবেরী?

—সমর্থন করাটা সত্য বস্তু হলে তার আর কম বেশি হয় না!

—বেশ! সত্যই সমর্থন কর, কিন্তু কেন?

—কারণ, সত্য চিরদিন সমর্থন আদায় করতে পারে। তোমরা বসো বাবা. আমি ভেতরে যাচ্ছি।

মোহিতবাবু বেশ বুঝলেন কাবেরী আর মলয়ের অন্তর! মলয়কেই বললেন,

—বসো মলয়, কিছু কাজের কথা আছে।

বিশাল পর্ব্বতের অপরিসীম রূপমহিমা ইন্দ্রজিতের চোখে লেগে রয়েছে। ভারতের ঐ যুগবিস্মৃত গিরিবর কতকি দেখেছেন; কত উত্থান পতন, কত বিপ্লব-বিপর্য্যয়,-কত শান্তি-সান্ত্বনা! আজও সেই দুর্ভাগা দেশের দরিদ্র নর নারীর দুঃখের তিমির রাত্রি পোহাবার জন্য উনি অপেক্ষা করছেন—অপেক্ষা করছেন স্বাধীনতার সূর্য্যোদয় দেখবার জন্য।

'রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবেনা দিন?' —মনে পড়লো মহাকবির অমোঘ আশাবাণী। নিবিড় তিমির রাত্রির পর দিন আসবে। পূর্ব্বাকাশ রাঙা হয়েছে। পূর্ব্বাকাশের পানে সত্য সত্যই চাইলো ইন্দ্রজিৎ। আলো ঝল মল আকাশ। কিন্তু মেঘ রয়েছে—পশ্চিম দিকটায় যেন ঝড়ের পূর্ব্বাভাস দেখা যায়। অরণ্যময় ভূমিতে তার ছায়া পড়েছে। আলোছায়ার খেলা বড় চমৎকার দেখাচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো ইন্দ্রজিত সেই স্বর্গ-সুষমা!

—ভারত বিভক্ত হবার প্রস্তাব পাকা হয়ে গেল—অজয় এসে জানালো!

—এঁ্যা!—চম্‌কে উঠলো ইন্দ্রজিত—পাকা হয়ে গেল! কংগ্রেস গ্রহণ করেছেন বিভক্ত হবার প্রস্তাব! এতদিন যে কংগ্রেস অখণ্ডভারতের জন্য সংগ্রাম করে অনন্ত দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করালেন দেশের মুক্তিকামী যৌবনকে, সেই কংগ্রেস আজ মেনে নিলেন বিভক্ত ভারত'—তুমি সত্যি বলছো অজয়?

—এইতো, দেখ!—ষ্টেশন থেকে সদ্য কিনে আনা খবরের কাগজখানা তুলে দিল অজয় তার হাতে। উপরেই বড় বড় হরপের লেখা—'কংগ্রেস কর্ত্তৃক মাউণ্টব্যাটেন প্রস্তাব গ্রহণ'—ইন্দ্রজিৎ থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—বর্ত্তমানে এইতো একমাত্র পথ ইন্দ্রদা—যতটুকু পাওয়া যাচ্ছে তাই এখন নেওয়া উচিৎ—এতে দেশে শান্তি স্থাপিত হবে!

এই যদি কংগ্রেসের ইচ্ছা ছিল তাহলে অনেকদিন পূর্ব্বেই তা হতে পারতো' কিন্তু এতদিন অখণ্ড ভারতের কথা বলে মানুষের মনকে কংগ্রেস বিভ্রান্ত করেছেন।—একি কংগ্রেসের দুর্ব্বলতা নয়? কংগ্রেসের এক জাতীয়তা বোধ আর রইল কোথায়? ভারত খণ্ডিত হোল, বাঙ্গলা পাঞ্জাব খণ্ডিত হবে।

ইন্দ্রজিত কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে উদার আকাশের পানে চেয়ে আনন্দ এবং আশার স্বপ্ন দেখছিল, সেই আকাশের পানেই চাইল, কোনো অবলম্বনের আশায়। না—কোনো অবলম্বনই নেই, চোখে জল আসছে ওর—কিন্তু অদূরে সন্ন্যাসিনীর স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দেখা গেল। তিনি সস্নেহে আহ্বান জানালেন—ঘরে এস ইন্দ্রজিৎ!

নীরবে, নতমস্তকে ইন্দ্রজিৎ গিয়ে উঠলো আশ্রমগুহায়, পিছনে অজয়। ওর কালিমাঙ্কিত মুখের পানে চেয়ে সন্ন্যাসিনী বললেন,—কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করবে, আমরা জানতাম ইন্দ্রজিৎ—কিন্তু দুঃখ কেন? এই-ই শেষ নয়—এবং আজই পৃথিবীর ইতিহাস শেষ হচ্ছে না!

—কিন্তু মা, এরই জন্য কি লক্ষ লক্ষ যুবক ফাঁসীকাঠে ঝুলেছে—দ্বীপান্তরে মরেছে—জেলের সেলে পচেছে!—ইন্দ্রজিতের কথায় অকথিত বাষ্পোচ্ছ্বাস!

—স্বাধীনতার এখনো দেরী আছে বৎস, একথা কাল তোমাকে বলেছি। এ হচ্ছে স্বাধীনতা লাভের প্রস্তুতির বৈপ্লবিক অভিযান। একে ঠেকিয়ে রাখার সাধ্য নাই, তাই সয়ে যেতে হবে আমাদের। ভেবে দেখ, ফাঁসীকাঠ দ্বীপান্তর আর জেলের সেল একচেটিয়া করেছিল বাঙালীর ছেলে—কিন্তু কোথায় আজ সেই বাঙ্গালা? বাঙ্গালার আত্মাকে বহুদিন পূর্ব্বেই নির্ব্বাসিত করা হয়েছে—আছে শুধু কাঠ-খড়-মাটি-রং লাগানো বিকৃত মূর্ত্তিখানা। সেই মূর্ত্তিকেও খণ্ডিত করা হবে;—এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে বাঙালী আজ নিজেই চেয়ে নিচ্ছে সেই খণ্ডিত রূপ; কিন্তু অখণ্ড বাঙ্গালার অদম্য প্রতাপ ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতিকে একদিন পরিচালিত করেছে, সে শক্তি খর্ব্ব হয়ে গেল। অথচ কয়েকজন নেতা ধুয়া ধরেছিলেন তাঁরা বাংলার বিভাগ চান না! কিন্তু সত্যি তাঁরা চান,—দীর্ঘদিন থেকে চেয়ে এসেছেন যে বাংলার শক্তি রাজনীতিক্ষেত্র থেকে লুপ্ত হোক—তাই-না-গ্রহণ-না বর্জ্জন নীতি স্বীকৃত হয়েছে—তাই প্রস্তাব পাশ করে বাংলার বিরোধীকণ্ঠস্বর রুদ্ধ করা হয়েছে—তাই ব্রুট মেজরিটির শাসন। পুণাপ্রস্তাবের পূর্ণ কুফল আজও প্রকট হয় নি। এখনও অদূরদর্শী রাজনৈতিক ভুলের মাশুল আদায় হবার অনেক বাকি! সন্ন্যাসিনী থামলেন।

—ওঁর গভীর দুঃখময় কণ্ঠস্বর বিষাদের রাগিনীর শেষ আলাপের মত থেমে গেল। ইন্দ্রজিতও কিছু বলবার মত পাচ্ছে না।

—এরপর আর কি আশা আছে মা—বলে যেন হতাশ হয়ে গেল।

—আশা অনন্ত ইন্দ্রজিৎ! কোন্ বিস্মৃত কাল থেকে ভারতের বুকে কত কত বিপ্লব বয়ে গেছে,—ভারত আবার উঠেছে। তেমনি আবার উঠবে, এই আশাই জাগিয়ে রাখতে হবে আমাদের! কিন্তু…অনেকক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন সন্ন্যাসিনী। তারপর বললেন—এই ভারতবর্ষ আর্য্যের দেশ; পৃথিবীর অপর কোনো জাতির অধিকার নেই একে নিজবাসভূমি বলে দাবী করবার। —এই পরম সত্য কথাটাই আজ ভুলে গেছে এ দেশের লোক। ভুলে যেতে

বাধ্য করেছে বৈদেশিক শাসন, বৈদেশিক শিক্ষা আর বৈদেশিক সভ্যতা; তাই ভারতের আর্যবংশধর আজ মেকী জাতীয়তাবাদের ধূয়া তুলে নিজের ভীরুতা আর কাপুরুষতাকে প্রচ্ছন্ন করতে চায়। সে স্বীকার করতে চায় না যে সর্ব্বাগ্রে সে আর্য্যবংশধর, তারপর সে অন্যকিছু। এই ভ্রান্তি অপনোদন করতেই হবে তার —নইলে কল্যাণ নাই। স্বধর্ম্মকে সে ভুলেছে বলেই আজ চলছে তার লুকোচুরি—আর লুকোচুরিটা লুকিয়ে হলেও চুরি—তাই নৈতিক নিষ্ঠার সব বালাই ঘুচে গেছে, এখন স্ব স্বার্থসিদ্ধিই একমাত্র ধর্ম্ম হয়ে উঠেছে তাদের।

—এর উপায় কি মা? ইন্দ্রজিত হতাশার স্বরে প্রশ্ন করলো।

জনমত জাগ্রত করে মেকী মতবাদের অবসান ঘটাতে হবে। মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তার স্বধর্মে, তার সৎস্বরূপে, তার স্বরাটে। সে বুঝবে, এই বিশাল দেশ কোন ব্যক্তিগত মানুষের পৈত্রিক সম্পত্তি নয়—কোনো বাদ-বিশেষের আধ্যাত্মিক আশ্রম নয়, কোনো দল বিশেষের জন্য তৈরী যাত্রার আখড়া নয়। এ দেশ মনুষ্যত্ব বোধে জাগ্রত মানুষের দেশ। আমাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে তার সহনশীল ঔদার্য্য আর আধ্যাত্মিক চেতনাকে বিভ্রান্ত করে যারা আজ বিরাট দেশের এতবড় দুর্দ্দিন আনলো—তারা আমাদেরই আর্য্য ভ্রাতা; এর থেকে বড় দুঃখ আর নেই ইন্দ্রজিত! এর থেকে বড় দুঃখ আর নেই! সন্ন্যাসিনীর কণ্ঠস্বর বেদনায় ক্রন্দনাতুর, কিন্তু তিনি নিজেকে সামলে বললেন তবুও আগামী দিনের ইতিহাস তোমাদের সবল হস্তে লিখিত হোক, এই দুর্ভাগা দেশে আজ আবার নূতন করে যে দুর্ভাগ্যের আঁধার নামলো, তাকে দূর করতে পারবে তোমরাই—ইন্দ্রজিত ক্ষত্রিয়শক্তিকে সজাগ রাখ, সবল রাখ, সক্রিয় রাখ।

—কিন্তু যে সমস্যা আজ ইংরাজ এদেশে জাগিয়ে তুললো, তার জটিলতা যে অভেদ্য, মা!

—হোক! ইংরাজ ইচ্ছে করেই এই জটিলতার সৃষ্টি করেছে! ধর্ম্মের ভিত্তিতে আধুনিক জগৎ কোন জাতীয়ত্ব স্বীকার করে না, কিন্তু ইংরাজ তার কূটকৌশলে

ভারতে দুই জাতীত্ব কায়েমী করে দিল। কংগ্রেস দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে ক্রমাগত হিন্দুস্বার্থ ক্ষুণ্ণ করেও ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে নাই। এখনো যদি কংগ্রেস তার নীতি পরিবর্ত্তন না করে, তাহলে ভারতে হিন্দুত্ব লুপ্ত হয়ে যাবে।

—এই দুর্ভাগ্য থেকে ভারতকে রক্ষা করবার কি কেউ নেই আজ ?

—আছে! তোমরাই আছ। যারা যৌবন শক্তিতে শক্তিমান, যারা, যে কোনো দুর্ব্বলতাকে সবলে দূর করতে পারবে, তারাই রয়েছ, তারাই ভরসা; তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে ইতিহাসের রাজনীতি থেকে এবং স্বদেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য দৃঢ়পদে এগুতে হবে। হিন্দুর পরমত সহিষ্ণুতাকে সুযোগরূপে ব্যবহার করে যারা হিন্দুবিদ্বেষের শেকোড় গেড়ে বসবে, তাদের উৎসাদিত করতেই হবে। হিন্দুর ঔদার্য্য আছে সত্য, কিন্তু ঔদার্য্যকে আজ ভীরুতার পর্য্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে তোষণনীতির আবিল স্রোতে ফেলে। ভারতবর্ষে অন্য যারা থাকবে তারা হিন্দুবিদ্বেষী হলে চলবে না। সাপকে চুবড়ীতে বন্দী করে তার বিষ দাঁত ভেঙে দিয়ে তারপর যত খুসী তাকে ঔদার্য্য দেখাতে পার, দুধ কলা দিতে পার—তার পূর্ব্বে নয়!

—চিরদিনই কি মানুষ বর্ব্বরই থাকবে মা! তাকে কি বর্ব্বরতার উপরে নিয়ে যাওয়া যাবে না ?

—যাবে, কিন্তু বর্ব্বরতাকে শক্তি দিয়েই জয় করতে হয়। বিষের ঔষধ বিষই!

—কিন্তু পরধর্ম্ম সহিষ্ণুতা আমাদের ধর্ম্মের ভিত্তি।

—না, ভিত্তি নয়, ধর্ম্মের ভিত্তি অত পলকা হয় না! পরধর্ম্ম সহিষ্ণুতা আমাদের ধর্ম্মের একটা গুণ হতে পারে এবং এ গুণ সব ধর্ম্মেরই থাকা উচিৎ, কিন্তু পরধর্ম্ম সহ্য করতে করতে যে আমরা স্বধর্ম্ম প্রায় বিসর্জ্জন দিচ্ছি বৎস! অহিংস হতে হতে আমরা যে আজ ক্ষাত্রবীর্য্যকে বিসর্জ্জন দিয়ে ক্লীবত্বে পৌঁছাচ্ছি—অপরের সুবিধা করে দিতে দিতে আজ আমরা নিজেদের সবই যে হারাতে বসেছি—অন্যকে সুখী করবার চেষ্টায় আমরা যে আজ আকণ্ঠ পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে গেলাম।

ইন্দ্রজিৎ এই কঠোর সত্য বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি করছে ; কিন্তু ভারতের আজ এমনি দুর্ভাগ্য যে ঐ তীক্ষ্ণ সত্য স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলে ভারতবাসীরাই গাল দিয়ে তোমায় দেশ ছাড়া করবে। ভারতের শাশ্বত সদ্ধর্ম্ম আজ এমন একটা আত্মবিস্মৃতির কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে তাকে সচেতন করতে গেলে লাঠি খেতে হবে। দীর্ঘদিনের এই বিস্মৃতিতে বর্ত্তমানের ভ্রান্তনীতি অহিফেন-বিষ সঞ্চারিত করে দিচ্ছে, আর এই অবস্থা এমন শেকড় বসিয়েছে যে তাকে উৎখাৎ করতে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। ইন্দ্রজিতের অন্তর দুঃখবেদনায় মুহ্যমান হয়ে উঠছে। সন্ন্যাসানী বললেন,—ভয় নাই ইন্দ্রজিৎ, নিরাশ হবার কোনো কারণ নেই। যে কাপুরুষতা আজ সারা ভারতে প্রভাব জাগিয়াছে তার অন্তকাল আসন্ন হোয়ে উঠল, ভারতের ধর্ম্মচেতনা অন্যের ধর্ম্মান্ধতার আঘাতেই জেগে উঠেছে। তাই আজ বাংলা, পাঞ্জাব বিভক্ত হবার দাবী শত সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত হয়। এমন কি দেশের একছত্র নেতাও সেই অমোঘ দাবীকে তিলমাত্র দাবাতে পারেন না—কিন্তু থাক এসব কথা। তোমাদের আজই মাদ্রাজ রওনা হতে হবে। ওদিকে প্রাচীন সংস্কৃতি এবং সমাজ ব্যবস্থার উৎকর্ষতা ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা দরকার তোমাদের। আমাদের শ্রীগুরুদের যে সাধনায় রত আছেন এবং আমরা যে কাজ নিয়ে সমগ্র ভারতের সর্ব্বত্র সঙ্ঘ স্থাপন করছি সেটা আমরা করে চলি। এই সঙ্ঘ শক্তির ভিতর যে সৎ ধর্ম্মশক্তি, যে মনুষ্যত্ব-বোধ জাগ্রত হবে সেই শক্তিই ভারতকে রক্ষা করবে।

ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ। এদেশের রাজনৈতিক প্রধান প্রতিষ্ঠানও হিন্দুত্ববোধে জাগ্রত থাকবে। তাকে কস্‌মোপলিটন করবার কোনো অধিকার কারো নেই। যে রাজনীতি দেশের মানুষের ধর্ম্ম এবং নারীর সতীত্ব রক্ষা করতে পারে না; মানুষকে দুবেলা পেট ভরে খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে না—শুধু ত্যাগ আর অহিংসার আশ্রয়ে আত্মগোপন করে—সে রাজনীতির কোনোই প্রয়োজন নেই আজ। সারাপৃথিবীকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করে মহামানব

সাজবার আগে আমাদিকে নিজে বাঁচতে হবে। নইলে তুমি ভিখিরী, তোমার কথা কেউ শুনবেনা।

—ভারতে অহিংস সংগ্রামের প্রয়োজন ছিল মা—ইন্দ্রজিৎ বললো।

—ঠিক প্রয়োজন ছিল কি না, বলা যায় না; এবং এটা নিশ্চয় সত্য যে অহিংস সংগ্রাম না করেও বহু জাতি স্বাধীন হয়েছে পৃথিবীতে—বরং ভাল ভাবেই হয়েছে—নিজেদের সেই বীরত্বগৌরবে ভবিষ্যৎ বংশধরকে অভিসিঞ্চিত করে গেছে। ইংরাজ আজ তোমার পূর্ণ সহযোগিতা না পেলে পৃথিবীর রাষ্ট্র-নীতিক্ষেত্রে কৃপার পাত্র হয়ে যাবে—তাই এটা দিচ্ছে। স্বাধীনতা কেউ ইচ্ছে করে দিয়ে যায় না বৎস! আধ্যাত্মিক বাণীর সঙ্গে পার্থিব স্বাধীনতার সংযোগ বিয়োগ অতিসামান্য কিন্তু ট্রেনের সময় হয়ে এল—তোমরা প্রস্তুত হও।

ইন্দ্রজিৎও আর কিছু বললো না—তৈরী হবার জন্য নিজের যৎসামান্য জিনিষ গুছিয়ে নিতে গেল। অজয়ও ওর সঙ্গে যাবে। মাদ্রাজ থেকে ত্রিবাঙ্কুর এবং আরও কয়েকটি দেশীয় রাজ্য ভ্রমণ করতে হবে ইন্দ্রজিৎকে। ট্রেনে যাতায়াতের অসুবিধা তো আছেই এবং সময় বড্ড বেশী লাগে। নেতারা নিত্য নিত্য হিল্লী দিল্লী যাতায়াত করেন আজকাল এরোপ্লেনে। ইন্দ্রজিৎ নিজের মনেই হাসলো। নেতৃত্ব সম্বন্ধে কয়েকজন বিখ্যাত মনীষীর বাণী মনে পড়ে গেল, তাঁর মধ্যে একজন ভারতীয় লোকের কথাটা মনে পড়তেই হাসি এল। তিনি বলেছেন,—প্রচুর ধন কিম্বা প্রচুর দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রচুর শাঠ্যবুদ্ধি না থাকলে নেতা হওয়া যায় না।

কথাটা সত্যি কি না, কে জানে? ভারতের যুগেতিহাসে নিশ্চয়ই ওর সত্যতা যাচাই হয়ে যাবে একদিন। গত কাল যারা নেতা ছিলেন, তাঁরা আজ নেই, আবার আজ যারা আছেন, কাল তাঁরা থাকবেন না—কিন্তু দেশ এবং তার ইতিহাস থাকবেই। সেই ইতিহাস অগ্নির অক্ষরে লেখা হবে—আগামী যুগের মানুষ ক্ষমা করবে না নেতাদের কোন দুর্ব্বলতাকে! কিন্তু থাক ওসব চিন্তা,—

ইন্দ্রজিৎ অজয়কে সঙ্গে নিয়ে ষ্টেসনের পথে বেরিয়ে পড়লো—দুপাশের তরুলতা যেন তাদের মুখের পানে চেয়ে চেয়ে কতকি বলছে। ভারত স্বাধীন হ'লে ওরাও নিশ্চয় আরো পুষ্ট হবে, আরও নধর হবে—কিন্তু ভারত কি সত্যি স্বাধীন হবে! ইংরাজরাজ্যের এই দান তো ভারতকে আরও দীর্ঘদিনের জন্য পরাধীন করবার মতলব।

উঠে পড়ে লেগেছে সুবোধ কারখানা প্রতিষ্ঠার কাজে। এই উপযুক্ত সময়। দেশে শিল্প-প্রসারের জন্য নেতাদের পুনঃপুন আবেদন, তার সঙ্গে টাকার বাজারে ইন্‌ক্রেসান এবং মজুরের বাজারে বারম্বার ধর্ম্মঘট ইত্যাদি দেখে সুবোধ ঠিক করলো, কারখানাটা চালু ক'রে নেওয়া যাবে। এই উদ্দেশ্যে সে দুজন বিশেষজ্ঞ আনিয়েছে এবং কাজও আরম্ভ করে দিয়েছে। কিন্তু একজন নামকরা নেতাকে ওর দরকার—তাই স্বাহার স্বামীকে খুঁজতে এসেছিল। অবশ্য সে নিজেও বর্ত্তমানে উপনেতা এবং দেশের কাজে নেতাদের হাতে কয়েকবার মোটা অঙ্কের টাকা দান করার জন্য তারও নাম খবরের কাগজের তৃতীয় চতুর্থ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে চার পাঁচ বার; কাগজের সেই কাটিংগুলো পরম যত্নে আটকে রেখেছে সুবোধ বিশেষ চড়াদামে কেনা চামড়া বাঁধানো খাতার পাতায়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের যুগ-নেতৃত্বের অরণ্যে ওর নামটা কয়জনইবা মনে রেখেছে। সুবোধ একবার নির্ব্বাচনে দাঁড়াতে চায়—দাঁড়াতে না পারলেও তার নামটা প্রচার হয়ে যেতে পারবে অন্তত ফেলের সার্টিফিকেট হিসাবে।

কিন্তু এর জন্য দরকার একজন ঝানু নেতার সহযোগিতা। দেশের বহু দলের মধ্যে যে কোনো দলে সুবোধ যে কোনো সময় যোগ দিতে পারতো, কিন্তু তার দৃঢ় ধারণা কংগ্রেসই একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং বড় হবার

এতবড় সুযোগ আর কোথাও পাওয়া যাবে না। কংগ্রেসের ষাট বছরের ইতিহাস আলোচনা করবার জন্য সুবোধ আট-দশখানা বই কিনে ফেলেছে—অবশ্য কাজের চাপে কোনোটার দশপাতা, কোনোটার বিশ পাতার বেশি পড়া হয় নি! তা না হোক, বইগুলো সে বৈঠকখানার মধ্যে সকলের দৃষ্টিগোচর করে সাজিয়ে রেখেছে; আপনি গেলেই দেখতে পাবেন, চক্‌চক্‌ ঝক্‌ঝক্‌ করছে বইগুলো।

সুবোধ লেখাপড়া ভালই শিখেছে এবং জমিদারী বুদ্ধি তার পাটোয়ারী বুদ্ধিতে পাকা হয়ে উঠেছে ব্ল্যাক মারকেটের মারপ্যাচে! অতএব সে যে-কোন কাজেই সিদ্ধিলাভ করবে, এ জানাকথা। কিন্তু গত উনিশ শত ছেচল্লিশ সালের জুলাইয়ের বৃটিশ ঘোষণার পর আবার সাতচল্লিশ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণা বিশেষ চিন্তিত করে তুললো সুবোধকে। তারপরই আবার এল ৩রা জুনের ঘোষণা—ব্যস্‌, সব একেবারে ওলোট-পালট হয়ে গেল! ভারত ভাগ হয়ে যাবে—তার থেকে ভয়ের কথা, বাংলাটাও ভাগ হয়ে যাবে। এখন কি কর্ত্তব্য?

প্রায় মাস তিনেক থেকে বাংলা ভাগ করবার আন্দোলন যেন আকস্মিক-জাগা দাবানলের মত জ্বলে উঠেছিল দেশে। শুধু বাংলায় নয়, বাংলার বাইরে, ভারতের যে-কোনো কোণে বাঙালী আছে, সেখান থেকেই তারস্বরে দাবী করা হোল বাংলা ভাগকরে দেওয়া হোক। এই অত্যাশ্চর্য্য সঙ্ঘশক্তিকে প্রতিরোধ করার শক্তি স্বয়ং ঈশ্বরেরও নাই বোধ হয়—তাই বৃটিশশক্তি ৩রা জুনের প্রস্তাবে বঙ্গবিভাগ সমর্থন করলেন এবং বিভাগের ব্যবস্থাটা এই দেশের মানুষদের দ্বারা সমর্থন করিয়ে নেবারও ব্যবস্থা করলেন। আশ্চর্য্য তাঁদের রাজনীতি! অখণ্ড ভারতের চির-উপাসক কংগ্রেসের দ্বারাই গৃহীত হতে বাধ্য করালেন—সে প্রস্তাব গ্রহণ না করে নেতাদের আর কোনো উপায় রইল না; আর যে বাঙ্গালী কার্জনের বঙ্গভঙ্গকে 'একজাতি একভাই এক দেশ' বলে প্রতিরোধ করেছিল সেই বাঙ্গালীর দ্বারাই বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব গ্রহণ করানো হল। ধন্য এই রাজনীতি—আর

শতধন্য সেই নীতির পরিচালকগণ!—কিন্তু অতসব ঐতিহাসিক গবেষণা করবার মত সময় সুবোধের নেই—ইচ্ছাও নেই। তার এখন একান্ত ইচ্ছা আরো কিছু বেশী টাকা তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করা। টাকার নেশায় পেয়েছে সুবোধকে! অত কম বয়সে অমন টাকার নেশা কম লোকেরই হয়। কিন্তু এর কারণ রয়েছে সুবোধের পৈত্রিক জমিদারীর মধ্যে। যারা দরিদ্র এবং যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী, তারা টাকা চায় কিন্তু যথাসাধ্য সদুপায়েই সে টাকা উপার্জ্জন করতে চায়—এবং তাদের অত্যধিক উচ্চাশা নৈতিকতা দ্বারা কতকটা নিয়ন্ত্রিত হবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যারা মধ্যমশ্রেণীর ধনী—অর্থাৎ মিলিওনিয়ারের পর্য্যায় পড়ে না, অথচ মধ্যবিত্তের মধ্যেও পড়ে না, তারাই চায় তাড়াতাড়ি মিলিওনিয়ার হতে, সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনীদের মধ্যে একজন হতে। এইজন্য তারা যে-কোনো রকম নৈতিক আত্মচেতনাকে অনায়াসে গলাটিপে হত্যা করতে পারে—সুবোধ সেই শ্রেণীর লোক। কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যুক্তির অভাব এদের কোনোদিনই হয় না—তাই সুবোধ যুক্তি দেয়—টাকা উপার্জ্জন করার শক্তি ভগবদ্দত্ত—টাকা ঈশ্বরের করুণার দান—ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদ এবং সে যেমন দুহাতে রোজগার করছে, তেমনি দেশের কাজে দানও করছে যথেষ্ট!—একথা বলবার উদ্দেশ্য, সুবোধ এই পাঁচ-ছ বছরের মধ্যে কয়েকবারই দুহাজার পাঁচহাজার করে টাকা জন-তহবিলের দান করেছে।—এই দানের জন্য প্রচুর আত্মপ্রসাদ অনুভব করে সুবোধ এবং তার ধারণা, কলকাতার বড় বড় নেতাদের মজলিসেও তার নাম নিয়ে নিশ্চয় আলোচনা হচ্ছে আজকাল; কিন্তু ক্ষুদ্রগ্রামের ক্ষুদ্রতম সুবোধ জানে না যে তার মত সহস্র সহস্র হঠাৎ-দাতা আজকাল ব্লাকমারকেটের ঝড়তি পড়তি টাকার দু' চার হাজার ওরকম ভাবে দান করেন এবং ঐরকম আত্মপ্রসাদই অনুভব করেন।

কিন্তু সুবোধ বুদ্ধিমান। আরো বেশী অর্থ সে উপার্জ্জন করবে এবং তার ব্যবস্থাও করে এনেছে। এদিকে ঈশ্বর যেন ওর সুবিধাও করে দিলেন নিজের

হাতে। বাঙ্গলা ভাগ করে নেবার জন্য যখন বাঙ্গলার অধিবাসীবৃন্দ একযোটে দাবী করে লাটবেলাটকে প্রায় উদ্বাস্ত করে তুললো, ঠিক সেই সময় অকস্মাৎ এলেন মহাত্মা গান্ধী বাঙ্গলা বিভাগ রোধ করবার আবেদন অর্থাৎ আদেশ নিয়ে। বললেন, বাঙ্গলা ভাগকরার আগে তাঁকেই দুটুকরো করা হোক—কেন যে বললেন তা তিনিই জানেন—মহাত্মার আচার আচরণ সাধারণ লোকের বোধগম্য হওয়া সম্ভব নয়—কিন্তু অত্যাচার আর উৎপীড়নে, বাঙ্গালী হিন্দু তখন মরিয়া হয়ে আত্মরক্ষার উপায়স্বরূপ ঐ একমাত্র পথ বেছে নিয়েছে—বঙ্গভঙ্গ। আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য, যুগার্জিত সাধনায় লব্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অর্দ্ধাংশকেও অন্ততঃ বাঁচিয়ে রাখতে বাঙ্গালী হিন্দু তখন জীবন পণ করেছে। নোয়াখালি-ত্রিপুরার নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডের রক্তস্রোতে, সংখ্যাহীন নারীর উপর পাশব পীড়নের আর্ত্তরোলে এবং পুরুষপরম্পরাগত সদ্ধর্ম্মের ধ্বংসলীলায় বাঙ্গালী হিন্দুর মানসিক আতঙ্ক তখন কোনো মহাত্মার মহাবাণীতে কর্ণপাত করবার মত স্থিতিশীল নেই—অহিংস হয়ে বীরের মত মৃত্যুবরণ কর—এতেই অহিংসা অস্ত্রের জয় হবে,—আত্মহত্যা করে নারীত্বের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখ—এসব কথা তখন আর কোনো কাজে লাগলো না! বাঙ্গালী নিশ্চয় ভাগ করে নেবে তার মাতৃ-ভূমিকে—পূর্ব্ব এবং পশ্চিম বঙ্গে! এই মহাদুর্ভাগা দেশের সহস্র দুর্ভাগ্যের নিকৃষ্ট দুর্ভাগ্য স্বেচ্ছায় বরণ করতে হবে। আত্মহত্যাই করতে হোল বাঙ্গালীকে পরক্ষোভাবে—কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এর দায়িত্ব পড়বে কাদের ওপর, কোন্ দুর্ব্বল নীতির জন্য এই আত্মলাঞ্ছনা এবং আত্মহত্যা আজ করতে হোচ্ছে—মহাকাল দেখে রাখছেন।

কিন্তু এই ব্যাপারে সুবোধের বেশ কিছু সুবিধা হয়ে গেল। প্রথম সুবিধা, তার বাড়ী এবং জমিদারী পশ্চিমবঙ্গের শেষ প্রান্তে, কাজেই পাকিস্তান থেকে বহু দূরে পড়লো, দ্বিতীয়তঃ পশ্চিমবঙ্গ থেকে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের সমর্থনে বড় বড় কয়েকটা সভা সমিতি ডেকে বক্তৃতা দিয়ে সে অনেকটা পরিচিত হ'য়ে উঠলো দেশের মধ্যে, তৃতীয়তঃ এবং সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুযোগ তার জমিদারীর

মধ্যে বহু শত বিঘা অনাবাদী জমির একটা ভাল হিল্লে হয়ে গেল। পূর্ব্ববঙ্গের ভীত সন্ত্রস্ত হিন্দু অধিবাসীরা বারম্বার আবেদন করছেন, পশ্চিমবঙ্গের সহৃদয় জমিদারগণ তাঁদেরকে যৎকিঞ্চিত জমিও দিলে তাঁরা সপরিবারে পশ্চিমবঙ্গে এসে বসবাস করবেন। সুবোধের বিস্তর জমি পতিত রয়েছে নদীর ধারে, পাহাড়ের অরণ্য-সান্নিধ্যে এবং ইতস্ততঃ আরও বহুস্থানে। সুবোধ পূর্ব্ববঙ্গের বিপন্ন লোকদের জানালো জমি দেবার জন্যে সে প্রস্তুত—এবং সেই জমির জন্য চতুর্গুণ, অষ্টগুণ মূল্য প্রদান করে পূর্ব্ব-বঙ্গের ভ্রাতা-ভগ্নিগণ অনুগ্রহ করে আতিথ্য গ্রহণ করলে সে কৃতার্থ হয়ে যাবে!

এলেন বহু পরিবার—সুবোধ তাদের জমি তো দিলোই, যথা সম্ভব প্রাথমিক সাহায্যও করলো, এবং সাড়ম্বরে খবরের কাগজে তার দানের কথা পূর্ব্ববঙ্গ বাসীদের দিয়েই প্রচার করলো। এ সব জমি কোনোদিন তার কোনো কাজে আসতো কিনা সন্দেহ। তাই ওর বাবা একদিন হেসে বলেছিলেন—উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ করছিস নাকি রে সুবোধ?

সুবোধ বাপের যোগ্য ছেলে। উত্তর দিল—ভোগের চালে কণ্ট্রোল বাবা; গোবিন্দ উড়ো খৈ পেলেই বর্ত্তে যাবে।

পূর্ব্ববঙ্গের অনেকগুলি পরিবার এসে বাসা বাঁধলো। পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে—নিজের বাল্য লীলাভূমি ছেড়ে, নিজের বংশগত পূজা-অর্চ্চনা আচার-অনুষ্ঠান ছেড়ে তারা আসতে বাধ্য হোলেন এই দেশে। নদীবহুল, বেতস-বন সমাচ্ছন্ন, সৌন্দর্য্যের রাণীকে ত্যাগ করে ওরা বড় দুঃখেই এলেন—আসার আগে কত চোখের জল ফেলে এলেন সেই পল্লল সমাচ্ছন্ন কোমল মৃত্তিকায়, মাটি-মাই তা জেনে রাখলেন এবং আগামী যুগের ইতিহাস তা লিখে রাখবে—কিন্তু যারা আসতে পারলো না, তাদের সংখ্যা যে অসংখ্য! তাদের জন্য কি ব্যবস্থা এরা করবেন?—এরা, যাঁরা অহিংস সংগ্রামের অমোঘ অস্ত্র দিয়ে সারা পৃথিবীটাকেই অহিংসক বানাতে চান? দেখবে মহাকাল আর ফলভোগ করবে দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ। কিন্তু তার জন্য দায়ী ইংরাজ শুধু নয় ভারতবাসীও। ভারতের স্বাধীনতা

যুদ্ধে প্রয়োজন ছিল অসহযোগের, প্রয়োজন ছিল ধর্ম্মঘটের, প্রয়োজন ছিল বিদেশী-বর্জ্জন বা বিলাসিতা রোধের, হয়তো অহিংস হবারও প্রয়োজন ছিল—কিন্তু অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য অস্ত্রত্যাগের নিশ্চয় প্রয়োজন ছিলনা।

সুবোধ চতুর্থ দফায় সুযোগ পেল—যাঁরা এলেন পূর্ব্ববঙ্গ থেকে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন অসাধারণ অধ্যবসায়ী এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁদেরই সাহায্য নিয়ে সুবোধ ঐ মিলটা খাড়া করে তুলছে। তাঁরাই হয়েছেন এই কাজে অগ্রণী কিন্তু এখানকার কয়েকজন নেতারও পূর্ণ সমর্থন না পেলে কাজ করার অসুবিধা হচ্ছে। তাই সুবোধ আজ গিয়েছিল লকুর দাদাকে ডাকতে। অমন যোগ্য লোক এ তল্লাটে নাই।

উনি নিশ্চয় আসবেন।

সুবোধ সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় বসে আছে! আরও দু'তিন জন আসবেন, এখনো কেউ পৌছেন নাই। সুবোধ একা বসে ভাবছিল—ভাবছিল ব্যবসার কথা নয়, একখানা মুখ! সারাদিনই সেই মুখখানার কথা ভেবেছে সুবোধ—এবং এর আগেও ভেবেছে কিন্তু এই সন্ধ্যার আধো অন্ধকার ঘরে একলা বসে সুবোধের তরুণ প্রাণ কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠতে লাগল সেঁজুতির কালো চোখের ঝলমল দৃষ্টি মনে করে। ওর থেকে সুন্দরী, ওর থেকে গুণবতী মেয়ে সুবোধের কণ্ঠে মাল্য দিতে পারলে ধন্য হয়ে যাবে, কিন্তু সুবোধের অন্তরাত্মা যেন ওকেই জয় করে অধীকার করতে চায়; ধন দিয়ে ওকে পাওয়া যাবে না—মান দিয়েও নয়—ওকে যা দিয়ে পাওয়া যাবে—তা মেকী দেশপ্রেমও নয়—তাই সুবোধ বুদ্ধিতে শান দিচ্ছে, —শান দিচ্ছে কুটনীতিতে।

কিন্তু সেঁজুতি অসাধারণ এ গাঁয়ে, এ খবর সুবোধের অজানা নয়, তাই নীতিটাকে অত্যন্ত সংগোপনে পরিচালনা করতে হবে, ঠিক ইংরাজের কংগ্রেস কর্ত্তৃক ভারত বিভাগের নীতি স্বীকার করিয়ে নেবার মত সংঙ্গোপনে চালাতে হবে এই নীতি। চার্চ্চিল, এটলি, লিস্টওয়েলকে স্মরণ করলো সুবোধ!

বড়দা আসছেন!

—আসুন, বড়দা আসুন!

সুবোধ উঠে দাঁড়িয়ে সম্বর্দ্ধনা করলো, উনি বললেন,

—আমাকে কেন ডেকেছ ভাই সুবোধ?

—বসুন—বিশেষ জরুরী দরকার আছে।

নিজেই হাত ধরে ওঁকে চৌকীতে বসাল সুবোধ!

অন্ধকার অপসারিত করে আকাশে চাঁদের উদয় হচ্ছে—কিন্তু পুঞ্জীভূত অন্ধকার—তার উপর কাজল কালো মেঘে ঢেকে গেছে নক্ষত্রপুঞ্জ। কে জানে ঐ ক্ষীণ চন্দ্র এই সুবিপুল অন্ধকার অপসারিত করতে পারবে কি না! লোকাধীশ মস্তবড় পার্কটার এক কোণায় বসে ভাবছিল। কৃষ্ণাকে সে মহিলা-মণ্ডপে' এইমাত্র পৌছেদিয়ে এখানে এসে বসেছে। তার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা ঠিক করবার জন্যই ভাবছিল—কিন্তু আকাশের পানে চেয়ে ওর মনটা নিরাশ হয়ে পড়ছে। এত বেশি আঁধার আজ ভারতের আকাশে! একে দীপ্ত করে তুলবার জন্য যে সহস্র সূর্য্যের দরকার হবে। ঐ ক্ষীণ চন্দ্র কি পারবে এ আঁধার দূর করতে! অসম্ভব। কিন্তু ঐ ক্ষীণালোকে পথ তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—লোকাধীশের মনে অকস্মাৎ আশালোক জাগলো,—সেই পথ বেয়ে পৌছাবো আমরা পূজামন্দিরে, রাত্রি হয়তো তার তপস্যা তখন শেষ করবে—উদয় হবেন দীপ্ত দিবাকর।

লোকাধীশ উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো। পার্কের জনসংখ্যা এখন নগণ্য। সাম্প্রদায়িক অশান্তির জন্য কাজকারবার কম থাকায় গৃহস্থের হাঁড়িও বন্ধ—তার পর কারফিউ। অবশ্য এ পার্কটায় কারফিউ নেই; এখানে-সেখানে মাত্র জনকয়েক লোক ঘুরছে। লকুও ধীরেধীরে পায়চারী করতে লাগলো,—আর ভাবতে লাগলো!

কংগ্রেস ভারত বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে—এবং তার অনিবার্য্য পরিণতি হিসাবে বাংলা বিভক্ত হবার প্রস্তাবও গৃহীত হোল! ভারতমাতা শুধু হিন্দুস্থান—পাকিস্তানেই বিভক্ত হচ্ছেন না, হয়তো শত খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যাবেন। বৃটিশ-কূটনীতির অপ্রতিহত বিজয়াভিযান! প্রায় দুশত বৎসর পূর্ব্বে বৃটিশ একদিন ভারতকে বিছিন্ন এবং পরস্পরের প্রতি দ্বেষদুষ্ট দেখেই অনায়াসে স্বপ্রভুত্ব কায়েম করতে পেরেছিল, আজ দুশত বছর পরে সেই ভারতকে দুর্ব্বল, দরিদ্র এবং বিচ্ছিন্ন রেখেই বিদায় নিচ্ছে। যখন "মার্শালপ্ল্যান" সমর্থন করে সারা ইউরোপকে আর্থিক সঙ্গতিতে ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিসম্পন্ন করবার জন্য চার্চ্চিল-পন্থীগণ বদ্ধপরিকর, সেই সময়েই সেই চার্চ্চিল পন্থীগণই মহা আড়ম্বরে ভারত বিভাগ সমর্থন করলেন; 'ধর্ম্মের ভিত্তিতে এই পৃথকীকরণ ইতিহাসের ভিত্তিতেও পৃথকীকরণ'*—সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের ব্যাপার ঘটাচ্ছেন দেশীয় রাজন্যবৃন্দ। এতকাল তাঁরা বৃটিশশক্তির অধীনে বেশ নিরাপদেই ঘোড়দৌড়ের বিলাসিতায় দিন কাটাচ্ছিলেন—ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে একটি অঙ্গুলিও তোলেন নি—বরং সাধ্যমত বাধা দিয়েছেন, কিন্তু আজ ভারত যখন স্বাধীন হতে যাচ্ছে, তখন তাঁরা সেই স্বাধীন ভারতে স্বমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেও সহযোগিতা করতে চাইছেন না—চাইছেন স্বয়ং স্বাধীনতা অর্থাৎ ভারতের যুক্তরাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁদের স্বৈরতন্ত্রকেই কায়েমী রাখতে! গণতন্ত্রের এই প্রবল স্রোতের মুখেও তারা কোন্ সাহসে এতখানা সাহসী, চিন্তাকরে দেখলেই বেশ বোঝা যায়—কার স্বার্থ এর সঙ্গে জড়িত! কেন বৃটিশশক্তি সার্ব্বভৌমত্ব প্রত্যাহার করার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজন্যবৃন্দের পূর্ণ স্বাধানতা ঘোষণার সুযোগ ঘটছে। কিন্তু ভারতমাতার দুর্ভাগ্য যে এতে কত ভয়ঙ্কর হবে—তাই ভেবে ভারতের নিষ্ঠাবান সন্তানদের চোখে আজ ঘুম নেই;—এই ভয়ঙ্কর অবস্থার প্রতিরোধ করতেই হবে—নইলে ভারত শতখণ্ডে বিভক্ত হয়ে পরস্পর ঈর্ষা-বিদ্বেষ-বিরোধে

*Separation by Religion is Separation by History—S. Radha Krishnan H. S. 3-7-47

দুর্ব্বল তো হবেই—অচিরে কোনো প্রবল শক্তি গ্রাস করবে ভারতকে। তাহলে ইংরাজের কাছথেকে এত কষ্টে পাওয়া স্বাধীনতার সবই ব্যর্থ হবে।

কিন্তু লোকাধীশ এর কোনো প্রতিকার করিতে পারে না। তার কর্ম্মক্ষেত্র নিতান্তই স্বল্পবিস্তৃত সাহিত্যের ক্ষেত্র—যদিও সেই ক্ষেত্রই বহুবিস্তৃত হওয়া উচিৎ—এবং ভারত ব্যতীত অন্য যে-কোনো দেশেই সেটা হয়। কিন্তু এখানে তা হবার সম্ভাবনা কিছুমাত্র আছে, এমন আশাও দেখা যাচ্ছে না। সাহিত্যিককে রাজনৈতিক নেতার মর্য্যাদা দেবার মত মনোবৃত্তি এদেশের মানুষের মধ্যে জাগতে এখনো শতাব্দি কাল বিলম্ব আছে। এবং সে মনোবৃত্তি জাগাবার অনুকূলে যে কর্ম্মচেষ্টা, তা পরিচালন করবার মত শক্তিমানই বা কৈ?

লোকাধীশের দীর্ঘশ্বাসটা পার্কের বাতাসে মিশে গেল! "হে মোর দুর্ভাগা দেশ"—কথাটা অনুচ্চ স্বরে উচ্চারণ করলো লোকাধীশ। যে মহামানব ঐ গভীরতম হতাশার বাণী উচ্চারণ করে গেছেন, তাঁর সৌম্য-স্নিগ্ধ ঋষি-মূর্ত্তি মনে পড়লো—মনে পড়লো, তিনি পুনঃ পুনঃ বলেছেন—

পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য-হিমাচল যমুনা-গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ,
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে
গাহে তব জয় গাথা
জনগণঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা!
জয় হে! জয় হে!

হায়রে ঐক্যবদ্ধ ভারত! হায়রে মহাকবির মহাবাণী উৎসারিত-দেবভূমি বঙ্গ। আজ তোমার অঙ্গচ্ছেদের দূষিত ক্ষতকে কোন মহৌষধীতে নিরাময় করা যেতে পারবে?

লোকাধীশ কয়েক মিনিট পায়চারী করলো। ভারত বিভাগ এবং বঙ্গ পাঞ্জাব বিভাগ বর্ত্তমানে মন্দের ভাল, তাই নেতাগণ এই সময়োচিত পন্থাই গ্রহণ করলেন

কিন্তু আবার কি সময় আসবে সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর অখণ্ড ভারতকে এক রাষ্ট্রের ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত করবার ?

কিন্তু প্রত্যেক ব্যাপারের বাস্তব সমস্যা আছে—তার সম্মুখীন হতেই হবে মানুষকে ;—আজ সেই মহাসমস্যার সম্মুখীন হয়েছে ভারত এবং বাঙ্গলা, পাঞ্জাব, শ্রীহট্ট, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। ইংরাজরাজ প্রায় দুশো বছর রাজত্ব করে ভারতকে ছেড়ে যাবার সময় বেশ পাকা ব্যবস্থা করে গেলেন ভারতের গৃহ-বিবাদটা পাকাপাকি করে জীইয়ে রাখবার। কিন্তু—

"মুক্ত করো ভয়—
আপনমনে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়—
ধর্ম্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান,
নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিও প্রাণ......"

লোকাধীশের কণ্ঠ অনুচ্চ সঙ্গীতের সুরে ঝঙ্কৃত হচ্ছে—গভীর বেদনাময় অথচ আশায় উৎসারিত। দুটি যুবক একটি বেঞ্চে বসে আলোচনা করছিল নিজেদের মধ্যে কি যেন কথা। লোকাধীশের গান শুনতে পেল।

—মুক্ত করো ভয়—
দুরূহ কাজে নিজেরি দিও কঠিন পরিচয়।

—পরিচয় আর দিবেন কি স্যার ? পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল ! এর পর পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুভাইদের রক্ষার কাজে আসতে পারবেন আমাদের সঙ্গে ?

লোকাধীশ সচমকে চেয়ে দেখলো ওদের। আস্তে এগিয়ে এসে বললো, আপনারা কি তার জন্য কোনো সঙ্ঘ গঠন করছেন ?

—হ্যাঁ—একজন যুবক বললো, শুধু গঠন করছি না, গঠিত হয়ে গেছে। আশাকরি, আপনারও সক্রিয় সহযোগিতা পেতে পারবো সে কাজে !

—অবশ্যই। কিন্তু আপনাদের কর্ম্মনীতি এবং পদ্ধতি আমার জানা দরকার ! তাছাড়া আমার কাজ অর্থাৎ যে কাজে আমি আত্মনিয়োগ করেছি, সেটাও আমায় করতে হবে—আমার কর্ম্মপন্থাও আপনাদের জানাচ্ছি আমি !

ওরা নিজেদের দুজনের মাঝখানে লোকাধীশের বসবার স্থান করে দিল। লোকাধীশ একবার চারদিক চেয়ে দেখলো এবং ভাবলো যে এই নির্জ্জন পার্কে এতটা রাত্রির আদ্ধো অন্ধকারে একান্ত অপরিচিত দুজন লোককে বিশ্বাস করা তার ঠিক হচ্ছে কি না—কিন্তু সর্ব্বভয় এবং সংশয় মন থেকে ঝেড়ে ফেলে সে বলতে আরম্ভ করলো,—আমি সাহিত্য নিযে কারবার করি—সাহিত্যের মধ্যে ভারতের ধর্ম্মসাধনা, সমাজ-সাধনা এবং সংগঠনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করাই আমার উদ্দেশ্য!

—উদ্দেশ্য তো খুবই মহান, কিন্তু উপায় কি? কি করছেন? বিনা মূল্যে বই লিখে প্রচার করবেন? সে সব বইএর ছেঁড়া কাগজে দোকানের মালমসলা বাঁধী হয়! বিশেষ কেউ লড়ে বলে তো মনে হয় না!

—তা হোক—তাতেও কিছু কাজ হচ্ছে! তবে বিনামূল্যে কিছু করবার মত ক্ষমতা আমার নেই—আমি মূল্য নিয়েই বই বিক্রী করি এবং শুনেছি, সে সব বই পাঠক সমজে স্থানও পায়।

—ওঃ, তাহলে বলুন যে আপনি একজন সত্যিকার সাহিত্যিক! মশায়ের নামটি?

—লোকাধীশ।—বলে সে একটু থামলো। যুবকদুটি ঐ নামের সঙ্গে নিশ্চয় পরিচিত, এই ভেবেই সে থেমেছিল কিন্তু ওরা শুধু বললো,

—বেশ, তা আপনার কি কি বই বাজারে বেরিয়েছে? কোন বই সিনেমায় উঠেছে?

—আজ্ঞে না, সিনেমার জন্য আমি লিখি না—আমি লিখি মানুষের অন্তরের কাছে আবেদন জানিয়ে, আমার দুর্ভাগা দেশের দুঃখদুর্গতির প্রতিকারের উপায় চিন্তা করতে বলি—আমাদের দুঃসহ পরাধীনতার মধ্যে সাংস্কৃতিক পরাজয়ও যাতে না ঘটতে পারে তার জন্য অবহিত থাকতে বলি, আর বলি, আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে সমস্ত ক্লৈব্য পরিত্যাগ করে সবলে সগর্ব্ব-পদে অনাগত দিনকে বরণ করে নিতে—এই আমার কাজ।

—খুব সুন্দর কথা কিন্তু বর্ত্তমানে বাঙালীর একমাত্র প্রয়োজন হিন্দু-সংগঠন ! বিভক্ত বাংলার হিন্দু-অংশ যাতে আত্মশক্তিতে সুদৃঢ় হয় এবং বিচ্ছিন্ন অংশের ভ্রাতাভগ্নিদের সক্রিয় সাহায্য করতে সক্ষম হয়, তাই এখন আমাদের করতে হবে—এর জন্য অপরিমিত সাহস এবং জীবনত্যাগের মত সুদৃঢ় সংকল্প চাই। আপনি কি প্রস্তুত আছেন ?

লোকাধীশ একটু চিন্তা করলো, তারপর আস্তে বললো,—জীবন পণ করেই আমি আমার কাজে নেমেছি, কাজেই মৃত্যুভয় আমার নেই। কিন্তু আপনাদের কর্ম্মপদ্ধতির সবটুকু আমায় জানতে হবে।

—পদ্ধতি প্রয়োজনানুরূপ—ওদের একজন বললো—পদ্ধতি স্থির করে কোনো কাজ করতে যাওয়া এযুগে সম্ভব নয়—তবে আমবা অহিংস পদ্ধতিতেই অগ্রসর হব। এইমাত্র বলতে পারি।

লোকাধীশ তথাপি নীরব হয়ে রইল ! অহিংসা-পদ্ধতি নিশ্চয়ই খুব ভাল পদ্ধতি, কিন্তু ভীরুতাকে অহিংসার নামে চালালে জাতীয় ক্লৈব্য হিমাচলের মত অপরিমেয় হয়ে ওঠে ! বাঘের কাছে অহিংস হতে যাওয়া মূর্খতা এবং দস্যুকে অহিংস হয়ে সর্ব্বস্ব ছেড়ে দেওয়ার মত ক্লৈব্যে অহিংসা কথাটার ধর্ম্মগত মর্য্যাদা অপমানিত হয়—বর্ত্তমানে তাই হয়েছে। এদের 'অহিংসা' কোন শ্রেণীর ?—লোকাধীশ প্রশ্ন করলো,—'অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং—' হিংসাকে অহিংসা দিয়ে জয় করা নিশ্চয়ই খুব উচ্চশ্রেণীর অধ্যাত্মিক নীতি এবং এ নীতি হাজার হাজার বছর ভারতের আকাশে বাতাসে জেগে আছে—কিন্তু সে নীতি শিবের, প্রলয়ের রুদ্রশক্তি যাঁর আয়ত্তীভূত, যিনি কটাক্ষে বিশ্ব ধ্বংস করতে সমর্থ অথচ যিনি সর্ব্বত্র শিবময়—যিনি অমৃত ছেড়ে বিষটুকু শুধু গ্রহণ করেন—তিনি ত্রিলোকপতি হয়ে শুধু শ্মশানেই বাস করেন—জগতের মঙ্গলের জন্য সমস্ত অমঙ্গল স্বমস্তকে যিনি গ্রহণ করেন।

যুবকদুটি চেয়ে রইল লোকাধীশ আরো কি বলে শুনবার জন্য। লোকু আবার বললো—কিন্তু এ নীতি ব্যক্তিগত ধর্ম্মের নীতি! সমষ্টিগতভাবে একে চালাতে

যাওয়াতে বিপজ্জনক পরিস্থিতিসৃষ্টির আশঙ্কাও যথেষ্ট রয়েছে। যেমন সব দেবতাই শিব হতে পারেন না, তেমনি সব মানুষই অহিংস হবার যোগ্য নয় এবং সে যোগ্যতা অর্জন করবার প্রচেষ্টাও সকলের আয়ত্ত নয়। অসুর বধের জন্য দেবতাগণ অহিংস না হয়ে বিশ্বমাতা চণ্ডিকার উপাসনা করেছিলেন —তখন ঐ শিবশক্তিই শক্তিমান ষড়াননকে সৃষ্টি করেন। গীতায় সর্ব্ব শক্তিমান শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করবার উপদেশ দিয়ে বলছেন—তোমার ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—তুমি যুদ্ধ করবে তোমার ধর্ম্ম রক্ষা করবার জন্য—বাকী যা কিছু কাজ আমার—আমিই বিশ্বের নিয়ন্তা—আমি তোমাকে এই কাজেই নিযুক্ত করছি! শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের ক্লৈব্য অপগত করলেন—নইলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফল অন্য রকম হোত!

—হ্যাঁ—তাতো নিশ্চয়ই—অহিংসার সত্য অর্থ নিশ্চয় ক্লৈব্য নয়।

—না—অহিংসা বীরের ধর্ম্ম; কিন্তু বাঘ যদি তার বীরত্ব দেখাবার জন্য অহিংস হযে ওঠে এবং প্রাণীহত্যা না করে—তাহলে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী —কাজেই আত্মরক্ষাধর্ম্ম তাকে সর্ব্বাগ্রে পালন করতে হবে—একে বলে জৈব প্রয়োজন। মানুষ বাঘ বা ইতর প্রাণী নয়; পুঁথিগত বা নীতিগত ধর্ম্ম মানুষের নিশ্চয় পালনীয়, তার পূর্ব্বে পালনীয় আত্মরক্ষা-ধর্ম্ম! যেখানে আত্মরক্ষার প্রশ্ন সেখানে বীরের মত অহিংস হয়ে মৃত্যু বরণ করায় কোনো বীরত্ব নাই—বরং কাপুরুষতাই প্রকাশ পায়।

যুবকদুটি শুনছিল বলল—ভারত তার অদ্বিতীয় এবং অবিসংবাদী নেতার নেতৃত্বে দীর্ঘ পঁচিশ বছর কিন্তু অহিংসার সাধনা করছে…।

করছে—নেতার আদেশ পালন করে ভারতবাসী নেতার উপর তাদের অবিচল নিষ্ঠা প্রমাণিত করেছে—কিন্তু আজ ভেবে দেখবার সময় এসেছে, এই দীর্ঘ দুর্য্যোগের মধ্যে দিয়ে এত দীর্ঘ পথ পার হয়ে এসে আমরা পেলাম কি’? শাঁস—না খোসা? “অহিংসা” নামক একটা ব্যক্তিগত নীতিকে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ফল সুফল অথবা কুফল হোল—এবং ভবিষ্যতেই বা কি হবে?

—ভারত কিন্তু এই অহিংসা-সংগ্রামের জন্যই স্বাধীনতা পাচ্ছে আজ!

—ভারত স্বাধীনতা পাচ্ছে—পাচ্ছে বিভক্ত, পরস্পর বিদ্বিষ্ট এবং বিষাক্ত একটা ভূমিখণ্ড, যেখানকার মাটিতে সাম্প্রদায়িক বিষ, আকাশে ধর্ম্মান্ধতার অন্ধকার, আর বাতাসে বৈদেশিক বিলাসপুষ্টির লালসা। এই স্বাধীনতার জন্য আমরা দীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দি অনাহার, অপমৃত্যু এবং কারা নির্য্যাতন ভোগ করি নাই—পূর্ণ স্বাধীনতার এই কি সত্য রূপ!

—সেই রূপ আমরা সৃষ্টি করবো!

—হ্যাঁ—সৃষ্টি আমরা করবোই, কিন্তু, কীটদষ্ট বিকৃত স্বরাজ গ্রহণ না করলেই কি আমাদের আত্মমর্য্যাদা বজায় থাকতো না! আজ ইংরাজ স্বপ্রয়োজনেই এই স্বাধীনতা দান করছে এবং সেইটাই বেশি সত্য; সাম্রাজ্যবাদের অবসান-দিন আসন্ন আজ পৃথিবীতে, তাই বৃটিশের এই উদারতা; এরও মূলে আছে ভারতের বিপ্লববাদের নিষ্ঠা, আজাদহিন্দ ফৌজের ঐক্য, নৌ-বিদ্রোহের শক্তি। ব্যক্তি বা মত বিশেষের উপর শ্রদ্ধাশীল হয়ে ইংরাজ স্বাধীনতা দিচ্ছে না। এ সত্য কারো অ-জানা থাকবার কথা নয়—এমন কি—বৃটেনেরই চিন্তানায়ক কয়েকজন সেকথা প্রকাশ করে দিচ্ছেন—যুদ্ধশ্রান্ত বৃটিশসাম্রাজ্য এখন তার বাঁচবার সর্ব্বশেষ উপায় স্বরূপ গ্রহণ করেছে এই পথ—নইলে সারা পৃথিবীতে তার আশার আলোক দেখা যায় না।

—যাই হোক—যে করেই হোক—আমরা তো কিছু পাচ্ছি।

—আমরা তো ভিক্ষা করতে যাই নি; কারো দয়ার দানে আমাদের প্রয়োজন ছিল না।

কয়েক ফোটা জল পড়লো ওদের গায়ে; আকাশ বুঝি কাঁদছে। ওরা উঠে পড়লো, বললো—বৃষ্টি এল; আপনি কোথায় যাবেন?

—এই কাছেই—বলে লোকাধীশও উঠে দাঁড়ালো। সহরে দাঙ্গাহাঙ্গামা চলছে; এত রাত অবধি বাইরে থাকা নিরাপদ নয়—বহুস্থানেই সান্ধ্য আইন জারি আছে—তাই যুবকদুটি তাড়াতাড়ি চলে গেল বাড়ীর দিকে। লোকাধীশ

আস্তে আস্তে তার আস্তানার দিকে ফিরতে লাগলো। বৃষ্টির ছাঁটে ওর সর্ব্বাঙ্গ ভিজছে—কিন্তু ওর মনের উত্তাপ এত বেশী যে বৃষ্টির কথা ও ভাবছেই না। সহপাঠী সনতের বাড়ীতে এসে উঠলো। সনৎ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক—বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করে বসেছিল। বললো,

—এই ডামাডোলের দিনে এতরাত অবধি বাইরে থাকে লকু? এসো!

—বাইরে আর ঘরে আজ বিশেষ তফাৎ আছে নাকি সনৎ!—লকু হাসলো, আজ এই সাম্প্রদায়িক বীভৎসতার দিনে সারা ভারতের কোথাও কি ঘর আছে? সবই যে রণক্ষেত্র! না—সবটাই শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যভূমি!

—সেকথা সত্যি, তবু ঘরে সকলেই একসঙ্গে থাকবো—সনৎও ম্লান হেসে বললো। সনতের বৌ শুভ্রা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল ওদের কাছে। বেশ আপ-টু-ডেট্ মেয়ে; কলকাতার কলেজে পড়া এবং কলকাতিয়ানায় অভ্যস্থা—সৌভাগ্যক্রমে স্বামীর আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও আছে, তাই শুভ্রার তনিমা-তারুণ্যে কোনো বয়সের ছাপ নেই; ষোড়শ থেকে বিংশতির পর্য্যায়ে ওর দেহ-সুষমা চমকিত হচ্ছে, কিন্তু ওর সত্যিকার বয়স ত্রয়োবিংশ। সন্তানাদি হয় নি—হয়তো হতে দেওয়া হয়নি। সনৎ কায়স্থ পুত্র, শুভ্রা ব্রাহ্মণ কন্যা—ওদের পূর্ব্বরাগ কলেজ-জীবনেই পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল। দুবছর হোল, ওদের সিভিল ম্যারেজ হয়েছে।

শুভ্রাও চাকরী করে কোন একটা অফিসে—মোটা মাইনে পায়। দুজনের রোজগারে সংসারটা বেশই স্বচ্ছল, তাছাড়া সনতের পৈত্রিক বাড়ী এবং পিতৃদত্ত কিছু ব্যাঙ্ক ব্যালান্সও আছে। শুভ্রার মা-বাবা সিভিল ম্যারেজের জন্য মেয়েকে ত্যাগ করেছেন।

—রাত হয়ে গেছে—চলুন, হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসুন সব।

শুভ্রাই বললো। ওকে বেলা দশটায় ডিউটিতে যেতে হয়, দিনে বিশ্রাম করতে পারে না—তাই এদিকে রাত নটা-দশটার মধ্যে শুতে না পেলে ওর বড় অস্বস্তি লাগে—রাগও হয়। নেহাৎ স্বামীর বন্ধু, এবং লকু দেখতে

সুন্দর তাই শুভ্রা রাগ চেপে ভদ্রতা দেখাচ্ছে। সনতও বললো—হ্যাঁ লকু, চল, খেতে বসা যাক!

লোকাধীশের মন নানা চিন্তায় ভারগ্রস্থ কিন্তু অতসব এখানে বলা চলে না। এরা দেশের চিন্তা বা রাজনীতির আলোচনা যে না করে তা নয়, তবে যতটুকু করে, নিরাপদ ব্যবধানে থেকেই করে। লকু ভালই জানে সে কথা।

—বৃটিশ শাসন তো শেষ হতে চললো, এইবার নিশ্চয়ই কংগ্রেস ভারতকে নিরাপদ এবং সমৃদ্ধিশালী করে তুলবে—সনৎ বললো খেতে খেতে!

—বৃটিশ শাসন শেষ হওয়া অত সহজ নয় সনৎ—লোকাধীশ গভীর দুঃখের সুরে বলে চললো—প্রত্যক্ষ শাসন যদিবা শেষ হয়, অপ্রত্যক্ষ এবং অপকৌশল পূর্ণ শাসন আরো বহুকাল চলবে। বৃটিশ শুধু রাজনৈতিক ভারতকেই দুশো বছর শাসন আর শোষণ করেনি, ভারতের অর্থনৈতিক ভারকেন্দ্র ধ্বংস করেছে, সমাজনৈতিক মানদণ্ড চুর্ণ করেছে—মানবত্ববোধকে পশুত্বে নামিয়েছে—এক কথায় জীবনকে করেছে জীবন্মৃত! মহাত্মা শিশির কুমার ১৮৬৮ সালের ৭ই মে তারিখ থেকে তাঁর অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি মটো লিখতেন—

> "স্বাধীনতা কালকূটে মরি হায়২
> করেছে কি আর্য্যাসুতে চেনা নাহি যায়—"

দীর্ঘকাল পূর্ব্বে তিনি যা লিখেছিলেন আজ তার সত্যতা তেমনি তীব্র বরং তীব্রতর হয়েছে। ২৮শে মে তারিখে তিনি ঐ পত্রিকাতেই লেখেন।—

"স্বাধীন থাকিবার ইচ্ছা মনুষ্যের স্বাভাবিক, এইজন্য দাসেরা মাঝে মাঝে জুটিয়া যুদ্ধ করিয়াছে, এই নিমিত্ত ১৮৫৭।৫৮ সালের ঘোর সমর হয় আর এই নিমিত্ত আমরা বিরলে বসিয়া ক্রন্দন করিয়া থাকি। ১৮৫৭।৫৮ সালে যেং স্থলে যুদ্ধ হইয়াছিল সেখানে কি কেহ আর একশত বর্ষের মধ্যে মাথা তুলিতে পারিবে? ইংরাজরা কি এইরূপে আমাদিগকে স্বাধীনতার উপযুক্ত করিতেছেন? সমস্ত দেশ নিরস্ত্র করিয়াছেন, এ বুঝি আর একটি উপায়!

এটি নিশ্চিত যে পরাধীন অবস্থায় আমাদের যত সময় যাইতেছে, রোগ ততই অসাধ্য হইতেছে।"*

গভীর বেদনার্ত্ত কণ্ঠস্বর লোকাধীশের। ভাতের গ্রাস তুলে বললো,

—সত্তোর-পঁচাত্তর বছর পূর্ব্বে যা সত্য ছিল, আজ তা আরো তীব্র সত্য!

—কিন্তু কংগ্রেস এবার দেশের মধ্যে নবজীবন আনবে।

—হায়রে কংগ্রেস! একদিন ঐ কংগ্রেসের জন্য আমরা সপরিবারে পথে বেরিয়েছিলাম সনৎ, কিন্তু আজ, ১৯৪৭ সালের জুন মাসের ৩রা তারিখের পর কংগ্রেস সম্বন্ধে সব স্বপ্নই আমার চূর্ণ হয়ে গেল। কংগ্রেস আজ কয়েকজন ধনীর এবং উপর ওয়ালার আয়ত্তাধীন; তাঁদের নির্দ্দেশই চরম। এই কি গণতন্ত্র? আমলা-তন্ত্রের সঙ্গে এর তফাৎ কোথায়, সনৎ! ওঁরা কি মনে করেন, দেশে বুদ্ধিমান লোক আর কেউ নাই ওঁরা ছাড়া! ওঁরা কি মনে করেন, যাঁরা সমাজতন্ত্রী, যাঁরা বামপন্থী, যাঁরা হিন্দুমহাসভাপন্থী বা যাঁরা অন্য যে-কোনো পন্থী—তাঁরা দেশের কেউ নন! একথা যাঁরা মনে করেন তাঁরা অত্যন্ত ভুল করেন। দেশ কোনো দল-বিশেষের সম্পত্তি নয়—দেশ দেশের সকল সন্তানেরই! একথা স্বীকার না করলে আত্মবঞ্চনা করা হয়।

—তাহলে আপনি কি বলছেন হিন্দুমহাসভাই সমর্থন যোগ্য?

শুভ্রার কথার উত্তর দিতে একটু দেরী হোল লোকাধীশের। ভাতের গ্রাসটা চিবিয়ে গিলে বললো—হিন্দুমহাসভাকে সমর্থন করা বা না করার প্রশ্ন উঠতে পারে না। আপনি যখন হিন্দুবংশে জন্মেছেন এবং ধর্ম্মান্তরিত হোন নি, তখন আপনি হিন্দুই—নাহলে আপনি কী, সেইটাই প্রশ্ন থেকে যায়—মহাসভার বা অন্য যে-কোনো রাজনৈতিকদলের সব মত আপনি সমর্থন না করতে পারেন —কিন্তু আপনার হিন্দুত্ব অস্বীকার করবেন কি দিয়ে?

—আমি যদি বলি, আমি শুধু মানুষ!—শুভ্রা হেসে হেসে প্রশ্ন করলো।

—আপনার কথা নিশ্চয় সত্যি—আপনি মানুষ, কিন্তু পৃথিবীতে আরো

* শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বাগল সঙ্কলিত প্রবন্ধ হইতে।

অনেক দেশ আছে এবং সেই সব দেশে আরো অনেক মানুষ আছে—সেখানে গিয়ে আপনি সব বিষয়ে তাদের সমান অধিকার পেতে পারবেন না—কারণ মানুষ হিসাবেও আপনার গায়ে একটা অলক্ষ্য ছাপ আছে—যাতে আপনাকে ভারতীয় এবং হিন্দু বলে পরিচিত হতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীর অন্য দেশে যখন মানুষের মধ্যে শ্রেণীগত, জাতিগত এবং ধর্ম্মগত বিভেদ রয়েছে, তখন আপনি মানুষ, একথা বললে সম্পূর্ণ সত্যটা বলা গেল না। এমন কি, আপনি শুধু ভারতীয় মানুষ, এমন কথা বলেলও সবটা বলা হয় না—কারণ ঐ একই।

সাধারণ শিক্ষিত মেয়েরা যেমন হয়ে থাকে, শুভ্রা একটু তার্কিক প্রকৃতির, বললো—একটা সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রতার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে পরিচয় দেওয়া কি ভাল?

—ক্ষুদ্রতা কেন হবে?—লোকাধীশ বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিত করে তাকালো শুভ্রার পানে—হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করে নিজেকে হিন্দু বলবো না তো কি জরথুষ্ট্রিয়ান বলবো? পৃথিবীর কোনো মানুষ কি নিজেকে কোন ধর্মাবলম্বী বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে?—যদি করে কেউ তো বুঝতে হবে তার মধ্যে কোনো স্বার্থবুদ্ধি নিহিত আছে কিম্বা সে নির্ব্বোধ! ভারতের মহাদুর্ভাগ্য যে গত কয়েকবছর ধরে আপনার মত অনেকেই নিজকে হিন্দুবলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে আসছেন এবং বৃটিশসরকার সেই সুযোগটা গ্রহণ করে ভারতের আবহমান কালের অধিবাসী ত্রিশকোটি মানুষকে কোনোকালে 'হিন্দু' বললেন না, 'অমুসলমান' বলেই চালালেন। আগামী দিনের ইতিহাসে আজকার হিন্দুর এই "অমুসলমান" কথাটার স্বীকৃতির দুর্ব্বলতা কি ভাষায় লেখা হবে, ভেবে দেখুন। সেদিনকার সন্তানগণ কি নিজদিকে অমুসলমানের সন্তান বলে আত্মমর্য্যাদা লাভ করবে?

শুভ্রা কথাটার রূঢ়তার যেন কিছু সচেতন হয়ে বললো,

—অধুনা সকলে প্রচার করছেন "জাতায়তাবাদী" কথাটা!

—ভালই করছেন। আপনি হিন্দু হয়েও জাতীয়তাবাদী থাকতে বাধা নেই। এই ভারতেই কয়েকবছর পূর্ব্বেও লোকমান্য তিলক কংগ্রেস এবং হিন্দুমহাসভায় কর্ত্তৃত্ব করেছেন। ভাই পরমানন্দ, লালা লাজপৎ রায়, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য একসঙ্গে কংগ্রেস এবং হিন্দুমহাসভার নেতৃত্ব করেছেন। আপনি কি বলতে চান, তাঁরা জাতীয়তাবদী ছিলেন না ?

—জাতীয়তাবাদের সত্যকার অর্থটাই আমার দুর্ব্বোধ্য লাগে—শুভ্রা এতক্ষণে নারীর আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে অঙ্গভঙ্গী করলো। সনৎ উঠলো হেসে,—তাহলে এতক্ষণ নিজেই জাতীয়তাবাদী হয়ে তর্ক কেন করেছিলে তুমি ?

—ওঁর কথাটা জেনে নিতে চাই—শুভ্রাও হেসে বললো···দুধটা খান !

—খাই—জাতীয়তাবাদ বৈদেশিক শব্দ—Nationalism এর অনুবাদ। শব্দটা রাজনীতির অভিধানের এবং তাদের দেশে ধর্ম্ম নিয়ে কোনোদিন রাজনীতির চর্চ্চা হয় না, কিন্তু এদেশে ইংরাজ-রাজ সুকৌশলে ধর্ম্মকেই রাজনীতির প্রধান অংশ করেছে অথচ ঐ জাতীয়তাবাদ কথাটাও ঢুকিয়ে দিয়েছে। পরস্পরবিরোধী এই অদ্ভুত মতবাদ আমরা এতকাল মেনে আসছি।

—আপনি কি বলতে চান, ভারতের মানুষগুলো এত বোকা যে এই পরস্পরবিরোধী নীতিগুলো তারা এতদিনেও বুঝতে পারছেনা !

—ভারতের মানুষগুলো অতিবুদ্ধিমান তাই বুঝেও নাবোঝার ভান করে। জাতীয়তাবাদী বললে যে দলের স্বার্থ রক্ষিত হয়, তারা তাই বলে, তাদের মধ্যেও আবার পন্থী আছে—ওদিকে ধর্ম্মনিয়ে যারা নিজের দাবী আদায় করতে চায় তারা ধর্ম্মবাদটারই ধূয়া ধরে স্লোগান হাঁকে···বৈদেশিক শক্তি মজা দেখে বসে বসে।

—এর সামঞ্জস্য কিসে হবে ? এই সমস্যার মীমাংসা কোথায় ? শুভ্রার প্রশ্নের উত্তরে লকু আধ মিনিট তার দীপ্ত মুখের পানে চেয়ে, তারপর ধীরে ধীরে বললো,

—এই দুর্ভাগা দেশের অদৃষ্টে এতসব সমস্যার সমাধান হতে এখনো বহু বিলম্ব দেরী—এখনো বহু দুঃখ পোহাতে হবে। আজ যে স্বাধীনতা "এলো এলো" বলে উল্লাস করছেন নেতৃবৃন্দ তার তুচ্ছ ভগ্নাংস আসেনি—এমন কি পরাধীনতার···আরও শক্ত নিগড় এলো কিনা, ভাই ভাবুন—সামাজিক অর্থনৈতিক এবং শিল্পগত পরাধীনতা এবার অগাধ হয়ে উঠবে। এই মেকী স্বাধীনতা "A big hindrance in the development of the peoples of India." দুঃখের উত্তেজনায় উঠে পড়লো লোকাধীশ। শুভ্রা তাড়াতাড়ি বললো

—সে যা হয় হবে, আপনি যে খেতে খেতেই উঠে গেলেন !

লোকাধীশ যেতে যেতে বলল—উদর পূর্ণকরে খাবার আজ দিন নয়, উদরের সঙ্গে অন্যান্য অবয়বের আজ বিরোধ লেগেছে। ভারতমাতার দেহে আজ হিন্দুস্থান পাকিস্থানের সঙ্গে শতাধিক রাজস্থান আর আদিবাসী স্থানে বিবাদ লাগিয়ে দিল—ভারতের আকাশে আবার সেই যথাপূর্ব্ব অন্ধকার।

নিয়তির মত নিষ্ঠুরা, আবার নিয়তির মত করুণাময়ী প্রাকৃতিক জগতে আর কিছু নেই। সাপ যখন একটা ব্যাঙ ধরে ধীরে ধীরে গিলতে থাকে, আর ব্যাঙটা করুণ আর্ত্তনাদ ছাড়ে, তখন মনে হয়, এই ভীষণতম নিষ্ঠুরতা ঈশ্বরের বিধানে কেমন করে সম্ভব হোচ্ছে—তাহলে ঈশ্বরকে করুণার অবতার বলি কেমন করে? নিরীহ ব্যাঙটা কি এমন অপরাধ করেছে যার জন্য তার এমন শাস্তি? মনের মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর পাবার পূর্ব্বেই দেখা গেল গুরুতর আহারের ভারে সাপটা মৃতবৎ পড়ে রয়েছে। এ যেন আর এক নিষ্ঠুরতা ;

* Izvestia-Moscow 5-7-47.

চিন্তাশীল মানুষ এইসব দেখে মনে করে, প্রকৃতি অতিশয় নিষ্ঠুর কিন্তু বৈজ্ঞানিক আজ আবিষ্কার করেছেন, প্রকৃতির রাজ্যে নিষ্ঠুরতা আদৌ নেই—সাপ ব্যাঙটাকে ধরবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙটির স্নায়ুকেন্দ্র অবশ হয়ে যায় এবং শরীরে সাপের লালাবিষ সঞ্চারিত হয়ে তার যন্ত্রণা বোধ বিলুপ্ত করে দেয়, এমনকি, যে কোন ইতর জীব সম্বন্ধে এই বৈজ্ঞানিক সত্য প্রমাণিত হয়ে গেছে। তা ছাড়া প্রকৃতির কাজ চিরন্তন মঙ্গলের দিকে। সাপ অনাদিকাল থেকে ব্যাঙকে খেয়ে আসছে তবু ব্যাঙ আজও আছে বিলুপ্ত হয়নি—সাপ যদি ওদের না খেত তাহলে পৃথিবীতে ব্যাঙ ছাড়া বোধ হয় আর কোনো জীব থাকতো না—তাই এই ব্যবস্থা! ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিত মঙ্গলের পথ ধরে প্রকৃতি তার কাজ করে চলেন—এর জন্য যে কতদীর্ঘ সময় ব্যয়িত হয়, তা' লক্ষ্য করলে আমাদের চোখে সেটা অপব্যয় বলেই মনে হয়। একটা আমগাছের মাত্র তিন চার মাস ফুল ফল হয়ে শেষ হয়ে যেতে সময় লাগে কিন্তু সেই আমগাছটিকে দীর্ঘ দিন ধরে বড় হতে হয় এবং সারা বছর অপেক্ষা করে থাকতে হয় ঐ তিনটি মাস সময়ের জন্য। ঐ তিনটি মাসের জন্য নয় মাস প্রতীক্ষা আমাদের বিবেচনায় নিশ্চয় সময়ের অপব্যয় কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে ঐ রকমই নিয়ম শৃঙ্খলা।

মানুষ যখন প্রকৃতির বশে ছিল, তখন সে ছিল, ঠিক ঐ রকম। সুদৃঢ় পদে এবং ধীরে ধীরে সে সভ্যতার পথে এগিয়ে এসেছিল—দাবানল থেকে অগ্নি সংগ্রহ করে হয়তো গৃহদীপ জ্বালাতেই তার হাজার বছর কেটে গেছে। একখণ্ড বংশদণ্ডকে বাঁকিয়ে ছিলা দিয়ে ধনুক তৈরী করতে হয়েতো অসমান্য প্রতিভাধরের প্রয়োজন হয়েছে—কয়েকটা মানুষ মিলে একটা গুহা তৈরী করে গোষ্টিবদ্ধ হ'য়ে বাস করবার চেষ্টায় হয়তো কয়েক পুরুষ অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং বহু আপদ বিপদের পূর্ব্ব ইতিহাস তাদের পথ দেখিয়েছে কিন্তু সেই প্রকৃতির সত্যকার সন্তানগণ নিয়তির সব নিষ্ঠুরতাকে কল্যাণাশিস বলে মেনেই নিশ্চিত দৃঢ় পদে এগিয়ে এসেছিল প্রকৃতির সঙ্গে যোগ রেখে।

তারপর এল নব নব সভ্যতা, মানুষ চাইল প্রকৃতিকে জয় করতে; নিয়তির নিষ্ঠুরতাকে অগ্রাহ্য করতে—নিজেকে স্বতন্ত্র করে তুলতে জীব-রাজ্যে! যে দিন সে নিজেকে সত্যিই স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত করলো সেইদিনই বাধলো তার প্রকৃতির সঙ্গে সংঘর্ষ—এবং সেইদিনই তার জীবন হোল অপ্রাকৃত! কিন্তু মানুষ তার অপ্রাকৃত অবস্থাকে স্বীকার করলো না অহঙ্কার বশে, এমন কি আজও স্বীকার করে না—অথচ মানুষ আজ নিশ্চয় আর প্রাকৃতিক নেই। নেই—সেটা চোখ মেলে চাইলেই দেখতে পাওয়া যাবে, কিন্তু প্রকৃতির প্রভাবকে সে অতিক্রম করতে পারল না কোনো খানেই। তাই মাঝে মাঝে তার নিজেকে প্রাকৃতিক করে তুলবার জন্য ইচ্ছা যায়। অরণ্যবাস করে সে সখ্ মেটায় যাযাবর জীবনকে বরণ করে, নুডিষ্ট মুভমেণ্ট্ চালায় এবং আবার সেই গোষ্টিগত আরণ্যকজীবনে ফিরে যাবার জন্য নানান থিওরী খাড়া করে। কিন্তু প্রকৃতি এখানে নিষ্ঠুরা—যে ঘর মানুষ ছেড়ে এসেছে প্রকৃতি চিরদিনের জন্য তালাবন্ধ করে দিয়েছেন তার কাছে। তবুও মানুষ আবার প্রকৃতির কোলে ফিরে যাবার চেষ্টা করে—শান্তির আশায়—শান্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষায়।

শান্তির জন্য পৃথিবীর বহু মনীষীই বহু থিওরী খাড়া করেছেন এবং এখনো করছেন, তার সর্ব্বাধুনিক থিওরী নাকি নিরস্ত্রীকরণ—তার সঙ্গে সমাজ তন্ত্রবাদ আর কৃষক-মজদুর-রাজ প্রতিষ্ঠা। পৃথিবীর প্রধান শক্তিদের সম্মিলিত বৈঠক বারম্বার বসছে এবং বারম্বার ভাঙছে; নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব হচ্ছে না। আনবিক শক্তিকে কোনো রাষ্ট্র একচেটিয়া রাখতে সমর্থ হোল না—আগামী দশবৎসরের মধ্যে রাশিরাশি আনবিক বোমা তৈরী হবে, অতএব পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য্য। ওদিকে মহাশক্তিশালী রুষ সাম্রাজ্য সমাজ তান্ত্রিকতার মধ্যে যে কি বৈপ্লবিক আয়োজন করছে তা পৃথিবীর অন্য অংশের একান্ত অজ্ঞাত। আজ ভাবতেই তো কয়েকরকম সমাজতন্ত্র চালাবার চেষ্টা চলছে—যোশীপন্থা, জয়প্রকাশপন্থা, রায়পন্থা হয়তো আরো দুচারটা পন্থা আছে—কে জানে। ওদিকে আমেরিকা তার বিরাট

ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করে সারা পৃথিবীকে অর্থনৈতিক নাগপাশে আবদ্ধ করবার চেষ্টা করছে—ইউরোপে মার্শাল পরিকল্পনা তার প্রধান নমুনা! ভারতের বাজারও সে একচেটিয়া করতে চাইছে, তারও আভাস পাওয়া যাচ্ছে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। আর ভারতের চিরদুর্ভাগ্য এই যে, ভারতীয়রা মহানন্দে সেই বিষপাত্র অমৃত বলে পান করতে চলেছেন। রাষ্ট্রের সহায়তা পেলে আমেরিকান ডলার হয়তো প্রচুর পরিমাণে ধনিক সৃষ্টি করবে কিন্তু ভারতের দরিদ্র কৃষি-শিল্পের কি অবস্থা হবে! কে জানে কলকারখানা রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন করবার দাবী সমর্থন করলে দেখা যায়, রাষ্ট্রপরিচালকগণ প্রায় সকলেই ধনিক-বৃত্তিতে শোষণ যে করবেন না তার প্রমাণাভাব। এবং সেরাষ্ট্র যদি কোনো দলবিশেষের কবলিত হয় তা হলে অবস্থার গুরুত্ব হবে অপ্রমেয়। অতএব উৎপাদনটা পুরোপুরি শ্রমিকের কর্তৃত্বাধীন না হওযা পর্য্যন্ত শ্রমিকের অর্থনৈতিক মুক্তি কেমন করে হবে? তা হতে দিতে চাইবে ধনিকের দল বড় সহজে—এমন তো মনে হয় না। রাষ্ট্র যদি গণতন্ত্রের হাতে থাকে তবে বিক্রির বাজারও তৈরী করা যাবে, তা ছাড়া, ধনিক এবং শ্রমিকের মাঝে আর একটা বড় দল রয়েছে—তারা মধ্যবর্ত্তী—কৃষক-মজদুর-দরদী নেতৃত্বাভিলাষীর দল। এদের কথা তো কৈ বড় ভাবেন বলে মনে হয় না; অথচ এরা সমাজের কম অংশ নন। এঁদের মধ্য থেকেই বৈজ্ঞানিক জন্মায়, শিল্পী জন্মায়, সাহিত্যিক জন্মায়, রাজনৈতিক এবং ধনিকও এই সমাজেই জন্মায় অধিকাংশ; এদের কেউ কেউ ভাগ্যফলে ধনিক বনে যেতে পারেন, কিন্তু কেউ শ্রমিক-শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন বলে শোনা যায় না! এঁরা কি দেশের মাটির কেউ নন? এঁদের জন্য নেতাদের দরদীপ্রাণ তো কৈ উছলে ওঠে না?

এরা দীর্ঘ দীর্ঘ শতাব্দি উপেক্ষিত হয়ে এলো কিন্তু এরাই রাজার রাজ্য চালাবার পরিকল্পনা করেছে—পদাতিক হয়ে যুদ্ধ করেছে—পার্শ্বচর হয়ে আনন্দ যুগিয়েছে রাজামহারাজাকে; আজিও এরা দৈনন্দিন জীবনের সহস্র দুঃখ বরণ করে বেঁচে আছে কোনোরকমে; সমাজকে পুষ্ট করছে, সাহিত্যকে

সৃষ্টি করছে, ইতিহাসকে রূপদান করছে, শিল্পকে সাহায্য করছে রক্ত জল করা অর্থ দিয়ে। এরাই আজও নেতৃত্বের ভোটদাতা এবং নেতাদের বাণীর বাহক ; এরা নিশ্চয়ই ধনিক নয়, কিন্তু শ্রমিকের পর্য্যায়েও যদি না পড়ে, তবে এদের ঠাঁই কোথায়—এই যারা কৃষক-মজদুর বা ধনিক্ নয় ?

সাপে ধরা ব্যাঙের মত এরা অস্থিমজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে। তাই অনুভব করতে পারে না, জগৎব্যাপী ধনতন্ত্ররূপ বিরাট অজগরের গ্রাসে এরা ধীরে ধীরে উদরসাৎ হচ্ছে, জীর্ণ হচ্ছে, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এদেরই মধ্যে থেকে কয়েক জন বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রমিকদের জাগিয়ে দিল—তার ফলে ধনিক বাধ্য হচ্ছে শ্রমিকের মজুরী বাড়াতে, কিন্তু বাড়তি সেই মজুরীর টাকা ধনিক তো দেয়ই না, শ্রমিকও দেয় না, দেয় এই মধ্যবিত্ত ক্রেতাগণ। ধনিক তাঁর খরচ পুষিয়ে লাভের অংক ফেলে পণ্য-মূল্য স্থির করেন, রাষ্ট্র তাতে শুল্ক বসিয়ে রাজস্ব আদায় করেন—শ্রমিক তার প্রাপ্য ঠিকই আদায় করে নেয়—বাকি থাকে অসহায় মধ্যবিত্ত—আকাশে ত্রিশঙ্কুর মত।

এই পরস্পর স্বার্থের হননকারী বিকৃত নরসমাজ আজ থিওরী খাড়া করেছে সব সমান হয়ে যাক ; পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হোক। এর জন্য বহুরকম মতবাদ সে পরীক্ষা করতে লেগেছে বর্ত্তমান পৃথিবীতে ; কোনোটাই কার্য্যকরী হচ্ছে না। না হবার কারণ, প্রকৃতির সঙ্গে তার শতশতাব্দির বিরোধ—নিজকে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন করবার প্রচেষ্টা। স্বাধীন হতে গিয়েই মানুষ সহস্র রকমে পরাধীন হয়ে পড়লো সামাজিকতায়, অর্থনীতিতে, রাষ্ট্রশাসনে—বিভক্ত হয়ে পড়লো ধর্ম্মে ধর্ম্মে, আচারে ব্যবহারে, নীতিতে-দুর্নীতিতে, এমন কি গাত্রচর্ম্মের শ্রেণী-বৈষম্যেও ! আবার মানুষ ফিরে আসবে তার সুপ্রাচীন আরণ্যক স্বাধীনতায়—একথা আজ একান্ত হাস্যকর প্রলাপ—প্রকৃতি তার নিষ্ঠুর হাতে সে-চাবি গোপন করে দিয়েছেন।

তবে মানুষের উপায় কি ?—সন্ন্যাসী ভেবে ভেবেই চলছিলেন। প্রকৃতির এই অসীম বিস্তারে আধোঅন্ধকার পথে তিনি একা—দূরে আদিবাসীদের পল্লী

ক্ষীণ জ্যোস্নালোকে ছায়াময় মায়ারাজ্যের মত দেখা যাচ্ছে। ঐ স্থানই গন্তব্য তার এবং ঐ স্থানেই প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য করে, সখ্যতা স্থাপন করে মানুষ আজো বাস করে। ওরা আদিবাসী বলে অভিহিত—কিন্তু ওরা সত্যিকার স্বাধীন, শান্তজীবনের অন্তহীন ঐশ্বর্য্যে সমলঙ্কৃত সমাজতন্ত্রবাদী। কিন্তু ওদের ঐ আদিমযুগের ঐশ্বর্য্যময় সমাজতন্ত্র আজ স্বার্থপর নাগরিক সভ্যতায় ভাঙতে বসেছে; শুধু তাই নয়—স্বার্থান্ধ রাজনৈতিক নেত্রীত্বের দুর্ব্বার আত্মপরায়ণতা ওদের শান্ত-সমাহিত জীবনকে কদর্য্য বিদ্বেষ-বিষ-দুষ্ট করবার জন্য আজ বদ্ধপরিকর। বিদ্বেষ, বিভেদ, ধর্ম্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা চালিয়ে ঐ একান্ত নিরীহ এবং পরার্থপর সত্যচারা মানবসমাজকে বিভ্রান্ত করে তুলছে কতকগুলি রাজনৈতিক দল—সন্ন্যাসী সেই সংবাদ পেয়েই আসছেন।

দীর্ঘকাল বিহার এবং বাংলার সংযোগ স্বরূপ ঐ পাহাড়টায় বাস করার জন্য সন্ন্যাসী ঐ আদিবাসী সমাজের সকলেরই সুপরিচিত এবং শ্রদ্ধেয়! ওদের ভাষায় ইনি চমৎকার বক্তৃতা করতে পারেন, এবং ওদের ধর্ম্মের বহু সূক্ষ্ম তত্ত্বও অবগত আছেন। সর্ব্বোপরি ওদের ভাষা শিক্ষার জন্য ইনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একখানি ব্যাকরণ রচনা করেছেন; অমুদ্রিত সেই ব্যাকরণ বাংলা অক্ষরে লিখিত হয়ে ওদের মধ্যে প্রচারিত রয়েছে আজও—তাই ওদের শ্রদ্ধার পাত্র এই সন্ন্যাসী!

—মধু?—উনি পল্লীর প্রান্তে একটি কুটিরের দরজায় এসে ডাক দিলেন, —মধুমাঝি!

উষার উদয় সম্ভাবনায় পূর্ব্বাকাশ রক্তিম হয়ে উঠেছে—বর্ষার প্রথম দিক। এসময় অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করে ঐ আদিবাসীগণ আপনাপন কাজে বের হয়, কাজেই মধু মাঝির ঘুম পূর্ব্বেই ভেঙেছিল—সন্ন্যাসীর দ্বিতীয় ডাকেই সাড়া দিল ঘর থেকে—যাইরে সাধুবাবা! এতো রাত থাকতে তুই যে এলি?

—আয়, বেরিয়ে আয়—বলে সন্ন্যাসী বাইরের প্রকাণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পূর্ব্বাকাশ পানে চেয়ে বললেন,—

"উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত।
উষ ঋণেব যাতয়॥"

হে রাত্রি দেবতা, সর্ব্বত্র গভীর কৃষ্ণান্ধকারময় অজ্ঞান আমাকে আছন্ন করেছে—হে উষা, আমার অজ্ঞান অপসারণ কর॥

উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ।
রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে॥

হে রাত্রি দেবি, দুগ্ধবতী ধেনুর ন্যায় তোমাকে স্তুতি-জপ দ্বারা প্রসন্ন করছি; তুমি পরমাকাশরূপ সর্ব্বব্যাপী পরমদেবতার কন্যা—তোমার প্রসাদে আমি রিপু জয় করতে পারব…। আমার পূজা-প্রণাম গ্রহণ কর!!

সন্ন্যাসী করযোড়ে নমস্কার জানালেন উষার আবির্ভাব-উদ্দেশে।

মাঝি বাইরে এলো; সন্ন্যাসী পূর্ব্ব থেকেই তাকে চেনেন। মধু ছোটবেলায় মিশনারীদের দ্বারা ধর্ম্মান্তরিত হয়ে তাদেরই সঙ্গে চলে যায়। মিশনারীরা তাকে ইংরাজি শিক্ষা দিয়েছেন এবং অর্থকরী কিছু কাজ করবার মত বিদ্যাও দান করেছেন। কিন্তু তার ইংরাজি বিদ্যা অনেক সময় হাসির উদ্রেক করে। বাইশ তেইশ বছরের যুবক মধু—সুশ্রী গঠন, মুখশ্রী চমৎকার; ভাল বাঁশী বাজাতে পারে—ছুতোরের কাজও করে।

—গুড মর্নিং স্যার—মধু গালভরা হেসে অভিবাদন জানালো।

—রাততো শেষ হয়নি এখনো—বলবি, নমস্তে!

—ন্যামাষ্টে? এন-ও-য়া ই-এ, এম্-ও রাই-এ এস্ টি-ঈ?—ন্যামাষ্ট-এ

—হ্যাঁ—তবে উচ্চারণটা নমস্তে। যাক, কেমন আছিস?

—ভালো! তুরা কেমন ছিলিস? জ্বর বুখার কিছু হোয় নাই তো?

—না!—সন্ন্যাসী হাসলেন—ধন্যবাদ;—তোদের সর্দ্দার মাতাল মাঝির কাছে আমাকে একবার নিয়ে যেতে হবে মধু—পারবি না?

—আমি তো পারবেক বাবু—উ বিয়েই দিলেক না আমাকে !

—কার বিয়ে ?—কে দিল না ?

—সেই মাতলা টো। বিটিটো তো মস্ত হইছে—বিয়ে তো দিতেই হবেক তো ! আমি কি এমন খারাপ বর আছি, বল তো তু ?

— তুই বিয়ে করতে চাস মাতালের মেয়েকে ?

—ঐ তো বলছি কথা। দিলেক নাই। বলে—'তু ধরম লুক্সান করেছি স, তুখে বিটি কেনে দিব ?'

—তুই বিয়ে করবি তাকে ?

—আমি তো করবের লেগে হাঁচড়-পাচড় করছি, বাঘ যেমন বাচ্চার লেগে করে। উই মাতাল মাঝিটো বড্ড গুঁয়ার আছে !

—আমি দিয়ে দেব তোর বিয়ে, চল আমার সঙ্গে।

—লারবি !—উই মাতলা কারুর কথা শুনবেক নাই।

মধুর কণ্ঠে নিরাশার এক আশ্চর্য্য সুর। সবুজ ওর প্রাণ মিশনারীদের শিক্ষায় খুব বেশী কুটীল হয়ে যায়নি এখনো। ও যাকে চায়—তাকে পেলে ও খুসী হয় ! কিন্তু পাবার আশা বুঝি একেবারে ছেড়েই দিয়েছে। সন্ন্যাসী হেসে বললেন—তুই চল আমার সঙ্গে। আমার কথা সে নিশ্চয় শুনবে।

—চল তোবে! কিন্তুক ইখান থেকে পাঁচটি কুশ পুরো রাস্তা—পারবি যেতে ?

—হাঁ, পারবো।

—বিনা জলখাবার মধ্যি চলে যাবক্।

কথা কইতে কইতে একটা গাছতলায় এসে পড়েছেন ওঁরা। মধু ওঁকে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করতে বলে ঘর থেকে বাঁশীটা আনতে গেল। তখনো ভোর হয়নি, উষার আভাস মাত্র দেখা দিয়েছে। মধু ফিরে এল বাঁশী নিয়ে, কিন্তু তার ফিরতে কুড়ি পঁচিশ মিনিট দেরী হোল। সন্ন্যাসী দেখলেন, মধু এর মধ্যে কোঁকড়া চুলে তেল মাখিয়ে জল দিয়ে আঁচড়ে বেঁধেছে। ঝুঁটিতে গোজা কাঠের চিরুণী। গলায় লাল-কালো-সাদা মালাটা দুলিয়ে ফতুয়া গায়ে

দিয়েছে—ধুতিটা পরেছে কোঁচা দিয়ে, যদিও কোঁচা হাঁটুর নীচে নামে নাই। হাতে বাঁশী, পিঠে তীর ধনু—যেন বীর শিকারী !

তরুণ মধুকে সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী যাত্রা করলেন—যেন দ্রোণাচার্য্যের পিছনে শিষ্য অর্জ্জুন যাচ্ছে—অতীতের পশ্চাতে যাচ্ছে বর্ত্তমান।

—শুনছি, কয়েকজন লোক নাকি তোদের পাড়ায় পাড়ায় এসে বলে বেড়াচ্চে যে তোরা হিন্দুদের কেউ নোস ? হিন্দুরা নাকি তোদের ধর্ম্মকর্ম্ম নষ্ট করে দিচ্ছে ? তোরা হিন্দুধর্ম্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম্মে গেলেই নাকি ভালভাবে স্বাধীন হতে পারবি ?

—হুঁ তো—বলছেক্ তো—মধু বললো—জিভ গাড়ি আসে,—লুক আসে, বলে উসব কথা—বলে যে আমার দিগে তুরাই ইমন করে রাখছিস। তুরা আমারদিগের শত্তুর—আমার দিগে মেরে ফিলাইবি।

সন্ন্যাসী বুঝলেন, তাঁর শ্রুত সংবাদ সত্য। কয়েকজন স্বার্থান্বেষী সম্প্রদায়গত বিদ্বেষভাবাপন্ন মানুষ এই নিরীহ এবং নির্ব্বিরোধী অরণ্যবাসীদের জীবনেও ভেদনীতির বিষ সঞ্চারিত করে দিচ্ছে। এ দেশে এই আদিবাসীদের সংখ্যা লক্ষাধিক। এরা সত্যকার সমাজতন্ত্রী এবং এদের সামাজিক ঐক্য সভ্য জাতির আদর্শ হওয়া উচিৎ। উনি বললেন,

—উ সব মিথ্যে কথা রে মধু, তোদের সর্দ্দারকে সেইকথা বুঝিয়ে তবে আমি দিল্লী যাব—তাই এই দিক দিয়ে এলাম।

—তা বেশক্! কিন্তু আমার বিয়েটার কি করবি? তু যে বললি, সদ্দারকে বলবি সি কথা !

—বলবো। তোর বিয়েও দেব, কিন্তু মধু,—এদেশে তোরা বহুযুগ ধরে বাস করছিস; তোরাই এখানকার আদি আর্য্য। তুই তো কিছু লেখাপড়া শিখেছিস—তোর বিয়ে হলে বৌকে নিয়ে একটা ইস্কুল কর না।

—হাঁ, আমি করতে পারবো, কিন্তু ইংরিজি পড়তে পারি আমি।

—বাংলা ?

—উটো ভাল পারি না ইংরিজিই তো সায়েবরা শিখালো।

বাংলা-হিন্দি-হিন্দুস্থানীর কোনো একটা শেখা দরকার। রাষ্ট্রভাষা হবে হয় তো হিন্দুস্থানী কিন্তু সেটা যে কি ভাষা, সন্ন্যাসী এখনো নির্ণয় করতে পারছেন না। তাই নীরবে ভাবতে ভাবতে চললেন। সাতসমুদ্র পার থেকে বিদেশীরা এসে এই আদি বাসীদের মধ্যে নিজেদের ভাষা প্রচার করেন, ধর্ম্মান্তরিত করে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন—এদের সংস্কারকে নিজদের মত করে গড়ে তোলেন—অথচ প্রতিবেশী হিন্দু, ভ্রাতা ভারতবাসী এদের জন্য কতকুটু কি করেছে? দেশ পরাধীন ছিল—এবার হয় তো দেশের মানুষরা এদের পানে চাইবে। আশায় আশায় সন্ন্যাসী আকাশের পানে চাইলেন।

উঠে চলে গেছে কাবেরী; বসে আছে মোহিতবাবু আর মলয়কুমার। মোহিতবাবু মিনিটখানেক চুপচাপ চুরুট টানলেন, তারপর আধমিনিট জানালার পানে চেয়ে বললেন,

—চারদিকেই ধর্ম্মঘটের ধূম লেগে গেছে মলয়, এতে যে প্রডাকসানের কত ক্ষতি হচ্ছে, তা বোঝবার শক্তি খুব কম লোকের আছে। শিল্পকেন্দ্রগুলো প্রায় পঙ্গু হয়ে যেতে বসেছে। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, কৃষকমজদুর রাজ, পাকিস্তান, হিন্দুস্থান, বাংলা পাঞ্জাবের ভাগাভাগি নিয়ে মানুষগুলো এতো ব্যস্ত যে দেশের আর্থিক দিকটা কারো চোখেই পড়তে চাইছে না; অথচ ভারত আর্থিক শক্তিতে প্রায় দেউলে হতে বসেছে।

—না-না-না; নেতাদের খর দৃষ্টি রয়েছে এদিকে—শিল্পশক্তির পুনর্গঠন আর কৃষির উন্নতির জন্য তাঁরা যথেষ্ট ভাবছেন! পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টাও করছেন।

—হাঃ! হাঃ! হাঃ! তুমি এখনো নিতান্ত ছেলেমানুষ মলয়—তাঁদের

খরদৃষ্টিটা কোথায়, তা ঠিক ধরতে পারছো না। সেদিন একখানা ইংরাজি কাগজে দেখলাম, লিখেছেন,'—

Socialism according to many Indian and British experts means nationalisation of big industries and personalisation of big incomes. কিন্তু যাক, শিল্পোৎপাদন কম হচ্ছে ধর্ম্মঘটের হিড়িকে, তাতে চাহিদা আর সরবরাহের মাঝে যে ফাঁক থেকে যাচ্ছে, সেই ফাঁকে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাচ্ছে হুহু করে; এবং তারই জন্য জীবনযাত্রা হয়ে উঠছে ব্যয়বহুল। সাধারণ জিনিষের ব্যয় বাহুল্য মানেই সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্ট; জিনিষ কম থাকায় ব্ল্যাক মারকেটে যেতেই হচ্ছে তাদের—এবং যাদের জিনিষ তারাই এই সমাজ-ধ্বংসকর কালোবাজারটা চালাচ্ছে। আবার দেখ, দরকারী জিনিষের এই যে উচ্চমূল্য, এতে করে বিদেশী জিনিষ সস্তায় বিক্রী হবার বাজার পাবে—জাপানের কাপড়, আমেরিকার পেন-পেন্সিল আর অষ্ট্রেলিয়ার টিনভর্ত্তি খাবার কিরকম বাজার ছেয়ে ফেললো, দেখছো তো?

—এর জন্য দায়ী কে? এই সর্ব্বনাশা ব্যাপার কার দোষে ঘটছে?

—দায়ী?—শিল্পপতি বলবেন,—গভর্ণমেণ্ট এবং শ্রমিকগণই দায়ী—আর শ্রমিক-নেতা বলবেন অতিলোভী মিল-মালিকই এর জন্য দায়ী, কিন্তু সত্যি দায়ীত্ব এদের কারো কম নয়।

—শ্রমিকদের তরফ থেকে ঘনঘন ধর্ম্মঘট আর মজুরী বাড়াবার দাবী নিশ্চয় বড় কারণ।

—ধর্ম্মঘট শ্রমিকের অমোঘ অস্ত্র, কিন্তু তার প্রয়োগ যেখানে সেখানে যখন তখন করা মানেই, দেশের শিল্পের ক্ষতি করা এবং তাদের নিজেরও ক্ষতিকরা; ওদের ঐ শ্রেষ্ঠ অস্ত্র নিতান্ত প্রয়োজন না হলে প্রয়োগ করা উচিত নয়, কিন্তু ব্যাপারটা কি জান মলয়—শ্রমিকদের মধ্যে থেকে তো তাদের নেতা জন্মায় না—নেতা আসে বাইরে থেকে, সেই নেতাদের অধিকাংশই উপরের জার্নালিষ্টের লেখা স্বার্থবাদীর জাত; তারা তাড়াতাড়ি নিজেরাই কিছু কামিয়ে নিতে চায় এবং

কামায়ও। চোখ মেলে চাইলেই দেখতে পাবে, শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের নেতা হয়ে আসে প্রায় ভাড়াটিয়া নেতা যারা বহু শিল্পকেন্দ্রে একসঙ্গে গোল বাধিয়ে বেড়াচ্ছে। অবশ্য ধনিকদেরও যথেষ্ট দোষ আছে ঐ ব্যাপারে; সুরুতেই একটা মিটমাটের চেষ্টা তাঁরা প্রায়ই করেন না, মনে করেন—গায়ের জোরেই কাজ আদায় করবেন—কিন্তু পৃথিব্যাপী গণচেতনার এই যুগে গায়ের জোরে শ্রম আদায়ের দিন আর নেই। তাই এখন সরকারের উচিত, শিল্পপতি আর শ্রমিকের মধ্যে মধ্যস্থের কাজ করা।

—সমস্ত শিল্পই তো গভর্ণমেণ্ট নিজের হাতে নিতে পারেন।

—পারেন এবং হয়তো নেবেন, কিন্তু এখনো তার বিস্তর দেরী আছে। কারণ সরকার এখনো সবদিক সামলাতে পারেন নি—এখন চলছে আত্ম-তোষণের আর আত্মপোষণের যুগ। দেখনা, বছরে হয়তো দু'শ' টাকা আয়ের জমিদারী আছে, এমন জমিদার দেশে বিস্তর—তাদেরই উচ্ছেদ করবার জন্য কত কথা উঠছে, কিন্তু দুই কোটি টাকা আয়ের মিল-মালিক, খনি-মালিক বা যানবাহন-মালিকগণ বেশ অতি লাভ করে চলেছেন—তাঁরা অতিবুদ্ধিমান, এবং ঠিক লোকটিকে হাতে রাখতে জানেন! কিন্তু ভারতের আর্থিক বনিয়াদ শক্ত রাখতে হলে অবিলম্বে শিল্প-শক্তির প্রবর্দ্ধন করতে হবে—নইলে সমূহ বিপদ; অন্য দিকে ভারত যতই এগিয়ে চলুক—এদিকে নজর না দিলে যে আমদানী রপ্তানীর হিমশীতল যুদ্ধ বাধবে সারা পৃথিবীর শিল্পশক্তির সঙ্গে—ভারত সে যুদ্ধে শুধু হেরে যাবে নয়—নিঃশেষ হয়ে যাবে, ঠিক যেমন করে পৃথিবীর পৃষ্ঠায় একদিন হিমযুগ এসে বড় বড় জানোয়ারকে জীবনের ইতিহাস থেকে অপসারণ করেছে!

—ভারত যখন স্বাধীন হয়ে গেল, তখন দেশের কর্ম্মীরা এবং সরকার নিশ্চয়ই এদিকে দৃষ্টি দেবেন—মলয় আস্তে বললো—কারণ মোহিত বাবুর কথার উপর উঁচু গলায় কথা বলে সে তাঁর বিরাগভাজন হতে চায় না! অনেক আশাই সে করে মোহিতবাবুর কাছে এবং জানে যে মোহিতবাবুও ধনিক, শ্রমিকদের জন্য তাঁর

দরদ নিশ্চয়ই কূটবুদ্ধি থেকে উদ্ভূত! কাণপুরের ওদিকটায় মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হওয়ার জন্য এবং বাজারে কাঁচা মালের অভাব থাকায় সে বাংলায় এসেছে—ইচ্ছাটা, মোহিতবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবসায়ের দিক পরিবর্ত্তন করা এবং তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশা-লতায় ফুল ফোটানো—কাবেরীকে লাভ করা।

কাবেরীকে ওর হাতে দেবার ইচ্ছে মোহিতবাবুর আছে কিন্তু কাবেরীর মা'র ইচ্ছে নয়। তিনি বলেন—

—ইন্দ্রজিৎ যদি ফেরে তো আমি তার হাতেই দেব কাবেরীকে। বাগদত্তা কন্যাকে অন্যের হাতে সমর্পণ করতে তাঁর সতীত্ববোধে বাধে, যদিও এ বিষয়ে বাক্য তিনি কোনদিন কাউকে দান করেন নি! তা ছাড়া ইন্দ্রজিৎকে তিনি সত্যি ছেলের মত ভালবেসেছিলেন, কিন্তু মোহিত বাবুর দারুণ আপত্তি। বরং তিনি মেয়ের বিয়েই দেবেন না—তবু ইন্দ্রজিৎকে—অসম্ভব! তাই তিনি মলয়ের নানা গুণপনার কথা বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলেন স্ত্রীর কাছে;—কিন্তু কাবেরীর মা স্পষ্ট জবাব দিয়েই বলেন,

—মেয়েটা একা তোমার নয়, আমারও রীতিমত ভাগ আছে। তোমার যা ইচ্ছে তাই করতে পার না। মলয়ের হাতে কাবেরীকে আমি দেব না।

মলয় সম্বন্ধে এতখানা বীতরাগ হবার অন্য একটা কারণও আছে ওঁর তরফে। বিদেশে থাকার সময় মলয় একটা কেলেঙ্কারী করেছিল এক তরুণীর সঙ্গে; অনেক টাকা খেসারৎ দিয়ে তবে রেহাই পেয়ে দেশে আসে। একবার যে খারাপ হয়েছে, সে যে আবার হবে না, এমন বিশ্বাস উনি করেন না। কিন্তু মোহিতবাবু বলেন—ওদেশে ওসব স্পোর্টস; ও কিছু নয়—ছেড়ে দাও!

—একমাত্র মেয়ের সুখ-সৌভাগ্যের ব্যাপারে ছেড়ে দেওয়া অত সহজ নয়। নারীকে যেমন সতী হতে হবে—পুরুষকেও তেমনি সৎ হতে হবে। চারিত্রিক নিষ্ঠা যে হারিয়েছে সে আবার মানুষ কি? তার দ্বারা কোনো ভালো কাজ

হতে পারে না—বলে কাবেরীর মা স্থান ত্যাগ করেন। কাবেরী মা-বাবার ঝগড়াটা উপভোগ করে এবং স্বমতের বিন্দুবিসর্গ উচ্চারণ না করে বলে,
—তুমি নিশ্চয় মা'র থেকে আমাকে বেশি ভালবাস বাবা, কিন্তু মা নিশ্চয় তোমার থেকে আমাকে বেশি বোঝে—কারণ আমি যেখানে মেয়ে, সেখানে মা'র অংশই আমার মধ্যে বেশি।

পারিবারিক এই সব কূটনৈতিক কথার মধ্যে আনন্দ থাকে প্রচুর, কিন্তু বিবাহযোগ্যা কন্যার পিতার কাছে সে আনন্দ নিরস হয়ে যায়; তাছাড়া মোহিতবাবুর বিপুল বিভব এবং বিস্তৃত কাজ-কারবার চালাবার জন্য একজন সাহায্যকারীর একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। একা তিনি আর পেরে উঠছেন না। মলয় বুদ্ধিমান এবং কর্ম্মক্ষম। কাবেরীর সম্মতি পেলেই তিনি কাজটা শেষ করে দিতে পারেন, কিন্তু কাবেরী আরো চতুর।

ব্যাপারটা তাই আর এগুচ্ছে না।

মিনিট খানেক থেমে মোহিতবাবু বললেন,

—ভারত স্বাধীন হয়ে গেল নয় মলয়—ভারত আরও অধিক বিপন্ন হোল। অবশ্য এই নৈরাশ্যের কথা উচ্চারণ করা আজ উচিৎ নয়। কিন্তু সত্য দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায়, আগামী শতাব্দির জন্য ভারত অন্ধকার হয়ে গেল—হয়তো আরো দীর্ঘ দিনের জন্যই হোল। ইংরাজ যে অবস্থায় বিভেদ এবং বিপ্লবের মধ্যে ভারত জয় করেছিল, ঠিক সেই অবস্থায়ই সে ভারতকে রেখে গেল, উপরন্তু সেদিন ছিল স্বাস্থ্য-শক্তি-সাহস; ছিল অন্ন-বস্ত্র-আবাস—ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণশক্তি, আপন প্রয়োজন মেটাবার শক্তি, ছিল কৃষিসম্পদ এবং কুটীর শিল্পের আর্থিক ইমারৎ, ছিল মানুষের নৈতিক নিষ্ঠা এবং নেতৃত্বের সবল আহ্বান। কিন্তু ইংরাজ এই দুশো বছরের শাসনে তাকে করেছে স্বাস্থ্যহীন, শক্তিহীন, ভীরু, কুশিক্ষায় বিকৃত,—করেছে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আবাসহীন সহরবাসী কেরাণী-মজুর—কলের পুতুল,—করেছে প্রত্যেকটি প্রদেশকে অপর প্রদেশের মুখাপেক্ষী, অপর দেশের মুখাপেক্ষী, অপরের কৃপার ভিখারী। কৃষিসম্পদকে ধীরে ধীরে নষ্ট

করেছে নীল-পাট-তামাক ইত্যাদি নিজপ্রয়োজনে ব্যবহার করে—কুটীর শিল্পকে ধ্বংস করেছে শুধু মিল স্থাপন করে নয়, বৈদেশিক বস্তুর প্লাবন ঢুকিয়ে এবং অকথ্য অত্যাচারে শিল্পীকে তার বৃত্তি ত্যাগ করিয়েছে, তাকে কেরাণী করেছে; তাকে বাবু বানিয়েছে, তাকে বিকৃত শিক্ষা দিয়েছে—তার নৈতিক নিষ্ঠাকে চূর্ণ করেছে অভাবের মুগুর মেরে, প্রলোভনের পয়জার মেরে, দুর্নীতির বিষ ঢুকিয়ে। স্বাধীন হবার বিস্তর দেরী আছে মলয়! যে নৈতিক অধঃপতনের পাপ আজ ভারতে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছে এবং আজ যে বিভেদ-বিদ্বেষ আবার সৃষ্টি করে দিল বৃটিশ, এবং পৃথিবীর ধনশক্তির সঙ্গে তুলনায় ভারতের যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা, তাতে স্বাধীন হবার জন্য আরো শতাব্দি কাল অপেক্ষা কর।

গভীর বেদনার সুর ধ্বনিত হয়ে উঠছিল, প্রত্যেকটি কথার উচ্চারণে। মোহিতবাবুর কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট এবং গম্ভীর—কিন্তু তাঁর এভাবের কথার সঙ্গে মলয় আদৌ পরিচিত নয়। পরম বিস্ময়ে সে শুনছিল, শেষে বললো,

—দেশের দুর্দ্দশার জন্য আপনি এতটা "ফিল" করেন!

—হ্যাঁ—কারণ আমিও এই দেশের সন্তান। অপরের চোখে আমি হয়তো ধনিক, এবং ধন-সম্পদ আমার কিছু আছে বলে আমি তার সংরক্ষণের জন্য সচেষ্টও, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আমি ভারত-মাতার সন্তান—অগণ্য ভারতবাসী আমার ভাইবোন, এ সত্য অস্বীকার করবার মত মূঢ়তা আমার ভেঙে গেছে মলয়; অনেক দিন হোল, এক শ্মশানের চিতার আলোকে আমারই কন্যা আমার মনের সেই মূঢ়তা ভেঙে দিয়েছে। মানুষ যার জন্য চুরি করে সেই যদি বলে চোর, তাহলে চুরি করার কোনো অর্থ হয় না……কিন্তু থাক সে সব কথা।

কথাটাকে তিনি থামিয়ে দিতে চান মাঝ পথে, কিন্তু বাবার গলার উদাত্ত স্বর কাবেরী শুনতে পেয়েছিল ভেতর থেকে। নিঃশব্দে সে এসে দাঁড়িয়েছিল অন্তরালে, এতক্ষণে আচমকে ঘরে ঢুকে বলল,

—আমার বড্ড আনন্দ হচ্ছে বাবা, এমন করে দেশের কথা তো তুমি বলনি কোনোদিন আমায় ?

—বলবো কি রে মা, আমি তো নেতা নই। যার কাজ তাকে সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে !—বলে ক্ষীণ হাসলেন মোহিতবাবু। কাবেরী খুকীর মত ওঁর কাছে বসে বললো,

—খুব ভালো বাবা, আমার বাবাকে কোনো রকম ভুয়ো নেতৃত্ব করতে দিতে চাই না আমি ; কিন্তু তুমি তাহলে এখন আর ধনিক নও নিশ্চয়ই ?

—ধনিক আর শ্রমিকে তফাত তো খুব সামান্যই মা খুকী—মোহিতবাবু সস্নেহে বললেন—শ্রমিকরা গতর খাটায়, ধনিকরা মাথা খাটায়। অবশ্য বাপের বিষয়ের উপর বসে যারা খায়, তারা শ্রমিকও নয়, ধনিকও নয়, তারা বিলাসী, কাজেই অমানুষ, কিন্তু পৃথিবীর সভ্যতা গড়ে উঠেছে ব্যক্তিগত আর সমাজগত শ্রমের মূল্যেই, দেহের এবং মস্তিষ্কের যুগপৎ শক্তিতেই। তফাৎটা কোথায় জানিস ? এই শ্রম-শক্তির মূল্যের নিরখের নির্দ্ধারণে, এইখানেই মস্তিষ্কজীবীর স্বার্থপরতা উদগ্র হয়ে ওঠে—একে দমন করবার একমাত্র উপায় নৈতিক-শক্তির উন্নয়ন, ত্যাগ-শক্তির উদ্বোধন, ধর্ম্মবোধের প্রস্ফুরণ। গলাবাজী করে বক্তৃতা দিয়ে একে দমানো যাবে না, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে যাদের নিয়ে সমাজ, সেই মানুষের মধ্যে একাত্মবোধ জাগাতে হবে—অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান জাগাতে হবে—তবে হবে সমাজ একাত্ম, আর তবে হবে সমাজতন্ত্র।

কাবেরী আরো কিছু বলতো, কিন্তু ভেতর থেকে ওর মা এসে পড়লেন। —মলয়, রাত্রে এখানেই খেয়ে যাবে বাবা !—উনি বললেন ! কেন বললেন, কেউ এরা জানে না। কিন্তু মলয় যথেষ্ট খুসী হয়ে বললো সানন্দে—যে আজ্ঞে।

অকস্মাৎ মলয়কে নিমন্ত্রণ করার অর্থ—মোহিতবাবু ভেবে পেলেন না। কিন্তু কাবেরী বুঝলো, অর্থাৎ আন্দাজ করলো, মা মলয়কে একটু রাজিয়ে দেখতে চান।

—খুকী আয়, রান্না করবি—বলে মা ওকে ডেকেই নিয়ে গেলেন সঙ্গে এবং সেই অজুহাতে মলয়কে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন যে মেয়ে তাঁর শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রীই নয়, রান্নাঘরের বিদ্যাও তার আয়ত্ত আছে। কাবেরী উঠে গেল। মার বুদ্ধির প্রশংসা করতে করতেই উঠে গেল, কিন্তু সে জানে, মা মলয়কে পছন্দ করে না। এমন কি, মার তরফ থেকে ওকে নিমন্ত্রণ এই প্রথম। রান্নাঘরে গিয়ে কিন্তু কাবেরী ওসব কথা কিছুই মাকে শুধুলো না— আদেশ মত রান্না করতে লাগল।

ইতিমধ্যে মোহিতবাবু এবং মলয় বৈষয়িক পরামর্শ করছেন বাইরের ঘরে। মলয় কথায় কথায় বুঝলো যে মোহিতবাবু বাইরে ধনিক শ্রেণীভুক্ত হলেও অন্তরে তাঁর স্বদেশ-প্রীতি অসাধারণ এবং অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি বলে ওঁর মতামত খুবই বলিষ্ঠ আর তীক্ষ্ণ। মলয় নিজকে ওঁর মনের ছাঁচে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলো—অর্থাৎ ভান করার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু মোহিতবাবু মানব-চরিত্র সম্বন্ধে সজাগ—ধরে ফেলছেন।

—আপনার মধ্যে যে রকম দেশাত্মবোধ রয়েছে—তাতে এভাবে নিজকে শুধু কারবার আর কারখানার মধ্যে আবদ্ধ রেখে আপনি দেশকে বঞ্চিত করছেন।

মলয় অনেক গবেষণা করেই বললো কথা গুলো, শুধু "দেশমাতাকে" বলতে গিয়ে ওর বিলিতি-শিক্ষায় বিভ্রান্ত মন 'দেশকে' বললো—যাকেতাকে যখন তখন 'মা' বলা ও পছন্দ করে না। কিন্তু মোহিতবাবু হাসলেন,—বললেন,

—এরকম দেশাত্মবোধ প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির, প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির থাকা উচিৎ, এবং আমি বিশ্বাস করি—নিশ্চয় আছে। তারা সকলেই যদি নেতা হতে যায়, তাহলে নেতার আদেশ পালনের লোকাভাব ঘটবে।

—সকলের সঙ্গে কি আপনার তুলনা হয়?—মলয় তোষামোদের চরম হাসি হাসল।

—না—মোহিতবাবু ও বললেন—নেতা হবার যোগ্যতা আমার আছে, বাড়ী গাড়ী এবং ব্যাঙ্কব্যালেন্স সবই—কিন্তু কি জান মলয়! একটা অতিবড় দোষ আছে আমার, যার জন্য আমি নেতা হতে পারবো না,—সেটা হচ্ছে আমার দেশকে আমার ভালবাসার নিষ্ঠা……হাঃ হাঃ হাঃ!

ওঁর উচ্চ হাসিতে অবাক হয়ে গেল মলয়, বললো,—নিষ্ঠা তো নিশ্চয়ই থাকা দরকার নেতার।

—দরকার, কিন্তু এদেশে নয়; এদেশে নেতার গুণ কি হতে হবে, তা এই পঁচিশ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলেই জানা যাবে—দেখবে, যারাই নিষ্ঠাবান, তারাই বিতাড়িত হয়েছে, যারাই ধাপ্পা কম দেয়—তারাই ধরা পড়ে ধাপ্পাবাজ বলে। কিন্তু মলয়, আমি ব্যবসাদার মানুষ, মোটরের মাথায় চক্রচিহ্নিত তিনরঙা পতাকা উড়িয়ে ব্যাঙ্ক চালাবো, ব্যবসায় বাড়াবো, মিলের মালিকানা বজায় রাখবো—নেতাগিরি করলে আমার চলবে কেন? আমি হব-নেতাদের লাউডস্পিকার মাত্র; আমার পছন্দমত এবং স্বার্থোদ্ধারের সুবিধামত কোন দল বেছে নিয়ে তাদের শ্লোগান গেয়ে দু'পয়সা সঞ্চয় করাই আমার কাজ…উনি হেসেই চুরুট ধরালেন। ওদিকে খাবার তৈরী হয়েছে, ডাক এল। মোহিতবাবু মলয়কে নিয়ে উঠে এলেন।

কাবেরীর মা পরম যত্নে খাওয়ালেন মলয়কে, অবশ্য কোনটা কাবেরীর রান্না, তাও বলে দিতে ভুললেন না! সস্নেহে বললেন,

—কলকাতায় যেরকম দাঙ্গা-হাঙ্গামা হচ্ছে বাবা, বিশেষ সাবধানে চলাফেরা করো।

—হ্যাঁ কাকীমা—কে জানে, এই হাঙ্গামা কতদিন আরো চলবে! বড় দুঃখের বিষয়। রাজায় রাজায় লড়াই হয়, উলুখড় মারা যায়—নিরীহ লোকগুলো হাজারে হাজারে মরছে।

—উলুখড় ফেলনা নয় মলয়—রাজার রাজত্বটা উলুখড়েই ভর্ত্তী, আর উলুখড়ের শক্তিতেই রাজারা লড়াই করে—কাবেরীর মা হেসে বললেন—উলুখড়েরাই রাজাকে রাজপাটে বসায় কি না, কাজেই প্রাণ তাদেরই দিতে হবে। প্রাণ দিয়ে তারা বুঝুক যে অযোগ্য রাজাকে রাজপাটে বসানোর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

—কিন্তু এই সব সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তো বৃটিশের সৃষ্ট কাকীমা—আমরা তো উভয়েই প্রজা।

—আমরাই পথ করে দিয়েছি বৃটিশকে রাজপাটে বসবার জন্য। পলাশী থেকে আজ পর্য্যন্ত এই ভারতের ইতিহাস—সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, পৃথক নির্ব্বাচন, ম্যাকডোনাল্ডি এডওয়ার্ড, তারও আগে সিপাহী বিদ্রোহের সময়কার বিভীষণ পন্থার দেশদ্রোহিতা, পাঁচশালের বোমারুদের ধরিয়ে দেওয়া, চোদ্দ-সালের নেতাদের নির্ব্বাসন দান—এর মূলে এই উলুখড়রূপে তোমার জাত-ভাইরাই ছিল মলয়…অস্বীকার করে লাভ কি ?

মলয়ের ইতিহাসজ্ঞান নিতান্তই কম, বিশেষ করে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস। পাছে কোনো বেফাঁস কথা বলে ফেলে, এই জন্য ওঁকে সমর্থন করেই বললো—তা ঠিক কাকীমা,—দেশের লোকেরাই বিভীষণ !

—না মলয়, বিভীষণ সবদেশেই থাকে,—কিন্তু তারাই তো দেশের সব নয়। অন্য অন্য যারা ;—যারা পৃথিরাজ, প্রতাপসিংহ, শিবাজী, যারা সংযুক্তা-পদ্মিনী-ঝাঁন্সির রাণী—তারাও ছিল, তারা আজো আছে—তারাই এই মৃত্যুযজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত করে বুঝুক, এই রক্তক্ষয়ের প্রয়োজন ছিল। এই যজ্ঞ থেকে জন্মাবে মরণোত্তর উলুখড়-সন্তান, যার একত্রীভূত শক্তি পৃথিবীর শাসককেও সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিতে পারবে। শাসিতের অমতে শাসনদণ্ড সেদিন নিশ্চল হয়ে যাবে,—শাসক চ্যুত হবে সাম্রাজ্য থেকে।

কথাগুলো অত্যন্ত মোলায়েম স্বরে বলা হলেও বেশ কঠিন লাগছে। মলয় মুখের খাবারটা খেয়ে জল খেল কয়েক ঢোক, তারপর বললে,

—বড্ড আজ রাত হয়ে গেল কাকীমা, আর একদিন—পরশু এসে আলোচনা করবো !

—হ্যাঁ বাবা, রাত হয়ে গেল—অবশ্য এপাড়ায় সান্ধ্য আইন নেই। আর তুমি তো "কারএ" যাবে ?...

—হ্যাঁ !—মলয় সময়োচিত অভিবাদন করে বেরিয়ে গেল। কাবেরী চুপটি করে শুনছিল মা'র সঙ্গে মলয়ের কথা। এতক্ষণে বাপের অজ্ঞাতে বললো, —ওর সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ কথা কেন আজ তোমার মা ? ব্যাপার কি ?

—দেখছিলাম তোর সঙ্গে বন্‌বে কি না।

—ওঃ ! কি রকম দেখলে ?

—চালিয়ে নিলে চলে যেতে পারে।

—বটে, তবে আর কি ! লাগিয়ে দাও।—কাবেরী হাসলো।

—কিন্তু তুই তো ওকে ভালবাসিস না খুকী ?

—তাতে কি মা ! আজকালকার আইনে যাকে ভালবাসে না, তাকেই বিয়ে করে।

—কিন্তু আমি চাই, আমার মেয়ে যাকে ভালবাসে, তাকেই বিয়ে করবে। অবশ্যি যদি সে বিয়ের আগে কাউকে ভালবেসে থাকে।

—কিন্তু সে যদি রাজদ্রোহী হয় ?

—রাজদ্রোহী কেউ নেই ভারতে ! রাজদ্রোহী বলে যারা এতকাল জেলে আছে, তারাই ভারতমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান—পরাধীন দেশে রাজদ্রোহ কিসের ? স্বদেশের যে ক্ষতি করে, সেই রাজদ্রোহী !

—যদি সন্ন্যাসী হয় ?

—আমার মেয়ে তাকে গৃহী করবার জন্য তপস্যা করবে, নইলে সন্ন্যাসিনী হয়েই তার ধর্ম্ম আচরণ করবে—আমার সতী-শোণিত আমি তার মধ্যে প্রবহমান দেখতে চাই—কণ্ঠস্বর মার আবেগ-বিহ্বল।

কাবেরী অকস্মাৎ মার পায়ের উপর লুণ্ঠিত হয়ে বলল—

—আমায় আশীর্ব্বাদ করো মা, তোমার মেয়ে যেন সন্ন্যাসীকে গৃহী করতে পারে, নইলে নিজে সন্ন্যাসিনী হতে পারে।

—সেই আশীর্ব্বাদ আমি তোকে করছি কাবেরী—তোর বাবার বুদ্ধি তোর মধ্যে যতই তীক্ষ্ণ হোক, আর না হোক, তোর মার সতীত্বনিষ্ঠা যেন তোর মধ্যে অবিচল থাকে।

কাবেরী আবার মায়ের পায়ের ধূলো নিল মাথায়।

প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করা অভ্যাস লোকাধীশের, কিন্তু গত রাত্রে মনের অত্যধিক উত্তেজনার জন্য ঘুম আসতে দেরী হয়েছিল, তাই এখনো বেলা আটটা অবধি সে শয্যা ত্যাগ করেনি। বন্ধুপত্নী শুভ্রা প্রথমটা ভেবেছিল হয়তো লোকাধীশের শরীর ভাল নেই, কিন্তু রহস্য করবার লোভ সে ছাড়তে পারলো না—দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললো হাসতে হাসতে,

— এত বেলা অবধি যিনি ঘুমান, তিনি আবার দেশোদ্ধার করিবেন কি করে?

—দেশোদ্ধারের আগে তাই আত্মোদ্ধারই করতে হবে—বলতে বলতেই লকু প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়লো, বললো—নিজে না উঠলে কাউকেই উঠানো যাবে না, এ কথা খুবই খাঁটি বৌদি,—কিন্তু নিজেকে উঠাতেও গুরু দরকার; আপনারাই সেই গুরুর কাজটা করবেন। অর্থাৎ আমাকে ডেকে উঠিয়ে দেওয়া আপনারই উচিত ছিল।

—বা রে! আমি ভাবছি শরীর-টরির খারাপ নাকি; আপনি তো বেশ উল্টো চার্জ দেন—শুভ্রা সরলভাবেই বললো কথাটি কিন্তু লোকাধাশ উঠার পর থেকেই কুটিল।

—শরীর খারাপ বা ভাল দেখবার ভারটাও থাকে গৃহকর্ত্রীর ওপর। তবে এ ক্ষেত্রে যখন জাগরণের কথা, আত্মোন্নয়নের কথা, তখন অনুপ্রেরণাও আপনি দেবেন—বলে সে বেরিয়ে যাচ্ছে, মুখ ধুয়ে চা খাবে। শুভ্রা বললো আস্তে আস্তে,

—বিয়ে করে অনুপ্রেরণা জাগাবার, এমনকি ঘুম থেকেও জাগিয়ে দেবার গুরু যোগাড় করুন না।

—সে পরের কথা বৌদি, এখানে আমি আপনার অতিথি, অতএব ও কাজটা আপনারই !—বলে লোকাধীশ হাসতে হাসতে বাথরুমে চলে গেল। শুভ্রা আধুনিকা, কলেজে পড়া মেয়ে ; কারো কাছে, বিশেষ করে, কোনো পুরুষের কাছে হার স্বীকার করা তার স্বভাবের বাইরে। আধুনিক ইংরাজী-ঘেঁসা কলেজে এই তর্কপ্রবৃত্তিটা খুব তীক্ষ্ণ ভাবেই জাগিয়ে দেওয়া হয়, তার কারণ বিদ্যার পল্লবগ্রাহিতা মানুষকে বিদ্বান করে না, করে বিদ্বত্বাভিমানী এবং অহঙ্কারী। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগণ একথা শুনলে হয়তো লেখকের উপর চটে যাবেন, ছাত্রছাত্রীরা তো চটবেনই, কিন্তু একথা সত্য ; অথচ এই ভারতেই এক-দিন ছাত্রজীবনের কি মহান ঔদার্য্য এবং সন্ধানশীলতা ছিল—পরমত-সহিষ্ণুতা এবং স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য অকাট্য যুক্তিজালের অশেষ বিদ্যা অর্জন করতেন তাঁরা। পরাজয়কে তাঁরা অগৌরব বলে জ্ঞান করতেন না এবং বিজয়কেও অপরের নিগ্রহে নিয়োগ করতেন না। লোকু এই সব কথা ভাবতে ভাবতে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে বাইরে এল, ইতিমধ্যে শুভ্রাও কয়েকটা কথা ভেবে রেখেছে তাকে জব্দ করবার জন্য। লকু আসতেই বলল,

—জাগাবার কাজটা তো অপরের দ্বারা হয় না ঠাকুরপো ! হয় নিজের অন্তর থেকে কিম্বা অন্তরতম কারো দ্বারা—আমার আতিথেয়তার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তাকে অস্বীকার করা বৃথা।

—অন্তরতম কেউ যখন নেই, তখন নিজের অন্তর থেকেই জাগতে হবে বৌদি—বলে লোকাধীশ যেন হার স্বীকার করেই চা খেতে বসলো। কিন্তু এরকম হার স্বীকারেও বিপক্ষের তর্কপ্রবৃত্তি তৃপ্তি মানে না ; শুভ্রা লকুকে উত্তেজিত করবার জন্য চা দিতে দিতে বললো,

—মানুষ কিন্তু চায়, অপর কেউ একজন তাকে জাগিয়ে দেবে অর্থাৎ অন্তরতমকেই চায় সকলেই।

—চায়—চাইলেই সব বস্তু পাওয়া যায় না বৌদি, পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়—বলে লকু চায়ে চুমুক দিল। সকালের তর্কটা ওর খুব ভাল লাগছে

না—তর্কটাকে ও এড়িয়ে যেতে চাইছে। শুভ্রা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী, বুঝে বললো,

—যোগ্যতা অর্জনের জন্য কী সাধনা করতে হবে?

—অনেক! প্রথমতঃ এই বৃথা তর্ক-প্রবৃত্তিকে সংযত করতে হবে আমাদের। অকারণ কথার পর কথার ফেনা জমিয়ে আমরা পাহাড়ের মত উঁচু করছি, কিন্তু ওগুলো সব ফেনা—ফু দিলেই জল হয়ে যায়।—বলে লকু থামলো।

আক্রমণটাকে এড়িয়ে যাবার জন্য শুভ্রা বললো—কথা তো কইবার জন্যই।

—কিন্তু আমরা অনেক অ-কথা বলি, এমন কি কু-কথাও। কথা কইবার জন্যই কিন্তু সে কথা হবে সংযমে দৃঢ়, সংকল্পে অমোঘ আর প্রকাশে ঋজু। চায়ে আর এক চমুক দিয়ে লোকু বলে চলল—

—তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার এবং শিক্ষকের। মানুষ আজ বড় বেশী কথা বলে বৌদি,—কাজ তার লক্ষ ভাগের একভাগ হলেও যথেষ্ট হোত। আজ মানুষ কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিতে চায়, নিজের কথা দিয়ে নিজের কথারই বিরুদ্ধাচরণ করে, আবার কথা দিয়েই তাকে ঢাকতে চায়!—কিন্তু কথার মালা ছেড়ে দিন এবার; আমি শুধু ভাবছি, ভারতের বর্ত্তমান ইতিহাসের কথাগুলো ভবিষ্যতের কোন কথায় লেখা হবে, সেকথা রক্ত দিয়ে, না আগুন দিয়ে, না জল দিয়ে লেখা হবে!

লোকাধীশ উত্তেজিত হয়েছে যথেষ্ট। শুভ্রা তৃপ্ত হয়ে উঠলো। এইটাই সে চায়। উত্তেজিত এই অসাধারণ সুন্দর এবং দেশপ্রেমিক যুবকটির অনর্গল বাক্যস্রোত শুনতে ওর ভাল লাগে। শুধু ভাল লাগে নয়, অন্তরে প্রভাব জাগে। শুভ্রা বললো,

—আগামী ইতিহাস লেখবার জন্য লেখক আমরা সৃষ্টি করবো ঠাকুরপো!

—বড় সুন্দর কথা বললেন। আপনারাই তো সৃষ্টি-কারিণী! আজ আপনাদের সন্তানকে শিক্ষা দেবার দিন এসেছে যে ভারতের অতীতই ভারতের ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করবে। অতীতের দোষ, যেমন জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, ধর্ম্মগত বিদ্বেষ-

প্রদেশগত প্রতিযোগিতা যুগের কষ্টি পাথরে অশুদ্ধ বলে পরিত্যক্ত হোক; কিন্তু এই অগ্রগমনের অভিযানের পথে সামাজিক বা ধর্ম্মগত এবং ব্যক্তিগত প্রতি ব্যাপারেই আমাদের অতীতকে চিন্তা করতে হবে। সেদিনের পুরুষত্ব, বীর্য্যবত্বা, শৃঙ্খলা, সৎসাহস এবং ন্যায়ের জন্য মৃত্যুপনের দৃঢ়তা আবার ফিরিয়ে আনতে হবে সন্তানদের মধ্যে। আমাদের ধর্ম্ম,, যে ধর্ম্ম সিন্ধু-উপত্যকার সুপ্রাচীন দিন থেকে আজকার এই আনবিক যুগ পর্য্যন্ত আর্য্য-দ্রাবিড়-বৌদ্ধ-হিন্দুর সমবেত প্রতিভার পূর্ণ সমন্বয়, তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে আমাদের সন্তানের মধ্যে।

—কাজটা বড় কঠিন ঠাকুরপো—ভারত আজ কশমোপলিটন!

শুভ্রার কথার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না কিন্তু লকু বললো—মাতৃজাতি সন্তানের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য কঠিনতম ব্রতও গ্রহণ করবেন। ভারতে আজ বহু জাতির সমন্বয় ঘটেছে কিন্তু ভারতের যা নিজস্ব, ভারত কেন সেটা ত্যাগ করবে? যারা এদেশে এসেছে, তারা পারে তো তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করুক, না পারে, কোল, শক, হুন, যাযাবরের মত মিশে যাক—যেমন অতীতে একদিক মিশেছিল বহু বৈদেশিক, বহু বিধর্ম্মী, বহু বিচিত্র সভ্যতার মানুষ। এই ভারতকে সংস্কৃতির দিক থেকে কেউ কোনও দিন গ্রাস করতে পারে নি, কারণ ভারতের সংস্কৃতি যুগে যুগে পরীক্ষিত সত্য সংস্কৃতি!—লকু পরোটা চিবোবার জন্য থামলো!

—কিন্তু সংস্কৃতি নিয়েই শুধু মানুষ বাঁচতে পারে না ঠাকুরপো, তার ডাল ভাতেরও দরকার।

—অবশ্যই দরকার—কিন্তু আপনার কথাটা এখানে একান্তই অবান্তর হোল বৌদি—অনর্থক বললেন ওকথাটা। ডাল-ভাতের আবশ্যকতা কেউ অস্বীকার করে না, করলে বাঁচে না সে, বাঁচেনা তার সংস্কৃতি, সভ্যতা। কিন্তু ডাল-ভাতের জন্য সংস্কৃতিকে ত্যাগ করারও তো কোনো অর্থ হয় না। মানুষ শুধু তার বর্ত্তমান নিয়েই বাঁচে না, মানুষ বাঁচে তার অতীতের ঐতিহ্যের ভূমিতে দাঁড়িয়ে,

আর ভবিষ্যতের আকাশে মাথা রেখে ; মানুষের বর্ত্তমানটা অত্যন্ত জরুরী কিন্তু অত্যন্ত স্বল্পায়ু ; অতীতই তার বিরাট এবং ভবিষ্যৎ বিরাটতর।

লকু উপর্য্যুপরি কয়েক ঢোক চা খেয়ে কাপ নামালো।—বর্ত্তমানকে চালিয়ে নেওয়া নিতান্তই সাধারণ কাজ—ওটাকে যে-কোন অবস্থায় মানুষ অতিক্রম করতে পারে এবং করেও থাকে, কিন্তু অতীতের পরীক্ষিত সত্যের মালমসলায় যে দূর-প্রসারী ভবিষ্যৎ তাকে রচনা করতে হবে, সেইটাই তার যথার্থ কাজ আর তাতেই ভবিষ্যৎ যুগের সন্তানের বর্ত্তমান সুন্দর হয়, আনন্দময় হয়, ঐশ্বর্য্যময় হয়—লকুর উজ্জ্বল আয়ত চক্ষু আরো দীপ্ত হয়ে উঠলো কথাগুলো বলতে বলতে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে ওর উত্তেজিত মুখখানা ; প্রথম যৌবনের বলিষ্ঠ দীপ্তি ওর মুখে, আগামী যুগের সম্ভাবনা ওর চোখে আর ওর কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে যুগযুগান্তব্যাপী সত্যের শঙ্খধ্বনী। শুভ্রা মুগ্ধ হয়ে উঠতে লাগলো ; ওর মুখে হাসির অনুরঞ্জন।

* * * *

চা খাওয়া শেষ হয়েছে !

চোখ মেলে দেখতে লাগলো শুভ্রা লোকাধীশের সুন্দর মুখখানা। উত্তেজিত লোকাধীশ বজ্রগম্ভীর স্বরে বলে চলেছে তার অন্তর্ব্বেদনায় সিক্ত সত্য ; —প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা বলে আপনাকে বিভ্রান্ত করতে চাইনে—পৌরাণিক যুগও না হয় বাদ দিলাম, যদিও আমাদের উপনিষদ আর পুরাণের ঐতিহ্য আজো আমাদের জীবনের প্রতি কথায় এবং প্রতি কাজে জড়িয়ে আছে, ইংরাজের সর্ব্বগ্রাসী সভ্যতা তাকে এখনো গ্রাস করতে সমর্থ হয় নি—কিন্তু ঐতিহাসিক যুগকে তো আপনার মানতেই হবে ! ইতিহাসকেই অগ্রগতিপথের নির্ভুল ইঙ্গিত ভেবে অবলম্বন করতে হবে—নইলে নতুন পথ খুঁজে বের করবার পরীক্ষায় হয়তো কয়েক শতাব্দিই কেটে যেতে পারে এবং তারপরও হয়তো পথটা ভুল প্রমাণিত হওয়া বিচিত্র নয়।……কিন্তু আমি শিক্ষার কথা, মনুষ্যত্ব-বোধের কথা, মানুষের নৈতিক মানদণ্ডের ঋজুতার কথাই বলছিলাম…।

—তা হোক, আপনি যা বলছেন, তাই বলুন ; ইতিহাসের কথাও বড় ভাল লাগে আপনার মুখে···আর এককাপ চা দেব ?—শুভ্রা হেসে বলল।

—থাক—ধন্যবাদ···লকু জবাব দিয়ে আর একটু থামলো, তারপর বললো, —ইতিহাস সত্যি নেই আমাদের। যা আছে, তার অধিকাংশই মিথ্যে ইতিহাস! আমাদের যা কিছু সত্য এবং যা কিছু ভাল, তার সবটাই ইংরাজ-রাজ আমাদের মনের চোখে খারাপ বলেই ধরে রেখেছে শতাধিক বৎসর। তবু এর মধ্যে মনীষী রামমোহন, যুগপ্রবর্ত্তক শ্রীরামকৃষ্ণ, বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ইত্যাদি মহামানবরা আমাদেরকে বারম্বার বলে গেছেন, ভাল আমাদের বিস্তর আছে। তারপর এলেন—বঙ্কিম, রবীন্দ্র। সাহিত্যের স্বুবর্ণ-প্রকোষ্ঠ খুলে দিলেন ; বঙ্কিম বললেন—"সাহিত্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে, কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, সাহিত্যেরও সেই উদ্দেশ্য,—চিত্তশুদ্ধি জনন। সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা তাঁহারা জগতের চিত্তশুদ্ধি করেন—" অন্যত্র তিনি বলছেন— "সাহিত্য ধর্ম্ম ছাড়া নহে, কারণ সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম—" এই ধর্ম্মকে অর্থাৎ যে সদ্ বস্তু আমাদের ধারণ করে আছে, তার উল্লেখ করে মানুষের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তিনি অঙ্কিত করে গেছেন,—"যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধর্ম্ম একত্র হইবে, সেই দিন মানুষ দেবতা হইবে। তখন ঐ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রযোগ হইবে না—।" কিন্তু বৌদি, এই ইউরোপের সঙ্গে ভরতের মিলনের যে কোনো ইসারা আজও পাচ্ছি না! এই মিলন ঘটাবে কে? কার শক্তিতে এই অঘটন ঘটতে পারে? গত এশিয়া কন্‌ফারেন্সে বড় আশা করেছিলাম, কিছু হবে—কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হযে গেছে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রতিভার সঙ্গে সার্ব্বজনীন নীতিধর্ম্ম এবং ভারতের মহাবাণী পাশ্চাত্যে প্রচারিত হয়েছে কিন্তু তারপর সেই সংযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হতে বসেছে—বিজয়-নিশান বহন করে বাঙালী তো কই রাষ্ট্রক্ষেত্রে, সমাজ-সমন্বয়ে, নৈতিক সাধনায়

পৃথিবীর পটভূমিতে দাঁড়ালো না! মহাত্মা গান্ধীর ত্রিশবছরের অহিংসবাদও হয়তো ব্যর্থ হোল...কিম্বা সাফল্যের এখনো দেরী আছে।

—"গুড়ুম-গুড়ুম···পরপর দুটো আওয়াজ হয়ে গেল বন্দুকের। সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ এবং ভীত-ত্রস্ত মানুষের দ্রুত পদশব্দ, দরজা-জানালা বন্ধ করার আওয়াজ···কি এ ?—

—আপনাদের অহিংসাবাদ পরীক্ষিত হচ্ছে—বলে হেসে উঠলো শুভ্রা—বললো, —এখনো যাঁরা মানুষের ন্যায়বোধ আর নীতিজ্ঞানের উপর ভরসা রেখে আবেদন আর স্তোকবাক্য উচ্চারণ করেন ঠাকুরপো, তাঁরা হয় জেগে ঘুমুচ্ছেন, নইলে আর জাগবেন না, তাঁরা মরেছেন···বলে শুভ্রা তার কথা শেষ করলো। গোলমালটা বাড়ছে। সনৎ বাইরে গেছে—হয়তো বাজারে। লোকাধীশ চিন্তিত হয়ে বলল,—সনৎ বাইরে রয়েছে—বিশেষ চিন্তার কথা!

—ঘরেও কিছু কম চিন্তার কথা নয় ঠাকুরপো! ইংরাজ-রাজত্ব কায়েম থাকতে থাকতেই ঘরে আর সুন্দরবনে তফাৎ ঘুচে গেল—'জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ' আজ; যে কলকাতাকে ইংরাজ সাধের রাজধানী করে গড়েছিল, তাকে শ্মশানের প্রেত করে রেখে যাবে।

—না না, বৌদি,—মানুষের নীতিজ্ঞান নিশ্চয় আছে, তবে জাগতে দেরী হয়!

—তাকে জাগাতে যে চাবুকের প্রয়োজন তা আপনাদের দুর্ব্বল হাতে নেই। অন্ততঃ অহিংসার অপব্যাখ্যার মধ্যে নিশ্চয়ই নেই—শুভ্রা অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বললো—অহিংসা বীরের ধর্ম্ম বলে আস্ফালন করলে কি হবে—বীরত্ব বহুকাল মুছে গেছে এদেশ থেকে, এও আপনার ঐ ঐতিহাসেরই কথা—অশোক, যাঁর রাজ্য ছিল সাগরাম্বরা পর্ব্বত-কিরীটিনী ভারতের তিন চতুর্থাংশেরও বেশি, অপাত্রে অহিংসার প্রয়োগ আর অনধিকারাকে ধর্ম্মদানের চেষ্টায় তাঁর অতবড় রাজ্য তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই ধুলিস্যাৎ হয়ে গেল—অখণ্ডঃ মহাপ্রতাপশালী ভারত সেইদিন থেকে বিচ্ছিন্ন; **History repeats itself** সেই পুরানো কথার পুরানো দিন

আবার আসবে—ভারতের ভাগাভাগী হয়ে যাচ্ছে, এবার অন্তর্বিপ্লবের সঙ্গে আপনার ঐসব বড় বড় নীতিকথার সমাধি রচিত হবার দেরী নেই।—শুভ্রাও যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে তর্ক করছে; তর্কের সুযোগ পেলে সে ছাড়ে না। হয়তো তর্কটা আরো বহুদূর অগ্রসর হোত কিন্তু এই নির্ম্মল শুভ্র প্রভাতে কে জানতো, শুভ্রার অদৃষ্টে নির্ম্মম নিয়তির ক্রূর অভিশাপ লেখা আছে!

ভেজানো দরজাটা ঠেলে চারজন লোক ঢুকে পড়লো বাড়ীতে। অকস্মাৎ অতর্কিত আক্রমণ—ঘরের রাঁধুনী ঠাকুরটা পাইখানা দিকের পাঁচিল টপ্‌কে পালিয়ে গেল মুহূর্ত্তে; বুড়ি ঝি রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে চীৎকার আরম্ভ করে দিল—ওগো, মেরে ফেল্লে গো।

সশস্ত্র লোক চারজন সটান উঠে এল দোতলার বারান্দায় যেখানে লোকাধীশকে চা খাওয়াচ্ছিল শুভ্রা। লোকাধীশ উঠে বললো,

—কি চান আপনারা?

—পাকড়ো শালাকে—তুমি শালা বোমা ছুড়িয়াছে—বলেই নিরস্ত্র লোকাধীশের গালে সে প্রচণ্ড একটা চড় কসে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজন তার ঘাড় ধরে ঠেলতে ঠেলতে কোণের ঘরটার দিকে নিয়ে যেতে চাইছে; নিরস্ত্র লোকাধীশ অহিংস, তবু বললো,

—আমরা বাড়ীতে বসে চা খাচ্ছি, বাইরে যাই নি……

—চুপ রহো শালা—বলে অন্য একজন তাকে মারলো লাথি। শুভ্রা ভয়ে কাঁপছিল কিন্তু বেশিক্ষণ তাকে কাঁপতে হোল না! ওদের অন্য একজন দুহাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছে. লোকাধীশ প্রাণপণ বলে নিজকে মুক্ত করে ভীমবেগে লাফিয়ে পড়লো ওদের মাঝে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তার মাথায় পড়লো প্রচণ্ড আঘাত, সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল লোকাধীশ—আর্ত্ত নারীকণ্ঠের করুণ ক্রন্দন শোনা গেল…প্রভাতসূর্য্য শুনলেন।

প্রভাতসূর্য্য মধ্যাহ্নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন--নির্মেঘ, স্তব্ধ আকাশ; নীরবে এই পল্লীটাও পড়ে আছে অজগরের মত; তার নাভিশ্বাসের শব্দও শোনা যায় না; সান্ধ্যআইন জারী হয়ে গেছে কিছুক্ষণ হোল—বাইরে বেরুনো নিষিদ্ধ। সনৎ হয়তো ফিরতে পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ গুণ, 'আইন মান্য করা' তার মজ্জাগত; কিন্তু ঝিটা রান্নাঘরেই ছিল। গুণ্ডারা বেরিয়ে গেলে সে ভালকরে চারদিক দেখলো—তারপর উপরে উঠে শুভ্রাকে দেখতে গিয়ে দেখতে পেল, অজ্ঞান লোকাধীশের মাথা আর ডানহাতের খানিকটা জায়গা কেটে গিয়ে রক্তের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। কিন্তু শুভ্রাকেই আগে জল দিল সে; মুখে মাথায় জল দিতেই শুভ্রা চোখ মেলে তাকালো,—তার সতীত্ব লাঞ্ছিত হয়েছে, কিন্তু সে তখনো বেঁচে আছে! মহাত্মাজীর কথামত মৃত্যু বরণ করতে পারবে বলেও মনে হয় না। ওদিকে লোকাধীশ জীবিত কি মৃত, কে জানে! ক্ষীণকণ্ঠে ঝিকে বললো,

—ওঁকে দেখ—জল দে চোখে মুখে! আছেন কি না, দেখ আগে।

ঝি এগিয়ে এল, দেখলো, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলো না। জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে যে ক্ষীণতম সূত্র তারই মাঝে লোকাধীশের প্রাণবায়ু হয় তো দুলছে। নিজকে মনের বলে সবল করে শুভ্রা এল এগিয়ে। চোখেমুখে বারকয়েক জলের ঝাপটা দিয়ে দেখলো, লোকাধীশ মরে নি! তবে বাঁচবে কি না, তাও বলা যায় না। হতাশ হয়ে আকাশের উজ্জ্বল নীলিমার পানে চাইলো শুভ্রা; মানুষ যখন প্রাণের সমস্ত আকুতি দিয়ে ঈশ্বরকে ডাকে তখন হয়তো তিনি শুনতে পান—একখানা এম্বুলেন্স যাচ্ছে; শুভ্রা ঝিকে বললো—ডাক—ডাক এখানে।

অজ্ঞান লোকাধীশকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল শুভ্রা, নিজে গেল না। যেখানে ছিল, সেইখানেই মেঝের উপর শুয়ে রইল সনতের ফেরার অপেক্ষায়। ওর গলার হার, হাতের চুড়ি আর কাণের দুল অপহৃত হয়েছে—হয় তো ঘরের মধ্যে যা ছিল, তাও গেছে, তার জন্য দুঃখ ওর কিছু মাত্র নেই—গেছে

ওর নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ রত্ন সতীত্ব, ওর আবাল্য অর্জিত সংস্কার, ওর আজন্ম লালিত ধর্ম্ম! শুভ্রা আকাশের পানেই নিষ্পলক নেত্রে চেয়ে রইল। সে জানে, তার নীতিজ্ঞান-বিশারদ স্বামী আইনকে ফাঁকি দিয়ে ঘরে আসবে না—আসা নিরাপদও নয়—কিন্তু সে এখন করবে কি? জীবনের এই মহা-দুর্দ্দিনের জন্য সে যে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। এর পর কি সে করবে, কোথায় সে যাবে? বাপের বাড়ীর দরজা ওর কাছে বন্ধ হয়েছে অনেকদিন, স্বামীর বাড়ীর কি হবে কে জানে! তাহলে কি সে সমাজের উপদেশমত আত্মহত্যা করবে?—কিন্তু কেন? ক্লীবত্বের চরম গহ্বরে না গেলে কেউ আপনার মাতা-ভগ্নীকে আত্মহত্যা করবার উপদেশ দেয় না—অহিংস হয়ে বীরের মত মৃত্যু বরণ করতে বলে সেই ব্যক্তি, অহিংসা যার কাছে শুধু আত্মতোষণ এবং আত্মবঞ্চনা। যুগ যুগ ধরে মানুষের ইতিহাস মানুষকে নীতি, ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য শিক্ষা দিয়েছে—দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচারকে ঘৃণিত বলে অভিহিত করেছে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আর পরলোকের ভীষণতার কথা বলে সৎ করবার চেষ্টা করেছে, তবু মানুষ সৎ হোল না—হবে বলেও কেউ আশা করে না, তবুও মানুষের মধ্যে মাঝে মাঝে এক আধজন নীতিধর্ম্ম কর্ত্তব্য শিক্ষার আর অনুশীলনের কথা বলে মানুষের রাজত্বকে দেবরাজত্ব করতে চেষ্টা করেন—ফলে তাঁরাই দেবতা হয়ে যান, বাকী সবাই বর্ব্বর, বন্য, পশুপ্রকৃতির মানুষই থেকে যায়। আজপর্য্যন্ত মানুষের এই-ই ঐতিহাস! একজন মনীষীর কথা মনে পড়লো, তিনি বলেছেন—Progress is undoubtedly the **law of life**···কিন্তু সেই অগ্রগতি কোনদিকে? গীতা বলেন—ব্রহ্ম সাজুয্য! মম সাধর্ম্ম্ আগতাঃ অর্থাৎ সৎ চিৎ আর আনন্দভাবে সুবিকশিত হবে এবং তখন নাকি তাঁরা হবেন স্বর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ—মানুষের নাকি এই নিয়তি। কিন্তু গীতার বাণী শোনার পর অন্ততঃ হাজার পাঁচেক বছর কেটে গেল, কৈ, মানুষ তো ব্রহ্ম সাযুয্য দূরে থাক, তিল মাত্র সে পথে এগিয়েছে বলেও মনে হয় না! বরং যুগের প্রভাবে সে বহু বহু দূর

পিছিয়ে এসেছে এবং আরো পিছিয়ে আসবারই চেষ্টা করছে। যে ক্ষমতা-প্রিয়তা সেদিন ব্যক্তিগত জীবনে প্রকটিত করে মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করতো, তার ধর্ম্মগত, সমাজগত এবং রাষ্ট্রগত জীবনে সেই ক্ষমতামত্ততাকেই আজ সে প্রতিষ্ঠিত করেছে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার চালাবার জন্য! কে এর বিচার করবে? কোথায় সেই ভীরু ভগবান যিনি বলেছেন—অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। শুভ্রারঅত্যাচারিত অবসন্ন মস্তিষ্কের মধ্যে চিন্তার বিষ যেন হিংস্র হয়ে উঠলো; আরো কতক্ষণ যে সে এমনি আবোল তাবোল ভাবতো কে জানে। সনৎ বাড়ী ফিরে এলো। খবরটা বাইরেই পেয়েছে পাড়ার এক বৃদ্ধের কাছে—ধীরে এসে দাঁড়ালো শুভ্রার মাথার শিয়রে। শুভ্রা শুধু চাইল; —তার চোখে জল নেই, আগুন জ্বলছে।—আহিতাগ্নি নয়—চিতাগ্নি।

মধুকে সঙ্গে নিয়ে বিকালে এসে পৌঁছালেন সন্ন্যাসী অপর একটা গ্রামে। এইখানেই এ তল্লাটের আদিবাসীদের সর্দ্দার মাতাল মাঝির বাড়ী।

সন্ন্যাসীকে ওরা প্রায় সকলেই চেনে—কখনো না কখনো তাঁকে দেখেছি। উনি দীর্ঘকাল এদিকে থাকার জন্য এবং এদের বহু উপকার করার জন্য এদেশে বিশেষ খ্যাতিমান! মাতালের মেয়ে রেবতী ওকে দেখেই বল্‌লো,—ঠাকুর বাবা এত্তো অবিলায় যে? চাকা ডুবতে বসেছে!

চাকা অর্থে সূর্য্য—এদেশের বাসিন্দারা এইরকম কথা ব্যবহার করে! মধু বাঁশীটা হাতে নিয়ে পিছনে ছিল, রেবতীকে দেখেই আনন্দে ওর সারা অঙ্গ স্পন্দিত হচ্ছে। কি চমৎকার দেখতে হয়েছে রেবতী! আহা, যেন কষ্টিপাথরে কোঁদা মূর্ত্তি। মধু কিন্তু শুধু আড় নয়নে চাওয়া ছাড়া আর কিছু করলো না; দেখতে লাগলো রেবতীর যৌবনোদ্বেলিত দেহবল্লরী।

—হ্যাঁ!—বলে সন্ন্যাসী হাসলেন! এই সারল্য ও'র ভাল লাগলো, সুধুলেন —তোর বাবা কোথায় রেবতী? ঘরে আছে তো?

—না—তু বোস কেনে। আক্ষুনি আসবেক বাবা! তামুক খাবি?

—না রে, তামাক আমি খাই না—বলে উনি বসলেন প্রকাণ্ড একটা শাল গাছের ছায়ায। গাছটা অত্যন্ত উঁচু এবং সরল, যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেছে মাথা তার। অপরাহ্ণের স্বর্ণাভ সূর্য্যরশ্মি ওর মাথার চিকন পাতায় ঝিলমিল করছে—ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে!

—এই গাছটার বয়স গেল একশো বছরের উপর—উনি বললেন—গত সাঁওতাল বিদ্রোহের সবটাই ও দেখেছে—শুধু তাই নয়, ও হয়তো এই আদিবাসীদের এইখানে বসতি স্থাপন করতে দেখেছে; তাদের পরিপুষ্টি পরিবর্দ্ধনও দেখেছে—ওই সাক্ষী আছে।

—ঠিক তুই বলছিস্ সাধুবাবা! বলে মাতাল এসে দাঁড়ালো—হোই গাছটো বেখন ছুট্টো ছিল এত্তোটুকুন, তেখন আমার ঠাকুরদাদা ভোর যোয়ান, লড়াই করেছিল সেই সুময়। ঠাকুরদাদা হোই গাছটো কাটে নাই—বাবাও কাটে নাই, আমিও কাটবেক নাই।

—তাই তো বলছি—সন্ন্যাসী বললেন,—কত যুদ্ধ বিগ্রহ, কত উত্থান পতন, কত সুখদুঃখ তোরা আমাদের সঙ্গে ভোগ করছিস কতকাল থেকে। আজ ভারতের শাসক ইংরাজ—তার কাছে তোরাও যেমন পরাধান, আমরাও তেমনি পরাধীন। সেই শেকল ছিঁড়তে আমাদের যেমন চেষ্টা করতে হবে, তোদেরও ঠিক তেমনিই করতে হবে।

—হুঁ—তা তো বটেকই, কিন্তুক, তুরা নাকি বলছিস—তুরা দেকো?

—তোরাও দেকো—সেই কথাটাই আমি তোদের বোঝাতে এসেছি। এই দেশের তোরাই আদি বাসিন্দা—এমন কি, আমাদের আগে থেকে তোরাই ছিলি, এখনো তোরাই থাকছিস, তোরাই থাকবি। শোন:—তোরা বালের ক্ষত্রিয়।

হরিবংশে লেখা আছে—

মহাযোগী স তু বলির্বভূব নৃপতিঃ পুরা।
পুত্রানুৎপাদয়ামাস পঞ্চ বংশ করান্ ভুবি॥
অঙ্গঃ প্রথমতো জজ্ঞে বঙ্গঃ সুহ্মস্তথৈব চ।
বালেয়া ব্রাহ্মণাশ্চৈব তস্য বংশ করা ভুবি॥*

মানেটা তোকে বোঝানো কঠিন; তোরা অসুররাজ বলির বংশধর—তোদের বালেয় ক্ষত্রিয় বলা হোত; তোরা এই দেশ রক্ষার জন্য, এই দেশের মঙ্গলের জন্য যুগে যুগে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করেছিস। আরো শোন, শতপথব্রাহ্মণে তোদের আসুর্য্য বলা হয়েছে। তোরা সেই এক প্রজাপতি থেকে জন্মেছিস। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তোদের বলা হয়েছে পতিত আর্য্য আর মহাভারতে তোরা অসুররাজ বলির বংশধর মহর্ষি দীর্ঘতমার স্পর্শজ সন্তান, গঙ্গাস্নান পরায়ণ পরম ধার্ম্মিক হিন্দু দেকো। মনুসংহিতাতে তোরা পূরো ক্ষত্রিয় হয়ে আমাদের সঙ্গে এক ধর্ম্মে এসে যোগ দিয়েছিস; এমন কি অনেকে ব্রাহ্মণ হয়ে আমাদের সমাজে মিশে গেছিস!

—তাই যদি ঠিক, তবে ঐ সব জিভ্ গাড়ীর মানুষগুলোন বলে কেন যে আমরা দেকো লই?

—কেনো বলে?—বলায়। ওদের কোথায় স্বার্থ আর তোদের কোথায় ক্ষতি, সেই কথাটাই আমি বলতে এসেছি—লোক জমা করতে পারবি?

—হুঁ, কেনে না পারবো!—বলে মাতাল মাঝি তখুনি কয়েকজনকে তাদের নিজের ভাষায় আদেশ করলো পল্লীর কয়েকজনকে ডাকতে; ওরা চলে গেল। মাতাল বললো—তু থাক আজ সাধুবাবা, কালকে আমি হাজার মানুষ জমা করে দিব। তু বল উয়োদেরকে যে আমরাও দেকো (হিন্দু)!

—বেশ—আমি থাকলাম! বলে সন্ন্যাসী সম্মতি দিলেন।

মাতাল মাঝি এ তল্লাটের সর্দ্দার, তার যেমন শরীর, তেমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং ওরা বংশপরম্পরায় এখানে সর্দ্দার। ওর ঠাকুরদাদা রণথা মাঝি সাঁওতাল-

বিদ্রোহের সময় যুদ্ধ করেছিল। ওর বাবা বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল দেশের লোককে। মাতাল নিজেও দুটো বাঘ মেরেছে। তাছাড়া মাতাল বহুরকম ওষুধ-পত্র জানে আর জানে বাংলা লেখাপড়া ; এইজন্ত ও সকলের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন। ছেলেরা কয়েকজন প্রতিবেশীকে ডেকে আনলো, মাতাল তাদের বুঝিয়ে দিল যে 'শতেকা' ডাকতে হবে। ওদের সভা ডাকার নিমন্ত্রণ আমাদের মত সভ্যতাভিমানী সহুরে ব্যাপার নয়। একখানা নাগড়া পিটিয়ে গ্রামে গ্রামে শুধু জানিয়ে দিয়ে আসবে যে সভা হবে। কিম্বা ওরা শুধু একটা গাছের ডালে গেরো দিযেও নিমন্ত্রণ করে আসে। এক গাঁয়ের নিমন্ত্রণ পরবর্ত্তী গাঁয়ে প্রচারিত হবে তৎক্ষণাৎ এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে দলে দলে ওরা এসে যোগ দেবে শতেকাতে অর্থাৎ সভায়।

মাতালের আদেশ ঠিক কমাণ্ডারের আদেশের মতই। চারজন তখুনি নাগড়া কাঁধে বেরিয়ে পড়লো—মধুও গেল তাদের সঙ্গে!

—রেবুর বিয়ের কি করছিস্‌রে মাতাল ?—সন্ন্যাসী শুধুলেন!

—বিয়ে দিতে হবেক তো।

—মধু ছোঁড়াটার সঙ্গেই দে না! বেশ ভাল জামাই হবে তোর!

—তা দিলেই তো হয় সাধুবাবা, কিন্তুক উ ধরম লুকসান করেছিল যে। উয়োকে বিটি দেওয়া মানা!

—দূর বোকা! পুকুরের জলে ডুব দিলে কি ধরম যায় রে। ও ঠিক তোদের মাঝি আর আমানের দেকো আছে—বিয়েটা লাগিয়ে দে!

—তা দিব—তু যেথন বলছিল, যে, উ দেকো, তেখন দিব না কেনে? দিব, কিন্তুক আবার পালাইয়ে না যায়।

—না ; অমন সুন্দর বৌ ছেড়ে পালাবে কোথায়!—সন্ন্যাসী হাসলেন।

সন্ন্যাসীর বেশ আনন্দ হচ্ছে এই সরল গ্রাম্য কথা শুনতে। বনের ফল আর ঝরণার জল, গরুর দুধ আর ক্ষেতের ফসল ওদের প্রচুর ; জীবনের কোনো দুঃখকে ওরা স্বীকার করে না—ওরা শুধু সুখী নয়, ওরা স্বাধীন, ওরা স্বরাট,

ওরাই সত্য স্বরাজ্য লাভ করেছে। ওরা পরাধীন, একথা ওদের কিছুতেই বোঝানো যাবে না। সন্ন্যাসী ভাবতে লাগলেন—মানুষ কবে কোন্ সুদূর অতীতে এই আরণ্যক জীবনের মহিমময় স্বর্গ থেকে বিচ্যুত হয়ে সভ্যতার মায়া-মৃগের পিছনে ধাওয়া করতে করতে আজ এটোম বোমের বিভীষিকায় এসে পড়েছে। এই এটোম বোম আবিষ্কার না হলে কি তার ক্ষতি হোত? সভ্যতার অবদান শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, সভ্যতার অবদান নিরাপত্তা, শান্তি, সভ্যতার অবদান সৌভ্রাত্র-সখ্যতা, সদ্ধর্মের বিকাশ কিন্তু সভ্যতার অভিশাপ যে আরো ভয়ানক হয়ে উঠেছে আজ। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ধ্বংস, নিরাপত্তা শান্তির নির্ম্মম বিলুপ্তি, সৌভ্রাত্র সখ্যতার সম্পূর্ণ অবসান আর সদ্ধর্ম্মের চরম বিকৃতি! এই বর্ত্তমান সভ্যতা এবং এর জন্যই মানুষ যুগে যুগে আত্মদান করে এলো সভ্যতার যূপকাষ্ঠে! কিন্তু কেন? সন্ন্যাসী নিজের মনেই হাসলেন কেনর উত্তর মনে হতে! পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসের তিন চতুর্থাংশই যুদ্ধের ইতিহাস, ধ্বংসের ইতিহাস এবং নবসৃষ্টির ইতিহাস! এই সভ্যতা মানুষের সমাজকে শুধু সচল রেখেই সন্তুষ্ট হয়নি, শুধু অগ্রগতির পাথেয় যুগিয়েই তৃপ্ত হয় নি—মানুষকে মহিময় করেছে তার ত্যাগে আর তপস্যায়, জ্ঞানে আর বিজ্ঞানে, মৃত্যুতে আর অমৃতত্বে; আবার মানুষকে অমানুষ করেছে, পশু থেকেও নিকৃষ্ট দানবে পরিণত করেছে লোভে আর স্বার্থপরতায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কুটিল ব্যবহারে, রাষ্ট্র আর সমাজের নিষ্ঠুর পীড়নে। এদের সংখ্যাই মানব-সমাজের বড় অংশ অধিকার করে রয়েছে আজও, এবং ভবিষ্যতে এদের সমাজই বড় অংশ অধিবার করে থাকবে। তাহলে শান্তি কোথায়? কোথায় নিরাপত্তা? আর কোথায় বা নির্ব্বাণ? নাই—মানুষ যে পথে এতদূর এগিয়ে এসেছে, সে পথ থেকে ফেরার আশা নেই তার আর—যদি স্বয়ং প্রকৃতিমাতা সবকিছু ধ্বংস করে আবার তাকে আরণ্যক করে না দেন! কিন্তু আরণ্যক জীবনই কি শ্রেয়ঃ জীবন?—সন্ন্যাসী ভাবতে লাগলেন, আরণ্যক জীবন নিশ্চয়ই শ্রেয়ঃ জীবন যদি সে জীবন বর্ব্বর জীবন না হয়, যদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়, যদি শান্তির হোমকুণ্ডে পরিস্নাত

থাকে! প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ছিল আরণ্যক সভ্যতা! অরণ্যই তখন সমাজ আর রাষ্ট্রকে পরিচালিত করতো। অখণ্ড প্রতাপশালী সম্রাট এসে উপদেশ নিতেন অরণ্যবাসী ঋষির কাছে—কিন্তু সেদিন আর ফিরবে না! আজ এই নবসভ্যতার যুগ পরীক্ষার যুগ—মানুষের উপর প্রকৃতির পরীক্ষা—পশুত্বের পরীক্ষা আর দেবত্বেরও পরীক্ষা চলছে। এই পরীক্ষায় জয়ী হতে পারলে মানুষ দেবত্ব লাভ করবে, আর পরাজিত হলে পশু হয়ে যাবে। পশুই হয়ে যাবার সম্ভাবনা—কারণ মানুষের সম্ভাবনার শেষ সীমা বুঝিবা শেষ হোল! এখন মানুষ যাবে কোন্ পথে? এতকাল মানুষ কি চেয়ে এসেছে আর কি সে পেয়েছে? অরণ্যযুগে অন্নবস্ত্রের জন্য মানুষ পশু আর প্রতিবেশীর সঙ্গে লড়াই করলো, তখন সে ছিল মাত্র ডজনখানেক পাথরে অস্ত্রের অধিকারী; তারপর চাষ করতে নেমে, আগুনের ব্যবহার শিখে সে সভ্যতার করলো পত্তন—সেইদিন তার চিরন্তন শত্রু এল মিত্রের ছদ্মবেশে! তখন থেকে একের উন্নতিতে অপরের ঈর্ষা আর স্বার্থপরতন্ত্রতার সুরু হোল, আর সুরু হোল দ্রাবিড়, সুহ্ম, কোল, সমন্তালের অভিযান। হামারুকি, আরাগণ, দারায়ুস, আলেকজাণ্ডারের অভিযান—হানিবল, সিজার, চেঙ্গিস, মামুদ-সার্লেম, নেপোলিয়নের অভিযান, তারপর কাইজার, হিটলার, মুসোলিনী, তোজোর অভিযান—পৃথিবীর মানব-সভ্যতার অগ্রগতির এই তো ইতিহাস—এ ইতিহাসকে আগ্রাহ্য করা কি মানুষের সম্ভব? কেন এই যুদ্ধের ইতিহাস পৃথিবীকে কলঙ্কিত করেছে, ভাবতে গেলেই বোঝা যায়, মানুষ শুধু সুখে শান্তিতে বাস করতেই চায় নি, সে চেয়েছে বড় হতে, প্রধান হয়ে উঠতে। ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য স্বীকৃত হোত আদি যুগে এবং মধ্যযুগে—মানুষ তখন ব্যক্তির মধ্যে সর্দ্দার হয়ে, সামন্ত হয়ে সম্রাটের সঙ্গে পর্য্যন্ত যুদ্ধ করেছে, আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছে! তারপর এল জাতীয়তার যুগ! নবসভ্যতার এই নবীন দান যুদ্ধটাকে আরো ভীষণ করে তুলেছে আজ। এক শাসনাধীনে বা এক ধর্ম্মে আশ্রিত কতকগুলি মানুষের স্বজাতিকে প্রধান

করবার প্রচেষ্টায় আজ জগতের বুকে ধ্বংসের কলঙ্ক-গহ্বর খনিত হচ্ছে। জাতিতে জাতিতে সাময়িক সন্ধিপত্রের মিলন ঘটিয়ে অপর কোনো প্রবল জাতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে—এমনিভাবে যুদ্ধকে আজ করেছে পৃথিবীব্যাপী! তারপর আবার শান্তি এবং নিরাপত্তার প্রস্তাব—যুদ্ধবিরতির জন্য বড় বড় সভা, অর্থনৈতিক সাম্যের জন্য বিরাট বিরাট পরিকল্পনা, সভ্যতার চিহ্নস্বরূপ শান্তির সচীৎকার ঘোষণা চলছে, কিন্তু সামরিক শক্তির বৃদ্ধির দিকে তাদের কিছুমাত্র শৈথিল্য নেই! তাহলে মানুষের মহামানব হবার মোহ হয়তো কেটে গেল—মানুষ শুধু জীবমাত্রই থাকতে চায়—শুধু জৈব-জীবনকেই রাখতে চায়! কে জানে কি চায় মানুষ?—যা সে চায়, তা হয়তো তার নিজেরই জানা নেই। সে শুধু অন্ধকারে ছুটে চলেছে এক অজানার পানে—আশা করছে অমৃতে যাবার—হয়তো গিয়ে পড়বে অবধারিত মৃত্যুতে!

কিন্তু অমৃতের পথও নির্দ্দেশ করে গিয়েছেন ভারত-ঋষি! সে-পথ দেখানো পরাধীন ভারতের পক্ষে আজও সম্ভব নয়—কারণ ইংরাজ ভারত ত্যাগ করে গেলেও ভারত নৈতিক ভাবে পরাধীন রইবে! ভারতের বর্ত্তমান জন-নায়কত্বের ছত্রদণ্ড আজ তোষণনীতিতে লজ্জাকর, আত্মতৃপ্তিতে ঘৃণিত আর আত্মপ্রচারে অমানুষ! কিন্তু কে শোনে সে কথা?

রাত হয়ে গেছে; মাতাল মাঝি ওঁকে হাতমুখ ধুয়ে ফল-জল খেতে বলল।

সামান্য খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করে সন্ন্যাসী আবার ভাবতে লাগলেন—চিন্তার বিরাম নেই! ভাবতে লাগলেন—মানুষ যতই প্রাধান্য চেয়েছে, যতবেশী আত্মশক্তির ঔদ্ধত্যে সে অমানুষ হতে চেয়েছে, ততই তার এক-অংশের অন্তরাত্মা চীৎকার করে কেঁদেছে—তাই যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছেন তার মধ্যে মহামানবরূপী ঈশ্বর। ক্ষুদ্র পল্লীসর্দ্দার থেকে সামন্তরাজা, তার থেকে রাজচক্রবর্ত্তী হয়ে মানুষ হয়তো অশ্বমেধ যজ্ঞের অছিলায় সার্ব্বভৌমত্ব অধিকার করেছে, দিগ্বিজয়ী হয়ে পরদেশের, পরজাতির সংস্কৃতিকে সমূলে ধ্বংশ করে স্ব-দাসে পরিণত করেছে। তীব্র সে জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় সে অপর জাতির স্বাদেশিকতার ন্যায়ানু-

মোদিত অধিকারকে পদদলিত করেছে—কিন্তু ওদেরই মধ্যে মাঝে মাঝে জাগ্রত হয়েছে ন্যায়ের দণ্ড, বিপন্নের আশ্রয়, বিজিতের জন্য শুভ বিধান। কিন্তু সমগ্র মানবজাতির জন্য কল্যাণবুদ্ধি জাগ্রত করে কোনো সমাজ কখনও গড়া হোল না—যদিও মানবসমাজে তার প্রেরণাদাতার অভাব কোনো দিনই হয় নি। এই প্রেরণাদাতারাই জগতকে বারম্বার বলে গেছেন—মানুষের অন্তরতম যিনি, তিনি চাইছেন অমৃতত্বে অভিযান,—ভূমায় সমাপ্তি! যুগে যুগে এঁরা এসেছেন—বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য, রামানন্দ, নানক, কবীরের মধ্যে; এসেছেন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র-অরবিন্দের মধ্যে, কিন্তু তাঁদের বাণীর মূর্চ্ছনা কয়েকদিন পরেই যেন জুড়িয়ে গেছে। মানুষের বর্ত্তমান দেখলে মনে হয়—জগতের সভ্যতা এক শোচনীয় নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সংকটের মধ্যে অতিক্রম করছে পথ! জাতীয়তাবোধের মধ্যে রাষ্ট্রগত স্বর্গরাজ্য স্থাপনের কথা বলে মানুষ আজ অর্থ নৈতিক অভাবের রাজ্য সৃষ্টি করে মানুষকে শাসন করতে চায়, শোষণ করতে চায়,—বিগত যুগের যুদ্ধের থেকেও এই অর্থনীতির যুদ্ধ আরো ভীষণ।

কর্কশ কণ্ঠে একটা পাখী ডেকে উঠলো সেই আকাশ-স্পর্শী শালগাছটায়! চমকে উঠলেন সন্ন্যাসী—কি অমঙ্গলময় স্বর ঐ পাখীটার! কিন্তু নিজের মঙ্গলা-মঙ্গলের কথা তিনি দীর্ঘকাল চিন্তা করেন নি। মানুষের মঙ্গলই ওঁর কাছে মঙ্গল আর স্বদেশের কল্যাণই ওঁর কাছে কল্যাণ। উঠে বসলেন সন্ন্যাসী। ওঁর তপঃশুদ্ধ ললাটের বলিরেখাগুলি অধিকতর কুঞ্চিত হয়ে উঠলো আগামীদিনের কি-যেন বিপদের আশঙ্কায়।

পৃথিবীর ধনশালী রাষ্ট্রশক্তির অর্থনৈতিক নাগপাশ—বাণিজ্যনীতির সর্ব্ব-ব্যাপক শোষণশক্তি আর ছদ্ম সাম্রাজ্যনীতির নবপর্য্যায় যন্ত্রশিল্পের মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের বন্ধন মানুষকে আবার তেমনি পরাধীন রাখবারই আয়োজন করছে। মুক্তি নেই—মানুষের স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য সত্যই নেই। উদগ্র জাতীয়তাবোধের মধ্যে মানুষের দিগ্বিজয়যাত্রা বা পরদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে শোষণ শাসন আজ না থাকলেও সেই একই শাসন-শোষণ অন্যরূপে কায়েম রইল পৃথিবীতে।

আসমুদ্র হিমাচল ভারতভূমি বিভক্ত হোল মূলতঃ দুভাগে, কিন্তু কত ভাগে যে সত্যি বিভক্ত হবে, তা ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। অথচ এই দেশের মূক জনসাধারণ পরিপূর্ণ ভারতমাতার স্বাধীন-রূপ দেখতে কত না ত্যাগ করেছে, কত না যন্ত্রণা সয়েছে...তার বিস্তর প্রমাণ ঐ সন্ন্যাসীর অঙ্গেই লিখিত আছে কশার কলমে, আগুনের অক্ষরে। সতীর্থ প্রায় সকলেই মহাযাত্রা করেছেন—নিতান্ত নিকটে যিনি ছিলেন, তিনিও আজ নেই—গভীর বেদনার্ত হৃদয়ে সন্ন্যাসী একবার আকাশের পানে চাইলেন—অগণ্য নক্ষত্র ঝলমল করছে, হয়তো সেই বীরব্রতচারী মহারথীগণ, সেই ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, যতীন্দ্রনাথের দল ঐখানে বসে দেখছেন, তাঁদের জননী ভারত আজ হিন্দুস্থান, পাকিস্থান রাজস্থান, শিখস্থান, আদিবাসীস্থানে খণ্ড-বিখণ্ডিত—অর্থনীতির অচলায়তনে আবদ্ধ, সমাজ-নীতির সহস্র কদর্যতায় বিচ্ছিন্ন—রাজনীতির বিজাতীয় দৃষ্টিতে কলঙ্কিত! মনে পড়ে গেল, বছর কয়েক আগে এই ভারতেই জনৈক বিশিষ্ট নেতার কথা—"ভারতকে খণ্ডিত চিন্তা করাও পাপ"—গত কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনিই বলেছেন—"ভারতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে অবিসংবাদিত এবং প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে গ্রহণ করা হোক।" যাদের নেতৃত্বের সুমহান আহ্বানে এই বিশাল দেশের কোটি কোটি মূক জনসাধারণ অবহেলে বরণ করেছে নির্যাতন, কারাযন্ত্রণা, দ্বীপান্তর, ফাঁসী—এই দীর্ঘকাল পরে তাদের সান্ত্বনা কোথায়? পদাধিকার নিয়ে আজ কাড়াকাড়ি চলেছে—ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া বিলের ডোমিনিয়ান শক্তিকে আহ্বান জানাবার জন্য উৎসব করা হচ্ছে,—জাতীয় পতাকার জন্য আড়াই হাজার বছর আগের সম্রাট-শ্রেষ্ঠ অশোকের শিলা-লিপি ঘেঁটে ধর্ম্মচক্রের অনুসন্ধান করা হচ্ছে—কিন্তু পদাধিকারের সেই উত্তুঙ্গ নির্ল্লজ্জতা, স্বার্থানুসন্ধানের সেই ক্ষুদ্র বণিকবৃত্তি—যোগ্যকে বঞ্চিত করবার সেই কুটিল কর্ম্মচক্র তেমনি শাণিত, কদর্য্য, বীভৎস! এই দুর্ভাগা দেশের ভাগ্য-রবি আজো তিমির-গর্ভেই।

কিন্তু এসব ভেবে বর্ত্তমান দিনে কোনো লাভ নেই; শত-শতাব্দিব্যাপী

বিপ্লবের মধ্যেও ভারত যখন তার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে আজো জগতে জাগ্রত আছে, তখন তার বাণী একদিন পৃথিবীকে শুনতেই হবে—সেই শুভদিনের প্রত্যাশায় যদি পৃথিবীর মৃত্তিকায় বেঁচে থাকবার শক্তি নাও থাকে তাঁর, তিনি ঐ আকাশের কোলে তারা হয়ে তো জেগে থাকতে পারবেন!—পাখীটা আবার ডাকলো।

কঠোর-কর্কশ স্বর,—কিন্তু নিস্তব্ধ বনানীর সুপ্ত পল্লীবক্ষে সে স্বর যেন আরো তীক্ষ্ণ, যেন যুদ্ধের আহ্বান বাণী, যেন মৃত্যুর মহতী গর্জ্জন। কিন্তু সন্ন্যাসী এবার চমকালেন না, তিনি যেন দিব্যচক্ষে দেখতে লাগলেন—মন্বন্তরের মৃত্যু কাটিয়ে যে মরণোত্তর মানুষ আজ ভারতের বুকে বিচরণ করছে—সে আজ শুধু মূক-মূক জনস্রোত নয়—জাগ্রত জনশক্তি—বজ্রকণ্ঠ জনসঙ্ঘ, বীর্য্যবান জন-সৈনিকের চক্রব্যূহ। আজ আর মেকী নেতৃত্বের মায়াজালে তাকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। 'কৃষক প্রজা শ্রমিক রাজ্য স্থাপনের কল্পনাবিলাস দিয়ে ভোলানো যাবে না; গণতন্ত্র আজ দিকে দিকে বজ্রনির্ঘোষে দাবী জানাচ্ছে—সে স্বাধীন হয়ে জন্মেছে, স্বাধীন হয়েই মরতে চায়! আরণ্যক পাখীর কণ্ঠে সেই কঠোর দাবী, সেই অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষাই যেন ঝঙ্কৃত হচ্ছে। দানবীয় শক্তির দাপট থেকে বিশ্বকে পরিত্রাণ দেবার জন্য আবার বুঝি বিশ্বজননী আবির্ভূত হবেন, বলবেন—মাভৈঃ! বলবেন—অহংরুদ্রায় ধনুরাতনেমি, ব্রহ্ম-দ্বিষে শরবে হন্তাব উ। ভয় নাই, ওরে ভয় নেই, ব্রহ্মদ্বেষী অসুরনিধনের জন্য রুদ্রের ধনুতে আমিই জ্যা রোপণ করি।

সন্ন্যাসী করযোড়ে প্রণাম করলেন—বিশ্বমাতার উদ্দেশে।

কিন্তু তিনি পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত, তারপর নানা চিন্তায় অবসন্ন ছিলেন, কখন যে ওঁর চোখের পাতায় ঘুমের শান্তি-প্রলেপ নেমেছে, ঠিক বুঝতে পারেন নি। চিন্তাগুলো স্বপ্নের আকারে জাগতে লাগলো ওঁর নিদ্রাতুর মানসে; দেখতে লাগলেন—

আকাশের নক্ষত্রনিচয়ের রশ্মিপ্রভাবে পৃথিবীতে আরম্ভ হোল নবযুগ

'বসন্তমালিকা' ; বিশাল ভারত মহাসমুদ্র থেকে এক আকাশচুম্বী মহীরুহ যেন সমগ্র ভারতরূপে জাগ্রত হয়ে উঠলো। তার শাখা, প্রশাখা, পত্র-পল্লব সমগ্র ভারতের সুশ্যামল রূপচ্ছবি!—সন্ন্যাসী মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিলেন; অকস্মাৎ আকাশের গ্রহযোগ পরিবর্ত্তিত হয়ে 'পুষ্পরাগ বর্ষ' আরম্ভ হোল; সেই সুবিশাল বনস্পতির শাখায় শাখায় অসংখ্য মুকুল, অগণ্য পুষ্প বিকশিত হয়ে উঠলো কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। পৃথিবীর বহু স্থান থেকে বহু মানুষ এসে জুটতে লাগলো—কুজন-গুঞ্জনে পরিপূর্ণ হয়ে গেল বৃক্ষতল; কিন্তু অল্প কিছু পরেই আরম্ভ হোল 'ফলোন্মুখ বর্ষ'। আশায় আনন্দে নৃত্য করতে লাগলো যেন মুকুলগুচ্ছ। মুকুলের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ফল—ফলোন্মুখ বর্ষে ফল ফলবে, মুকুলজন্ম তাদের সার্থক হবে—কিন্তু হায়রে অদৃষ্ট! বহু জাতীয় মধুকরের সমবায়ে এবং বহুবিচিত্র পরাগের বর্ণ-সাংকর্য্যে যে ফলগুচ্ছ ফলতে লাগলো তার রূপ হোল বিকৃত। কোথাও বা পরিপুষ্টির অভাবে শুষ্ক, কোথাও বা কীটদষ্ট, গলিত। অঙ্গে অঙ্গে জড়িত থাকার জন্য কোথাও বা দুটো তিনটে ফলে জড়িয়ে এক কিম্ভূতকিমাকার কদর্য্য রূপ সৃষ্টি করতে লাগলো,—এ ফল কোনো দিন পাকবে না; পূজানৈবেদ্যের যোগ্য হবে বলেও মনে হয় না; কিন্তু ওদিকে মহাকাল আবার আকাশের পটে 'বিষযোগের' সৃষ্টি করলেন। বিদ্বেষ আর বৈরীতায় আচ্ছন্ন মৃত্তিকা-মাতা থর থর কাঁপতে লাগলেন অগণ্য রণদামামার বজ্রনির্ঘোষে; তৃতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হোল বুঝি; আর ভারত-মহাসাগরের সেই বিশাল বৃক্ষের কীটদষ্ট, অপুষ্ট, গলিত ফলগুলি একে একে ঝরে পড়তে লাগলো দুর্য্যোগরাত্রির স্তব্ধ অন্ধকারকে উন্মোথিত করে। তারপর এল 'পূজাবর্ষ'। দীপ্ত সূর্য্যের স্বর্ণরশ্মিতে চেয়ে দেখলেন সন্ন্যাসী, ভারত-মহাবৃক্ষের সমস্ত ফল ঝরে গিয়ে মাত্র একটি ফল ধরে আছে সুপক্ক, সুন্দর—পূজার নৈবেদ্য হবার যোগ্য···হাতবাড়িয়ে ধরতে গিয়ে ওঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল—সকাল হয়েছে—আর সত্যই সূর্য্যালোক জেগে উঠেছে সেই সুউচ্চ শালবৃক্ষের চূড়ায় আশীর্ব্বাদের মত। প্রাতঃকৃত্যের জন্য উনি উঠে গেলেন!—হয়তো এই স্বপ্ন সত্য

হবে—হয়তো ভারত-মগাবৃক্ষের এই অগন্ত ফল ঝরে গিয়ে আবার একটি মাত্র ফলই থাকবে—অখণ্ড, ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী মহাভারত!

সন্ন্যাসী স্বপ্নের কথাটাই ভাবছিলেন সকালের দিকে—কিন্তু বেলা দুপুর লাগাদ দলে দলে আদিবাসীরা আসতে লাগলো ওঁর কথা শুনবার জন্য। বেলা দুটোর মধ্যে হাজারের উপর লোক জমা হয়ে গেল খোলা মাঠের মধ্যে, পুরুষ এবং নারী। সন্ন্যাসী ওদের সকলকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে বলতে লাগলেন, ভারতের কোন্ স্মরণাতীত দিন থেকে ওরা এই দেশের অধিবাসী এবং কি ভাবে হিন্দুর বেদে-পুরাণে ওরা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত হয়ে আছে। সহজ সরল ভাষায় উনি বলতে লাগলেন :—

তোদের আদি পিতামাতা আর আমাদের আদি পিতামাতা এক। তোদের শ্রুতিশাস্ত্র বলে, তোরা হড় জাতি! হড় মানে দেহধারী মানুষ অর্থাৎ আদিমানব। তোদের আদি বাসভূমি সমেতশিখর—সমন্তাল ক্ষেত্র। পরেশনাথ পাহাড়কে সমেতক্ষেত্র বলা হয়। মানুষকে তোরা বলিস মানুয়ী, হিন্দুদিকে বলিস দেকো, ব্রাহ্মণকে বলিস বাব্‌ড়েঁ। তোদের "হড় ছাচ্‌তোর" হড় পারসী-ভাষায় লেখা তার নাম "হড়-রড়-ভাকা" এইবার শোন্ তোদের আদিম মানুষের জন্মকথা—ধারতী (ধরিত্রী) মাতার কোলে তোরা কি ভাবে এলি!—সে দায় সানাম্ এখেন দাঃ গি তাঁহেকানা। সেরমা থন্ মারাংবুরু তেড়ে সুতাম্‌তে ঢিলউ আং—ঝাঁড়গো লে নায়। আর দাঃ চেতান্‌রে, সেনেগর-মাচি বেল্ কাতে এচুড়ুপ্ এনায়। উনিআ বারেআ মালাইমূন্, হাঁস হাঁশিল চ্যাড়ে—কিন্ জানাম্ এনা। মারাংবুরুয়া হুকুম্‌তে, ওনা শেনেগর মাচি পয়রানি বাহাজারে এনা। ওনচ পয়রাণি বাহা স্বাকাম্ চেতান্‌রে উন্‌কিন্ বারেয়া—চ্যাড়ে ফিন্ বেলে কেদা। উন্‌রে ধারতা বেনাও লাগিৎ মারাংবুরু আতি আতি রাজকীয়, মেতাৎকো আ। তায়ান রাজা, কাট্‌-কোম্ রাজা, ইচাঃ রাজা, গোংহা রাজা, এমান্দ বাংকো দাড়ে আদা, মেন্‌থান্ হররাজা আর কেঁচুআ রাজা, কিন্ দাড়ে আদা। কেঁচুয়া রাজা

পয়রাণি বাহাডার্ ভিংরিতে বলঅ কাতে হাস, এ বুরজ্ রাকাব্ কেদা। আর হররাজা দেয়া চেতানরে ওনা হাসা কয় আতান কেদা নোং কাতে ধারতী বৈলাও এনা বারেয়া বেলে খন্। পিলচু হাড়াম্ আর পিলচু বুড়হি কিন্ জনাম্ এনা। দুকিন্‌গি স্বনাম্ হাড়রেন আগিল এংগা-আপা। চাবা এনা!

হড়-ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন সন্ন্যাসী। মানুষের ভাষাগত মিলনের একটা আশ্চর্য্য আত্মীয়তা আছে। আর কিছুর জন্য নয়, শুধু এই সমস্তাল হড়ভাষায় তাদের শ্রুতিশাস্ত্র শুনিয়েই সন্ন্যাসী ওঁদের মনের মণিকোঠায় স্থান লাভ করলেন। ওরা সমস্বরে বললে--আরও বল! আরো বল্, তোর মুখে শুনতে খুব ভাল লাগছে! সন্ন্যাসী ওদের শ্রুতির অর্থ বোঝাতে লাগলেন--একদিন স্বর্গ থেকে আমাদের প্রভু ধরম গুরু রেশমী সুতায় বাঁধা সোনার সিংহাসনে বসে নেমে এলেন জলের উপর। তাঁর গায়ের দুটি ময়লা থেকে একটি রাজহাঁস আর একটি রাজহাঁসিন জন্মাল। মারাংবুরুর আদেশে সিংহাসন হোল পদ্মফুলের ঝাড়; সেই পদ্মপাতার উপর দুটি ডিম পাড়লো রাজহংসী। এখন ডিমদুটির আধারের (স্থানের) জন্য (ধারতী) মাটির ব্যবস্থা করতে আতি আতি (অনেক) রাজাকে বলা হোল, তামান কাটকোম, ইচা, গোংহা সবাইকে। তাদের মধ্যে হর (কচ্ছপ) রাজা আর কেঁচুয়া রাজা (সংস্কৃত —কিঞ্চুলুক) ধারতী তৈরী করে দিল। কোঁচো পদ্মের মৃণালের মধ্যে দিয়ে মাটি (হাসা) তুললো আর কাছিম ধরলো তার পিঠের ওপর (দেয়া চেতানরে) এই করে ধারতী তৈরী হলে সেই দুটি ডিম থেকে আমাদের আদি মা—বাবা, পিলচু-হাড়াম আর পিলচু বুড্‌হি জন্মালেন। এঁরাই হড়রেন আগিল—সকল মানুষের আদি মা-বাবা।

তারপর সন্ন্যাসী দেখালেন হিন্দুর শ্রুতির সঙ্গে এই হড়শ্রুতির কতখানি মিল, কূর্ম্ম অবতারের ইতিহাস, বিষ্ণুর মলা থেকে অসুরের উৎপত্তি ইত্যাদি, তারপর বাংলার গম্ভীরা উৎসবের উল্লেখ করে বললেন,—শোন, আমাদেরও

বাংলায় বলে—

কূর্ম্মের পৃষ্ঠে পৃথিবী করিল সৃজন ॥
কহেন ত গুরু গোসাই সরস্বতীর বরে
পৃথিবীর জন্মকথা কহি সভার ভিতরে ॥

তারপর শূন্য পুরাণে আছে—তিলেক পরমাণ নলা নিলা নারায়ণ—ইত্যাদি বহু শাস্ত্রে তোদের সঙ্গে আমাদের মিল রয়েছে। তোরা যে আমাদেরই স্বজাতি, তোরা যে হিন্দু, তোরা যে এই ভারতের একান্ত আপনার জন, একথা ভুলবি কিসের জন্যে? কোন্ লাভের আশায়?

—সবাই যদি বেকো, হিন্দু, তাহলে তোরা কেনে আমাদের ঘিন্নে করিস? কেনে তোরা আমাদেরকে তোদের পুজোতে যেতে দিবি না? কেনে আমাদের ঘরে তোরা খাবি না?

—পূজো তো তোরা দেখবিই—তোদের হাতের রান্না খেতেও আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তোরা শুধু এগিয়ে এলেই হোল।

উন্নতর পরিপোষক বহু কথাই উনি বললেন—তারপর বললেন—ভারতের আগামী দিনের ইতিহাসে তোরাই হবি শ্রেষ্ঠ সৈনিক, তোদের এতকাল অগ্রাহ্য করার জন্য ভারতকে বহু যুগব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। এবার বোধ হয় পাপের ভোগ শেষ হবে। তোরা আয়, এগিয়ে আয়। উনি আলিঙ্গন করলেন ওদের। ওরা জয়ধ্বনি করিলো—বন্দে মাতরম।

অতঃপর তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ যেন বনভূমি প্রকম্পিত করে গর্জন করতে লাগলো—বললেন,—ইংরাজ আজ প্রায় দু'শো বছর ভারতভূমি শাসন করছে—শাসন একে বলা চলে না—সত্যি বলতে গেলে বলতে হয়, সংহারের চেষ্টা করছে ভারতের সমস্ত ঐক্য, ঐতিহ্য এবং ইতিহাসকে; আজ বিশ্ব-শক্তির চাপে পড়ে তাঁরা নিতান্ত নিরুপায় হয়েই ভারত ছেড়ে যাচ্ছেন, কিন্তু মাঝি, আরো অন্ততঃ একশো বছর এদেশকে নানা উপায়ে শোষণ করার ইচ্ছা ওঁদের প্রতি কাজে প্রকাশ হয়ে পড়ে। ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন সুরু হওয়ার পর থেকেই

ওরা মাইনরিটি সংরক্ষণ করতে আর আদিবাসীদের এবং অনুন্নত জাতিদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু মোচন করতে লেগেছেন। মাইনরিটির জন্য ওরা এতকাল যা করলেন, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ওরা মাইনরিটি রক্ষার ভার মন্ত্রীদের হাতে দিতে পর্য্যন্ত নারাজ হয়ে স্বয়ং গভর্ণরের হাতে সে ভার অর্পণ করেন—কিন্তু তার ফলে কোথায় কোন মাইনরিটির কি উন্নতি হয়েছে এই দশ এগার বছরে? ওদের মাইনরিটি মানে যাদের দিয়ে ওদের স্বার্থ সিদ্ধ হবে, তারাই—যারা ওদের কথায় নাচবে, তারাই, ওদের ভেদ-নীতিতে যারা ভুলবে, তারাই ওদের মাইনারিটি। আজ যে 'ওরা আমাদের সঙ্গে তোদের আলাদা করে দিতে চাইছে—শুধু তোরা আদিম জাতি, অনুন্নত জাতি বলে—এর ভেতরের উদ্দেশ্যটা বুঝে দেখ। মা'র চেয়ে যার বেশী দরদ তাকে বলে ডাইনী। আমাদের চেয়ে ওরা তোদের বেশী উপকার যদি করবে, তো এই দুশো বছর করেনি কেন? কেন তোদের দলে দলে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে খৃষ্টান করবার চেষ্টা করেছে? কেনই বা তোদের মধ্যে বিজাতীয় ভাব ঢুকিয়ে, অন্য ধর্মের লোক আমদানী করিয়ে তোদের দলে টানবার চেষ্টা করছে—বুঝতে পারছিস? আমাদের এই পিলচু হাড়াম আর পিলচু বুড্‌হির দেশটাকে কেটে টুকরো টুকরো করবার জন্য।

—হুঁ—হুঁ—এতো কাল উওয়োরা আমাদের কি ভালোটো করেছে? ইতো ঠিকই কথা।

—এতো কাল তো করে নাই, এখনো করবে না; শুধু নিজের সুবিধা করে নিতে চায়।

—আমরা ই হতেই দিবেক না, কুছুতেই লয়।

—শোন—তোরা হিন্দু, তোরা ক্ষত্রিয়, তোরা বীর! এই দেশের সুরথ রাজার সময়ে তোদেরই কোলরা যুদ্ধ করেছিল। তোদেরই রাজবংশ এই দেশের বহু যায়গায় এখনো প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ইংরাজের মতে তোরা অনুন্নত হতে পারিস কিন্তু তোদের সমাজে এবং ভারতীয় সমাজে তোরা সুপ্রাচীন, সুউন্নত

অধিবাসী! তোদের ধর্ম্মও হিন্দুরই ধর্ম্ম; যে দেশাচার আজ প্রবল হয়ে আমাদের সঙ্গে তোদেরকে তফাৎ করে দিয়েছে, তাকে ভেঙে আবার আমরা এক হব; এক জাতি, এক মায়ের সন্তান, এক সমাজে বদ্ধ মানুষ হব।—

—আমরাও তাহলে দেকো? তুই সত্যি বলছিস বাবা ঠাকুর?

—হ্যাঁ, সত্যি বলছি। আমি পূজো করবো, তোরা আমার সঙ্গে আজ পূজো কর।

আনন্দে উল্লাসে সহস্র কণ্ঠ জয়ধ্বনি করে উঠলো—মারাং বুরুর জয়। এর পর সত্যই তিনি সেই সমবেত জন-সঙ্ঘকে নিয়ে পূজা এবং নাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। মহামহোৎসবে অরণ্যভূমি পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো; হয়তো সেই সুপ্রাচীন যুগে এই দেশের মানুষরা এমনি করেই অরণ্যকে উৎসব-ভূমিতে পরিণত করতেন।

অজয়কে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রজিত এসে পৌঁছেছিলো মাদ্রাজের এক সহরে; সেখান থেকে কয়েকটা যায়গা ওরা ঘুরে বেড়ালো এই কদিন; সেখানকার গণমনকে বর্ত্তমানের জন্য প্রস্তুত করাই ওদের উদ্দেশ্য কিন্তু তার জন্য ওদের ধর্ম্ম-চক্র সারা ভারতের সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত আছে এবং প্রত্যেক স্থানেই উপযুক্ত লোকও আছেন। ইন্দ্রজিতের কাজ, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আলোচনা করা এবং সেই আলোচনার কথা উপরিতন ধর্ম্মচক্রে জানানো। কিন্তু ইন্দ্রজিত খবর পেয়েছে যে তাদের মহাগুরু, যাঁর পরিকল্পনায় সারা ভারত জুড়ে এই ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হয়েছে, তিনি অকস্মাৎ স্থান ত্যাগ করে কোথায় গিয়েছেন। তাঁর একমাত্র চরণ-সেবিকা রাণী সেখানে একা আছে।

কিন্তু তাঁর জন্য চিন্তার কোনো প্রয়োজন নেই; তিনি ঠিক যায়গাতেই যাবেন। অতীত ভারতের অন্ধকারোজ্জ্বল দিন থেকে বর্ত্তমান ভারতের বিপ্লব-বিপর্য্যস্ত দিন পর্য্যন্ত পথ তাঁর একান্ত আয়ত্তে। ইন্দ্রজিৎ বরং নিজের বর্ত্তমান

কর্ত্তব্যের কথাই চিন্তা করবে এবং সেইটাই তার একমাত্র করণীয়। বর্ত্তমান দিনের ভাঙনের মৃত্তিকায় নবসৃষ্টির মঙ্গল কলস প্রস্তুত করবার ভার তাদের উপর। গুরুর আদেশ এবং উপদেশ সম্বল করে ইন্দ্রজিৎ দিন কয়েক বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে বেড়ালো দক্ষিণ ভারতের কয়েকটা প্রসিদ্ধ স্থানে। তাল-নারিকেল-কুঞ্জ-ছায়াচ্ছন্ন অপরূপ সুন্দর দেশ; এক দিন এই দেশ ললিত কলায়, স্থাপত্য বিদ্যায় আর তক্ষণ-শিল্পে জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেছিল; কতখানি সমৃদ্ধিশালী হলে তবে কোনো দেশ তার ললিতকলা বা স্থাপত্য বিদ্যাকে এত খানি উন্নত করতে পারে তা অনুমান করাও কঠিন। অগণ্য দেব-দেউলের আকাশচুম্বী গোপুরম, অসংখ্য শিল্প-সুষমাময়ী প্রস্তর-প্রতিমার জীবন-চঞ্চল রূপরেখা মানুষকে শুধু অভিভূত করেনা—অতীতের ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে অবগাহিত করে—অনুতাপিত করে। ইন্দ্রজিত দুচোখ ভরে কদিন ধরে দেখছে।

বর্ত্তমানে এদেশে একটা প্রচণ্ড আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে—হরিজনদের জন্য মন্দির দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া। একদিন সম্রাট শ্রীরামচন্দ্র শূদ্ররাজ শূদ্রকের প্রাণ দণ্ড দিয়েছিলেন সমাজের কল্যাণের জন্য। শূদ্রজাতি যদি যজ্ঞে রত হয়, তবে তাদের স্বীয় বৃত্তি কৃষিকর্ম্মের উচ্ছেদ হবে,—দেশ কৃষিহীন হয়ে নিরন্ন দরিদ্র হয়ে যাবে। এই ছিল তখনকার সমাজ-শাসন; আপনাপন বৃত্তির অনুশীলনেই সেদিন ধর্ম্ম ছিল, অর্থ ছিল, কামনা এবং মোক্ষের পথও তাতেই উন্মুক্ত ছিল। কালক্রমে সেই সমাজ-শাসন বহু শতাব্দি কালের দেশাচারে আজ অর্থহীন মানব-পীড়নে পরিণত হয়েছে। মানুষের উপর মানুষের ঘৃণা জন্মিয়ে এক অংশকে করে তুলেছে অস্পৃশ্য—অপাংক্তেয়। এই মহাপাপ ভারতের বর্ত্তমান ইতিহাস থেকে যত শীঘ্র মুছে যায়, ততই মঙ্গল। কিন্তু শুধু মন্দিরদ্বার মুক্ত করে হরিজনদের পূজাধিকার দিলেই তো সব হোল না—তাদের জন্য যে চাই শিক্ষাস্বাস্থ্য-সম্পদ—চাই বর্ত্তমান ভারতের প্রজারূপে গড়ে তুলবার জন্য চেষ্টা। ইংরাজ রাজত্বে স্ব স্ব বৃত্তিকে নষ্ট করা হয়েছে; কেন হয়েছে সেই কথাই ভাবছিল ইন্দ্রজিৎ তুঙ্গভদ্রা নদীর কিনারায় বসে। অতীতের

ইতিহাসের উজ্জ্বল দিনের কথা ভাবতে ভাবতে ওর বর্ত্তমানের বিচ্ছিন্ন বিপন্ন বিধ্বস্ত পল্লী-সমাজের কথাই মনে হতে লাগলো। রামচন্দ্র একজন শূদ্রককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন স্ববৃত্তি ত্যাগ করার জন্য, আর আজ কোটি কোটি ভারতবাসীকে স্ববৃত্তি ত্যাগ করিয়েছে বৃটিশরাজ—কেন? তাই ভাবছিল ইন্দ্রজিৎ একা একা। অজয় গেছে কাছের গ্রামে কিছু খাবার কিনে আনতে; সন্ধ্যা হয়ে এল, অজয় এখনো ফিরল না—ইন্দ্রজিৎ নিবিড় চিন্তায় মগ্ন।

নদীর উপরে তাল নারিকেল কুঞ্জ, কিছু দূরে গ্রাম। গ্রামের সন্ধ্যালোক জ্বলে উঠলো। সারা ভারতের শত-সহস্র লক্ষ গ্রামে সন্ধ্যালোক জ্বলে উঠলো—কিন্তু কোথায় সেই সান্ধ্যোৎসব? কোথা সেই গ্রাম্য আনন্দ-কোলাহল! ভারতের তপোবন-সভ্যতা অরণ্য থেকে গ্রামে এসে বাসা বেঁধেছিল, উপনিষদের ভূমি থেকে শিল্পের ভূমিতে অবাধ ছিল তার গতি; বন্ধ্য ভূমিকে কর্ষণ-সীতায় তুলে সে কন্যকার স্থান দিয়েছিল এই পল্লীতেই; সেদিনের ভারত-সভ্যতা পল্লী সভ্যতা,—কৃষি এবং কুটীর শিল্পের ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠি-সভ্যতা। সেদিন প্রত্যেকটি পল্লী ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধিকারী, কি বাংলায়, কি মাদ্রাজে, কি অন্য প্রদেশে। এই পল্লীর গঠন ছিল এক একটি ক্ষুদ্র পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রের মত। তার কৃষি-ভূমি এবং গোচরভূমি উর্ব্বর থাকতো—তার অরণ্য-সম্পদ আর নদী-প্রবাহ জীবন্ত থাকতো—তার পথ আর পরীখা সুরক্ষিত থাকতো সমবেত প্রচেষ্টায়। প্রত্যেকটি গ্রাম সেদিন ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ, তার প্রমাণ আজকার আচার-বিচার-অনাচারের বিকৃতিতেও পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিকৃতি এই সামান্য দুশো বছরের ইংরাজ রাজত্বের ফল। শক-হুন-তাতার-মোগল বা অন্য কোন বৈদেশিক ভারতের পল্লী সভ্যতাকে কিছুমাত্র ক্ষুন্ন করতে পারে নি—ইংরাজ করেছে তার ভেদনীতির অস্ত্র চালিয়ে। অন্য যারা এসেছিল, তারা রাজত্ব করে গেছে এই দেশে; ইংরাজ এসেছে বাণিজ্য করতে, এদেশের সম্পদ লুঠতে। ভেদ সৃষ্টি না করলে তার লুণ্ঠনের সুবিধা হয় কৈ? তাই সেদিনও যে ভেদনীতি ইংরাজ চালিয়েছিল, আজও, ভারত ত্যাগ করবার নিশ্চিত তারিখ ঘোষণা করার

পরেও সেই ভেদ-নীতিই চালিয়ে চলেছে। কিন্তু ইন্দ্রজিত গ্রামিন্ সভ্যতার কথাই ভরেতে লাগলো—মানুষের প্রয়োজনে লাগতে পারে এমন বৃত্তি-বিশিষ্ট প্রত্যেকটি দলকেই প্রতিগ্রামে বাস করানো হোত—ছুতোর, কামার—মালী মালাকার, তাঁতী জোলা, শাঁখারী-স্বর্ণকার কোনো বৃত্তিধারীই বাদ যেতেন না। যদি কোনো গ্রামে কোনো বৃত্তিধারীর অভাব হোত তবে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম থেকে সেই বৃত্তি-বিশিষ্ট পরিবারের দুচার জনকে মহা সমাদরে এনে বাস করানো হোত, কৃষি ভূমি দেওয়া হোত, বৃত্তি দেওয়া হোত—সমাজে বিশেষ সম্মানের আসন দেওয়া হোত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বৃত্তি অনুযায়ী বিভক্ত ছিলেন, কিন্তু প্রত্যেক বৃত্তিধারীর সঙ্গে প্রত্যেক বৃত্তিধারীর আত্মিক যোগ ছিল সমাজের প্রত্যেকটি বড় ছোট কাজে; আজও তার ভগ্নাংশ বিয়ে, পৈতে, অন্ন-প্রাশনের ব্যবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। কেউ অবহেলিত ছিল না, কেউ অসম্মানিত হোত না। সেদিন সকলেই ছিল সকলের জন্য এবং প্রত্যেকে ছিল পরের জন্য। দেব-দেউলের আশ্রয়ে সমবেত পুণ্যাহ কর্ম্মে সকলের দেওয়া চাঁদায় অনুষ্ঠিত আনন্দোৎসবে সকলে সমান অংশীদার হতে পারতো। শূদ্র ব্রাহ্মণকে পূজ্য ভেবেই প্রণাম করে তৃপ্ত হোত, আর ব্রাহ্মণ তার মঙ্গল আকাঙ্খা করেন বলেই আশীর্ব্বাদ করে ধন্য হতেন। সেদিনের পরার্থপরতা অনুশীলিত হোত মানুষের প্রত্যেকটি কাজে, প্রতি কথায়, প্রতি পদক্ষেপে; তাই সেদিন সমাজ ছিল সংঙ্ঘবদ্ধ, জাতি ছিল শান্তিতে অনুদ্বেল, গোষ্ঠি ছিল ঐক্যবদ্ধ এবং ব্যষ্টি ছিল গোষ্ঠির পরিপুষ্টির অংশ। এখন উদরের সঙ্গে অন্যান্য অবয়বের মত এই যে বিচ্ছিন্নতা—গ্রামকে শ্মশান করে নাগরিক সভ্যতার পত্তন, মানুষের মনে ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার প্রলোভন জাগিয়ে তাকে স্বার্থ-পঙ্কিল করে স্ব-উদ্দেশ্য সাধন—এ করলো কে এবং কেন করলো ?

ইংরাজ—ইন্দ্রজিত অনুচ্চস্বরে উচ্চারণ করলো! কেন করলো? না করলে তাদের লুণ্ঠনের অসুবিধা হয়। তাই ইউরোপের অপরীক্ষিত সমাজধারাকে সে চালিয়ে দিল ভারতের সুগঠিত যুগযুগান্তের পরীক্ষিত সমাজের মধ্যে।

কেমন করে, তাই ভাবতে লাগলো ইন্দ্রজিত। মাত্র দুশো বছরের মধ্য কেমন করে এটা হোল ? হোল—মন্ত্রশক্তিতে নয়, মানুষেরই মানব-নীতির ব্যভিচারে, লোভে, পাপে, স্বার্থপরতায়। বাণিজ্য করতে এল বৈদেশিক, উদার ভারত বাধা তো দিলই না, বরং সুযোগ সুবিধাই করে দিতে লাগলো, আথিথেয়তার ঔদার্য্য দেখালো। বিদেশী বণিক দেখলো, এই সুযোগ। তারপর একদিন পলাশীর প্রান্তরে ভারত-স্বাধীনতার সূর্য্য অস্ত গেলেন দেশদ্রোহিতার কদর্য্য পাপের অন্তরালে। ইংরাজ হল সম্রাট। তার সাম্রাজ্যবাদ-নীতি জুড়ে বসলো সারা ভারতে; বৃটিশ ভারতে, তথা দেশীয় রাজন্য শাসিত ভারতে। কিন্তু ইংরাজই ডান হাত আর বাঁ হাত দিয়ে এই উভয় ভারতকেই শাসন করেছে এবং শোষণের সকল রকম সুযোগ করে নিয়েছে। ধীরে ধীরে বিশালকায় অজগর যেমন ততোধিক বিশালকায় বন্য বরাহকে গ্রাস করে, ঠিক তেমনি। সে প্রথমেই দেখলো, এদেশের গ্রামে গ্রামে সাম্য, স্বরাষ্ট্র—সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। একে না ভাঙ্গলে সামাজ্যবাদী শক্তি একান্ত অকেজো হয়ে যায়। তাই প্রথমেই ভাগ করে দিল গোটা গোটা দেশগুলোকে প্রদেশে, জেলায়, থানায়; লাগিয়ে দিল প্রদেশের সঙ্গে প্রদেশের প্রতিযোগিতা। ভাষার ভিত্তিতে গঠিত দেশকে করলো শাসনের সুবিধানুযায়ী বিভক্ত! তারপর হাতে নিল দেশের শিক্ষার ভার—যে শিক্ষার ভেতর দিয়ে সে এই সুদীর্ঘকাল শুধু কেরানী তৈরী করে এসেছে আর মানুষের রুচিকে দিয়েছে বৈদেশিক করে—বিকৃত করে! কাজ চালাবার জন্য কেরানী তার দরকার—নইলে বিরাট রাষ্ট্র-যন্ত্র অচল হয়; অথচ চাকরী করাটাই সেদিন এদেশের লোক আপমানজনক মনে করতেন। কিন্তু ইংরাজ সুনিয়ন্ত্রিত পন্থায় ধীরে ধীরে আরম্ভ করলো শিক্ষার মধ্যে দিয়ে মানুষের মনকে বিলাসী আর স্বার্থপর করে তুলতে। নগদ টাকাকে (Liquid money) এমন মাগ্‌গী করে রাখলো যে সেদিন এক টাকায় আটমন চাউল পাওয়া সাধারণ কথা ছিল; টাকায় আধমন দুধ ছিল সাধারণ বাজার দর। টাকার বাজার আক্রা রেখে, অথচ টাকাকে অবজ্ঞ-

প্রয়োজনীয় করে ইংরাজ বণিক দুরকম ফায়দা করলো, প্রথমঃ, টাকার জন্য মানুষকে কেরানী হয়ে ঘরের বাইরে আনা, আর, দ্বিতীয়তঃ টাকা দিয়ে সস্তা কাঁচামাল কিনে স্বদেশে চালান করা। আবার সেই কাঁচা মালেরই পাকা বস্তু (Finished products) এদেশে এনে চতুর্গুণ মূল্য আদায় করা! কিন্তু এই ব্যবসায় চালাবার জন্য এদেশে অভাব সৃষ্টি করতেই হবে, অথচ অভাব তখন একেবারেই ছিলনা; কারণ সেদিন ভারত ছিল কৃষি এবং শিল্পের কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তি। বণিকরাজ ইংরাজি শিক্ষা দিয়ে যুবকদের কেরানী করে নিয়ে যেতে লাগলো কুঠিতে, সহরে, স্বগ্রাম থেকে বহু দূরে; তারপর সামান্য কয়েকটা টাকা দিয়ে আর তাদের দেশের আপাতঃ-মধুর বিলাসপ্রিয়তা শিক্ষা দিয়ে অধিকার করে ফেললো তাদের মন;—ওদিকে গ্রামের কামার দেখলো, সারা-দিন হাতা বেড়ী খন্তা গড়ে তার যা আয় হয়, কোম্পানীর ঘরে গিয়ে একঘণ্টা রেঞ্চ ঘোরালেই তার দশগুণ হয়, এবং সেটা নগদ টাকায় পাওয়া যায়, গ্রামে যার মূল্য বহুগুণ বেশী! কুমোর দেখলো, হাঁড়ি কলসী গড়ার চেয়ে কোম্পানীর ঘরে যে-কোনো কাজে লেগে যাওয়া অনেক বেশী লাভজনক; অতএব কামার, কুমার, মালী, মালাকাররা—(তার আগেই ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা) কেরানী হবার জন্য ইংরাজী ইস্কুলের দরজায় মাথা খুঁড়তে লাগলো। অথচ একদিন এই কামারগণই কামান তৈরী করেছে যে কামান তখনকার যুগের অগ্নিবান রূপ মহাস্ত্র; তরবারি তৈরী করেছে, যে তরবারীর শক্তি দিগবিজয়ী আলেকজাণ্ডারকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। এই কুমোরেরাই মৃৎপাত্র তৈরী করেছে যার শিল্পচাতুর্য্য পৃথিবীর শিল্প-সংগ্রহালয়ে আজো অতুলনীয়। এই দেশেরই মালি, মালাকারের গল্প রূপকথার রাজপুত্রকে আশ্রয় দিত, কুচবরণ কন্যার মেঘবরণ চুলের কবরী রচনা করতো। ইংরাজ উৎসন্ন করে দিল সেই বংশগত পটুত্বের গর্ব্ব, সেই যুগসঞ্চিত সাধনার সাফল্য। কিন্তু এতেও আশানুরূপ ফল ফললো না। কার্পাস-শিল্প, যে শিল্প ছিল পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দী, ইংরাজ তাকে কি কূটনীতিতে নির্ম্মম ভাবে ধ্বংশ করলো

নিজের ব্যবসায় চালাবার জন্ম, তার ইতিহাসের নির্লজ্জতা জগতে বিস্ময় জাগাবে, যদি কোনোদিন সেই অন্ধকারে আলোক জ্বালা হয়; কিন্তু যাক সেই ইতিহাসের অনাবিষ্কৃত অধ্যায়ের কথা—ইংরাজ অভাব সৃষ্টি করলো অর্থের, তারপর অর্থের টানে পল্লীবাসীকে এনে করলো সহরবাসী বাবু। তার ফলে একান্নবর্ত্তী পরিবারের পরার্থপরতা,—নিজের অর্থে বিধবা ভগ্নির সন্তান পালন, দরিদ্র প্রতিবেশীর পুত্রকে শিক্ষাদানের জন্য অন্নমুষ্টির অর্দ্ধাংশ দান রূপ মহাধর্ম্ম নিঃশেষে লুপ্ত হোল, তার জায়গায় জেগে উঠলো সংকীর্ণ স্বার্থপরতা,—সামাজিক দলাদলি, পরিবারের মধ্যে স্বার্থ রক্ষার ব্যক্তিগত চক্রান্ত—আর ভোগ-প্রবণতার কদর্য্য লিপ্সা! বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সমাজ—শতখণ্ড হয়ে গেল যৌথ পরিবার। তারপর ইংরাজ আদালৎ বসালো জেলায় জেলায়, ফৌজদারী, দেওয়ানী। একহাত জমির জন্য ভাইএ ভাইএ মাথা ফাটা-ফাটি করে পরের দরজায় ধরনা দেবার আইন চালিয়ে দিল আমাদেরই ঘরের ভাই উকিল, মোক্তার জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট সৃষ্টি করে। পঞ্চায়েৎ প্রথাকে তার পূর্ব্বেই ধ্বংস করে ইংরাজ নিঃশেষ করে দিয়েছে পল্লী-জীবনের প্রাণ-শক্তি। মামলার জন্য রাশি-রাশি টাকা চাই; মানুষ হন্তে হয়ে ছুটে চললো টাকার পেছনে—নগদ টাকা—সোনার টাকা ছেড়ে রূপার টাকা পার হয়ে যে-টাকা আজ শুধু কাগজে এসে পৌছেচে; তারই পেছনে। বিদেশী বণিক এবার উল্টো খেলা খেললো। এতদিন জিনিষ ছিল সস্তা, টাকা ছিল মাগ্‌গি, এবার সে টাকাপয়সা সস্তা করে দিয়ে স্বদেশীপণ্যের মূল্যমান দিল চড়িয়ে—সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য এনে ফেলতে লাগলো বিদেশ থেকে—কাপড় সেলাই করা স্চ স্তো থেকে হাতে বাঁধা ঘড়ি এবং পকেটে গোজা পেন পর্য্যন্ত। শিল্পহীন দেশ প্রতিযোগিতায় ক্রমাগত পিছিয়ে শেষে সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী হয়ে গেল; হস্তশিল্পের অশিক্ষিত পটুত্বের অপরূপ মহিমা বৈদেশিকের দপ্তরে হাতের লেখার অক্ষর-শিল্প আর ইংরাজি উচ্চারণের বাগ্মিতা দেখাতে লাগলো। ওদিকে মামলা-মোকদ্দমায় বিধ্বস্ত গ্রামে ঢুকলো

ম্যালেরিয়া—যাকে ওরা বলে 'হাঙ্গার ডিজিজ'—অর্থাৎ না-খেতে পেলেই যে রোগ বাসা বাঁধে শরীরে। গ্রামের মণ্ডলপ্রথা বহুদিন উঠেছিল—জমিদারী-প্রথার মধ্যে যে নিশ্চিন্ত আলস্য আর অমিতব্যয়িতা, তাকে আশ্রয় করে চলছিল অত্যাচার—তবু তখনো জমিদাররা গ্রামে থাকতেন—রূপসী সহরের হাতছানিতে আর ম্যালেরিয়া-জুজুর ভয়ে তাঁরা চলে এলেন সহরে। যেটুকু ভাল কাজ, যেমন, কূপ খনন করা, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, রাস্তা তৈরী, দেবমন্দিরে অতিথি-সজ্জনের জন্য আশ্রয় এবং খাদ্যের ব্যবস্থা তাঁরা করতেন, তাও ক্রমে লোপ পেয়ে গেল। ব্রাহ্মণের বৃত্তি—অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, বিবাহ, উপনয়ন-অন্নপ্রাশনের মধ্যে সমাজকে একত্র সঙ্ঘবদ্ধ রাখবার চেষ্টা বহুদিন লোপ পেয়েছিল—তার জায়গায় উচ্চ জাতিত্বের অহঙ্কারটুকু সম্বল করে তাঁরা কেরানী হতে বেরিয়েছিলেন। কায়স্থগণও অনুরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন; আবার গর্ব্ব করে বলতেন, তাঁরা চিত্রগুপ্তের বংশধর—জাত-কেরানী! বৈদ্যবৃত্তি অনেক কষ্টে টিকিয়ে রেখেছিলেন গ্রামের কবিরাজগণ, কিন্তু ইংরাজের সেটাও সহ্য হোল না। বিলাত থেকে তাজা এ্যালকোহল মেশানো ওষুদ আসতে লাগলো বোতলে লেবেল এঁটে, যার ফল একান্তই অস্থায়ী এবং যে ওষুদ এই গরম দেশের শরীরের পক্ষে একান্তই হানিকর। সেই ওষুদ গলাধঃকরণ করাবার জন্য একদল ডাক্তার তৈরী হয়ে গেল এবং মোটা হারে তাদের দক্ষিণারও ব্যবস্থা হোল। ব্যস! বৈদ্যবৃত্তি নিঃশেষ হয়ে গেল কয়েক বছরের মধ্যেই। কিন্তু ডাক্তারও যথেষ্ট তৈরী হোল না, কারণ রোগে ভুগবে আর ওষুদ কিনে খাবে—এইটাই তো দরকার—তাই ডাক্তারী বিদ্যাটা এমন সুকৌশলে দেওয়া হতে লাগলো যাতে তিনখানা গ্রাম খুঁজলে একটা ডাক্তার মিলবে কিন্তু সেই এক ডাক্তারের হাতেই থাকবে হাজারখানেক রুগী। অভাবের তাড়নায়, আহারের স্বল্পতায় আর আরোগ্য লাভের হতাশায় মানুষগুলো হন্যে হয়ে আজ শুধু বাঁচবার জন্যই মরণের পানে এগুচ্ছে—কে জানে, কোন পথে ওদের বাঁচানো যাবে?...

—পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?

চম্‌কে উঠলো ইন্দ্রজিত, বঙ্কিমের ভাষায় আকস্মিক প্রশ্ন শুনে। নদীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দেখলো, একজন তপস্বী ; দীর্ঘ জটাজুট, পরনে গৌরিক, চরণে কাষ্ঠ-পাদুকা !

—না প্রভু, পথ হারাইনি,—পথ তৈরী করবার কথাই ভাবছিলাম—বলে ইন্দ্রজিত উঠে আবার নত হয়ে ওঁর পদধূলি নিল। শুক্লা পঞ্চমী-চাঁদের আলোতে নির্জ্জন নদীতীরের আরণ্যক আবেষ্টনীতে ইন্দ্রজিত দেখলো ওঁর মুখের স্নিগ্ধ হাস্যরেখা। তিনি বললেন সস্নেহে, —

—হারিয়ে পথ খোঁজার বিড়ম্বনার চাইতে নূতন পথ তৈরী করে নেওয়াই তোমার মতে ভাল—কেমন ?

—সব নির্দ্দিষ্ট পথগুলোকেই এক যায়গায় জড় করে উর্ণনাভের চক্রের মত গুটিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রভু, তার নাম শাসন-চক্র। সেখানে পথ নাই, শুধু গোলক ধাঁধা ! আজ সেই গোটা গোলকধাঁধাকে কয়েকটা টুকরোতে ভাগ করে আরো জটিল করে দেওয়া হোল—জট্ পাকিয়ে দেওয়া হোল ; এতকাল যেটা পথ ছিল, যে পথে চলেছি, ভুল হোক আর ঠিক হোক, সে একটা পথ ছিল—হয়তো কোনদিন সে-পথের শেষে একটা ঠিকানা মিলতো, কিন্তু আজ সেটা আর পথ নেই—প্রচ্ছন্ন পঙ্ককুণ্ড। উপরে শুকনো মাটি, পা দিলেই রসাতলে নিয়ে যাবে।

ইন্দ্রজিতের কণ্ঠে অগাধ বেদনার সুর বেজে উঠলো। সন্ন্যাসী আধমিনিট নীরব থেকে বললেন,

—বুঝেছি, তুমি ভারতের মুক্তি-পথযাত্রী সৈনিক ! আমি ভেবেছিলাম, আধ্যাত্মিক পথের সন্ধানী।

—আধ্যাত্মিকতা ব্যক্তিগত জীবনের উপান্ত প্রভু, আমি রাষ্ট্রগত মুক্তির পথিক ; আমার পথ ভিন্ন।

—না—সন্ন্যাসী অনাবিল হাস্যধ্বনি করে উঠলেন। তাঁর উচ্চহাস্যধ্বনি

প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো দূর তালী-নারীকেল-বনভূমিতে। ইন্দ্রজিত অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে রইল এই সন্ন্যাসীর পানে।

—ব্যক্তি কোনদিন রাষ্ট্র নয় বৎস, কিন্তু রাষ্ট্র নিশ্চয়ই সমবেত ব্যক্তি। যেমন একগাছা সূতাকে বস্ত্র বলা চলে না, কিন্তু বস্ত্র নিশ্চয়ই সূতার সমষ্টি! সূতার শক্তিতে বস্ত্রের শক্তি বাড়ে—তেমনি ব্যক্তির মুক্তিতেই রাষ্ট্রের মুক্তি হয়; অবশ্য আমি আধ্যাত্মিক মুক্তির সঙ্গে আধি-ভৌতিক, ইহলৌকিক মুক্তির কথাও বলছি! এ সত্য পরীক্ষিত সত্য—এবং এই সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল ভারতের রাষ্ট্রশক্তি; তাই মন্দির ছিল সেদিন রাষ্ট্রের রাজ-দরবার আর দেবতা ছিলেন রাষ্ট্রের নিয়ামক; তাঁর ন্যায়দণ্ড ছিল অমোঘ, তাঁর নীতি ছিল সাম্য-মৈত্রীতে প্রতিষ্ঠিত, তাঁর সত্য ছিল অবিচল, তাঁর আনন্দ ছিল অনাবিল আর অম্লান।

—সেই ঠুঁটো জগন্নাথ আমাদের বাঁচাতে পারলেন না কেন?—ইন্দ্রজিতের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর বেরুলো।

—বাঁচাতে দিলে না তোমরাই—সন্ন্যাসী স্নিগ্ধ গম্ভীর স্বরে বললেন—তোমরা আধ্যাত্মিকতাকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ঘোষণা করলে, পশ্চিমের বহিরঙ্গ সভ্যতায় আকৃষ্ট হয়ে মন্দিরের রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করলে, নিজেরা হলে রাষ্ট্রপতি, সমাজপতি, গণপতি, তারপর হলে, শিল্পপতি শিক্ষাপতি—ধর্ম্মপতি; শিক্ষাকে করলে বহির্মুখীন্, শিল্পকে করলে যান্ত্রিক, ধনকে করলে ব্যক্তির ভাণ্ডারজাত; গণমন হয়ে গেল ধনের কাঙাল, সমাজ হোল ধনিকের মনগড়া আভিজাত্যে আর ঔদ্ধত্যে আবিল; তার ফলে রাষ্ট্র হোল সাধারণ মানুষের নিপীড়নের যন্ত্র···দেবতা পদচ্যুত রয়েছেন, তিনি কি করবেন বৎস! ঠুঁটো হয়ে তিনি দেখছেন—দেখছেন আর কাঁদছেন।

—তাঁকে আবার রাষ্ট্রপতি করতে হবে, এই কথাই আপনি বলতে চান?

—নিশ্চয়! এই-ই একমাত্র বলবার কথা। ভারতের আধ্যাত্মিকতার

সঙ্গে ইহ-লৌকিকতার পরীক্ষিত সমন্বয় সারা বিশ্বের মানবের কল্যাণের পথ দেখাবে—কিন্তু ভারত আজ নিজেই সে কথা ভুলে ভূয়ো রাজনীতির পাশ্চাত্য পরীক্ষায় মেতেছে—বুঝতে অনেক দেরী। ভারতের মর্ম্মকথা আছে ভারতের মন্দিরে এবং একদিন ঋষি বাক্য সফল হবেই—"**India speaks through her temples.**"

মেঘমন্দ্রবৎ কণ্ঠস্বর সন্ন্যাসীর; ইন্দ্রজিত স্তব্ধ হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। কে ডাকছে—ইন্দ্রদা!

—আয়!—ইন্দ্রজিৎ সাড়া দিল। দূর থেকে দেখা যাচ্চে অজয়ের অবয়ব জ্যোৎস্নালোকে। সন্ন্যাসী বললেন—এখানে তোমাদের রাত্রিবাসের আশ্রয় যদি ঠিক না থাকে, আমার আশ্রমে এস।

—আপনার আশ্রমেই যাব প্রভু! আরো কিছু জিজ্ঞাস্য আছে আমার। আপনি কি বঙ্গদেশবাসী?

—সন্ন্যাসীর দেশ কোথাও নির্দ্দিষ্ট থাকে না; মহারাষ্ট্র আমার জন্মভূমি; কিন্তু আমার পিতা-মাতা বাংলাতেই থাকতেন, ব্যবসায় উপলক্ষ্যে; তাই মাতৃ-ভাষার মতই আমি বাংলা ভাষায় দক্ষতা লাভ করেছিলাম। স্বদেশীযুগে সরকারের অতিথি হয়ে বহু দুঃখ-দুর্ভোগ কাটিয়ে বাইরে এসে দেখলাম, মা স্বর্গে গেছেন, বাবা দ্বিতীয় বিবাহ করেছেন এবং আমার সহপাঠি বা সহকর্ম্মীরা সকলেই যে যার ঘরে ফিরেছে। দুচারজন অবশ্য তখনো জেলে, কেউবা নিরুদ্দেশ। আমিও বেরিয়ে পড়লাম; সারা ভারত ঘুরলাম। ভগবানের কৃপায় উপযুক্ত গুরুর কাছে দীক্ষাও পেয়েছি!

—কিন্তু এই সন্ন্যাসী-শ্রেণী ভারতের কোন প্রয়োজন সাধন করবেন প্রভু? অজয় এসেই ওঁকে প্রণাম করে প্রশ্ন করলো। সস্নেহে আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করে উনি উত্তর দিলেন,

—হিন্দুধর্ম্মটাই সন্ন্যাস-ধর্ম্ম বৎস—ত্যাগের ধর্ম্ম। বাইরের ত্যাগ থেকে ঘরের সবকিছু ত্যাগ—বাহ্য থেকে অন্তরের ত্যাগধর্ম্ম শিক্ষাই হিন্দুধর্ম্মের মূল

কথা। গীতার এই ধর্ম্ম এবং গীতার ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, গীতার অর্থ ত্যাগী।

রামকৃষ্ণ কাথামৃত পড়া থাকায় ইন্দ্রজিতের জানা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। বললো—

—কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য বিবেকানন্দ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন কিছুদিন ভোগ করতে।

—হাঁ—কিছুদিন!—সন্ন্যাসী পথ চলতে চলতে হাসলেন আবার—ঐ কিছু-দিনের অন্তর্নিহিত অর্থটা প্রাণিধানযোগ্য! সারাভারত ঘুরে উনি দেখেছিলেন, সহস্র বৎসরের পরাধীনতার চাপে পিষ্ট হয়ে ভারতের শরীরধর্ম্ম যোগবিভূতি সহ্য করতে অপারগ হয়ে গেছে, ক্ষাত্রধর্ম্ম থেকে বিচ্যুত হযেছে, নীতিধর্ম্ম থেকে স্খলিত হয়েছে। শরীর-মনের পুষ্টি না হলে হিন্দুর ধর্ম্মসাধন হয় না। তাই তিনি কিছুদিন শক্তি সঞ্চয় করবার উপদেশ দিয়েছিলেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় লক্ষ্য করেছ কি যে বিদেশে গিয়ে উনি যতগুলি বক্তৃতা দিয়েছেন, প্রত্যেকটিতে আছে গীতার কথা, বেদান্তের কথা, ত্যাগের কথা? পশ্চিমের ভোগমুখী সভ্যতাকে উনি কোথাও প্রশ্রয় দেন নি। ঘরের ছেলেকে শুধু বলেছেন, "ভোগ কিছু করে নাও"—কারণ ভোগ না হলে ত্যাগ শেখা যায় না বৎস! এই জন্যই শাস্ত্রে অধিকারীভেদ স্বীকার করা হয়েছে। ভোগের অন্তে যে ত্যাগ, তাই স্থায়ী ত্যাগ।

—কিন্তু সন্ন্যাসীরাও কি ভারতের মুক্তির জন্য চিন্তা করেন?—অজয় প্রশ্ন করলো।

—তোমার প্রশ্নটা নিতান্তই ছেলেমানুষের মত, আর তুমি সত্যই ছেলেমানুষ। স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীই ছিলেন, তোমাদিকে কিছুদিন ভোগের দ্বারা বাঁচার মত বাঁচবার উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু নিজে তিনি কোনদিন কিছু ভোগ করেননি—আর তোমাদের বাংলাদেশে ভারতের

মুক্তি-যজ্ঞের প্রথম হোতো নিশ্চয়ই তিনি। পরাধীনতার বেদনার কথা তাঁর থেকে বেশী তাঁর পূর্ব্বে আর কে বলেছিলেন বৎস ?

—বিবেকানন্দ বীর সন্ন্যাসী। মানুষের মুক্তি, সামাজিক, রাষ্ট্রীক, এবং ব্যষ্টিক মুক্তির তিনি উপাসক, প্রভু—আমি অরণ্যবাসী অলৌকিক শক্তি-প্রয়াসী সন্ন্যাসীর কথা বলছি।

—অরণ্যচারীরাও ভারতমাতার সন্তান। ওঁদের আধ্যাত্মিকধর্ম্ম যাই হোক, ইহলৌকিক ধর্ম্মও আছে, এবং সে ধর্ম্ম চায় স্বদেশজননীর শুধু মুক্তি নয়, অমৃতত্ব। যে অমৃত সারা পৃথিবী পান করে ধন্য হবে। সন্ন্যাস কোন্ ধর্ম্মে নাই বৎস ?—কোন্ দেশে নাই সন্ন্যাসী ? ঋষি বঙ্কিমের আনন্দমঠে তোমরাও সন্ন্যাসীর মুখেই মুক্তিযজ্ঞের কথা শুনেছ। ঋষি অরবিন্দ সন্ন্যাসী হয়েও ভারতের মুক্তির জন্য তপস্যা করেন। সবরমতীর ঋষি মহাত্মা গান্ধীও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। আজ দিল্লীর যমুনাকূলে লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী এসে ভারতের কল্যাণের জন্য দাবী জানাচ্ছেন। তোমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের কাছে সে দাবী উপহাস্য হতে পারে, কিন্তু সে দাবীর শক্তি অমোঘ। ভারতের গহনগিরিতে আজও ভারতের মুক্তির জন্য তাঁরা তপস্যা করেন—এবং তাদেরই তপঃ প্রভাবে এই ভারতের সব পাপ ধুয়ে যাবে, নবীন পুণ্য সূর্য্যালোকে জাগবে আবার—তার প্রমাণ বিস্মৃত যুগ থেকে স্মৃতযুগ পর্য্যন্ত ছড়ানো আছে ইতিহাসে।

আকাশের অগণ্য নক্ষত্র স্থির হয়ে রয়েছে যেন, কিন্তু ইন্দ্রজিত জানে, ওরা চলমান। কে জানে, এই চলমান পৃথিবীও আবার কোনোদিন সেই বিস্মৃত যুগে ফিরে যাবে কিনা—সেই হারানো ধর্ম্মরাজ্যে !

সন্ন্যাসী আশ্রমের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। ছোট একখানি বাড়ী, সামনে কাঁটার বেড়ায় ঘেরা উঠোনে কয়েকটি ফুলগাছ—তার মাঝে বসবার জন্য একটি বেদী! এই অতি সামান্য আশ্রমের কাঠের কটকে এসে বললেন—এসো! এই আমার আশ্রম। শীত আর আতপ থেকে আমাকে রক্ষা করে ; এর বেশি কিছু নেই !

ইন্দ্রজিত এবং অজয় ও'র পিছনে ঢুকলো। কুটীরের বারান্দাটুকু পরিষ্কার, শুকনো—শান বাঁধানো! একখানা কম্বল পেতে দিলেন সন্ন্যাসী। প্রদীপ জ্বালালেন, সুরভিত ধূপ দিলেন ধূপতীতে। আলোকের শিখায় ইন্দ্রজিত দেখলো, নিতান্ত ক্ষুদ্র এই কুটীরখানি শিল্প-সম্পতে অতুলনীয়। দেওয়ালের গায়ে চিত্রাঙ্কন, ঘরের মেঝেতেও চমৎকার আলিম্পনরেখা। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য-জনক কয়েকটি দারু-মূর্ত্তি।—নিতান্ত ক্ষুদ্র, কিন্তু শিল্প-সুষমায় অপরূপ। ইন্দ্রজিত অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো,

—আপনি কি ললিতকলার চর্চাও করেন প্রভু! এই সব দারুশিল্প কি আপনার স্বহস্তে প্রস্তুত?

—না বৎস! সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন—ওগুলি সংগ্রহ করা। আমার সাধনার পথে রূপশিল্পের একটা প্রেরণা আছে, একটা আবেদন আছে, একটি বিশিষ্ট বার্ত্তা আছে! সে বার্ত্তা এই ভারতেরই রূপসাধনার বাণী—সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসনার বাণী।—বলে তিনি কিছুক্ষণ যেন ধ্যানস্থ থাকলেন, পরে বললেন,

—যে যুগে ভারত জ্ঞানে, গুণে, বিদ্যায় ছিল অদ্বিতীয় পৃথিবীতে, তখনকার সৃষ্টি এই সব তক্ষণকলা। ইউরোপীয় অনুসন্ধানীর দল একে বহুবার পরিমাণ-জ্ঞানহীন, সংহাত-শূন্য, এমন কি অদ্ভুত পরিকল্পনার অবাস্তবতা বলে আখ্যাত করেছেন, কিন্তু তাঁদেরই অনেকে আবার স্বীকার করেছেন এর অপরূপ বৈশিষ্ট্য, আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক আবেদন আর সৌন্দর্য্যের অপরাজেয় জীবন্ত বাণী বলে! ব্যবহারিক শিল্প সৃষ্টিতেই পাশ্চাত্যের দৃষ্টি—সে দৃষ্টি বহির্মুখী। অন্তর্দৃষ্টির আত্মপ্রকাশ হয়েছে ভারতীয় দৃষ্টিতে; হাতীর দাঁত, শিং, হাড়, মাটি, কাচ, ধাতু, প্লাষ্টার, এনামেল, গালা, ঝিনুক, কাঠ ইত্যাদিতে ভারতীয় তক্ষণ-শিল্পীরা বহুশত বৎসর ধরে রূপ-সাধনা করে সেই সাধনবাণী রেখে গেছেন আমাদের জন্য। তাঁদের বিশিষ্ট শিল্প কাঠের উপর—কারণ, আবলুস, চন্দন ইত্যাদি ভারতীয় কাঠের এমন একটি বর্ণাস্তরণ আছে, যার বার্ত্তা সম্পূর্ণ নিজস্ব। তাছাড়া এই

সব কাঠের নমনীয়তা, কোমল-কাঠিন্য আর পবিত্রতায় যে সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাস ওঠে তা আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। ভারতের মন্দির-শিল্প পৃথিবীতে সর্ব্ব বৃহৎ শিল্প এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌধকলা—কিন্তু মন্দিরের বিরাটত্ব, অলঙ্করণ আর ঐশ্বর্য্যকে পূর্ণ প্রকাশ করতে প্রয়োজন হোতো কাঠের দরজার, কাঠের অলঙ্করণের। তাই মন্দির-শিল্পের সঙ্গে দারুশিল্প ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাছাড়া, দেবতার দারুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা থাকায় এদেশের তক্ষণ-শিল্প বিশেষ মর্য্যাদা পেয়েছিল। ভারতের মিষ্টিক রূপস্রষ্টার সাধনায় সেই সব দারুমূর্ত্তি আজো পৃথিবীর বিস্ময় হয়ে রয়েছে। দারু শিল্পের এই অধ্যায় ভারতের নিগূঢ় প্রাণধর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত—তাই বলছিলাম—ভারতমাতা কথা বলেন তাঁর মন্দির দ্বারপথে, তাঁর শিল্পবাণীতে!

—এই সমস্ত শিল্পই কি ভারতের?—ইন্দ্রজিৎ প্রশ্ন করলো সবিনয়ে!

—হ্যাঁ, ভারত এবং ব্রহ্মদেশের কিছু কিছু নমুনা সংগ্রহ করা আছে আমার। নেপাল, মহীশূর, বরোদা, পেশোয়ার, কাশ্মীর, অমৃতসর, জলন্ধর, মথুরা, লক্ষ্ণৌ, মাড়োয়ার, জয়পুর, বিকানীর, গুজরাট, বিজাপুর, ত্রিবাঙ্কুর,—তাছাড়া ব্রহ্মদেশেরও আছে। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করবার সময় এগুলি আমি সংগ্রহ করেছিলাম।

ইন্দ্রজিৎ রাজনীতি, সমাজনীতি নিয়েই চর্চ্চা করে, শিল্পসম্বন্ধে সে অনভিজ্ঞ; তাই জিজ্ঞাসা করলো,

—এ সংগ্রহের উদ্দেশ্য কি প্রভু? শুধু আপনার শিল্পানুরক্তি, কিম্বা আরো বৃহত্তর কিছু?

—আরো বৃহত্তর কিছু। এই সব শিল্পীবংশ নিস্তেজ, নির্বীর্য্য, বৃত্তিহীন হয়ে গেলেও, এখনো আছে ভারতের বহু গ্রামপ্রান্তের ক্ষুদ্র কুটীরে। এই মাদ্রাজেই অনেক আছে। উদ্দেশ্য তাদের পুনরভ্যুদয় করানো।

—সে কি সম্ভব হবে আর?—ইন্দ্রজিতের কণ্ঠে গভীর নিরাশার ব্যঞ্জনা!

—অসম্ভব বলে কিছুই আমি মনে করিনা। যা একদিন ছিল তা

আবার হবে, এটা ইতিহাসের নিয়ম! কিন্তু সেই হওয়ার জন্য আমাদিকে তাকাতে হবে দূর অতীতের পানে; ভাবতে হবে—দেশ কতখানা পরিপুষ্ট, রুচিমাজিত আর ঐশ্বর্য্যবান হলে তবে এমন ভূরি ভূরি প্রমাণ রেখে যেতে পারে তার রূপসৃষ্টির। সেই পরিপুষ্টি, সেই রুচি, সেই ঐশ্বর্য্য যতক্ষণ না আসবে ফিরে, ততক্ষণ ভারত স্বাধীন হোল বলে মনে করি না আমি। সন্ন্যাসী থামলেন।

ইন্দ্রজিতও ওঁর গভীর কথাগুলো অন্তর দিয়ে অনুভব করবার চেষ্টা করতে লাগল। অজয় অকস্মাৎ ঝোলা থেকে একখানা খবরের কাগজ বের করে বললো—আসল কথাটাই ভুলে গিয়েছি ইন্দ্রদা; ভারতের জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে—ত্রিবর্ণ বস্ত্রের উপর অশোকের ধর্ম্ম-চক্র!

অজয় আলোর সামনে খুলে ধরলো কাগজখানা। 'পতাকাটি মেলে সমবেত সকলকে দেখানো হচ্ছে'—এই ফটোখানা ছাপা রয়েছে। ইন্দ্রজিৎ সাভিনিবেশে দেখলো।

—অশোকের চক্র দেওয়ায় পতাকার মর্য্যাদা হাজারগুণ বেড়ে গেছে; কি বল ইন্দ্র দা?—অজয় শুধুলো।

—হ্যাঁ—চরকাটা তুলে দেওয়ায় অন্ততঃ বোঝা যাচ্ছে যে ভারতীয় সংস্কৃতির সম্বল শুধু চরকা নয়; তা ছাড়া সৌন্দর্য্যের দিক থেকে এই পতাকা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পতাকা হবে।—অজয় বললো।

ইন্দ্রজিত পড়ছে জহরলালজীর ভাষণ। 'সমবেত সকলেই, এমন কি কয়েকজন অহিন্দুও দাঁড়িয়ে উঠে ঐ পতাকাকে সম্মান দেখিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধী চরকার স্থানে চক্র দেখে খুবই খুসী হয়ে নাকি বলেছেন —'হুইল যথন রইল তথন আর কথা কি!' পতাকার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে সর্ব্বসম্মতিতে। কি কি রং হবে, কতখানা লম্বা চওড়া হবে এবং চক্রটি কেমন ভাবে কোথায় থাকবে, সবই ঠিক হয়ে গেছে।' ইন্দ্রজিৎ সজোরে পড়ল। সবটা শুনেও সন্ন্যাসী চুপ করে রইলেন। ইন্দ্রজিত নিরুপায় হয়ে প্রশ্ন করলো,

—আমার মতে এ পতাকা ভারতের জাতীয় পতাকার যোগ্যই হয়েছে! আপনার কি মত প্রভু?

সসম্মানে দুহাত ললাটে ঠেকিয়ে উনি সর্ব্বাগ্রে নমস্কার করলেন পতাকাটিকে, তারপরও আধমিনিট খানেক চুপ করে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন,

—জাতীয় পতাকা জননী জন্মভূমির প্রতিরূপ, তাই পূজ্য—ওর সমালোচনা করবার নৈতিক অধিকার আমাদের নেই, বৎস, তবে আলোচনা করা যেতে পারে শ্রদ্ধার সঙ্গে।

বলে উনি আরো কিছুক্ষণ থেমে থাকলেন; ইন্দ্রজিৎ আর অজয় চেয়ে রয়েছে ওঁর পানে।

—প্রথমতঃ ভারতীয় বৈজয়ন্তীতে লাল-সাদা-সবুজের অকারণ বর্ণ-বৈচিত্র্য অদ্ভুত ঠেকে। এর কোনো কারণ নেই, একমাত্র বৈদেশিক অনুকরণ-প্রিয়তা ছাড়া।

—দর্শনাচার্য্যগণ চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন ঐ বর্ণগুলির—অজয় সোৎসাহে বললো।

—ব্যাখ্যা বহু এবং বিচিত্র হতে পারে, তার জন্য দর্শনাচার্য্যের কোনো প্রয়োজন হয় না; কিন্তু ভারত ত্যাগীর দেশ, এবং ভারতমাতার গৌরবোজ্জ্বল দিনে পতাকা ছিল গৈরিক বর্ণ; আজকার দিনে একথা মনে করা উচিৎ ছিল, কিন্তু ওঁরাই ত্রিবর্ণ পতাকার প্রতিষ্ঠাতা,—কাজেই মত পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ ধর্মের আভাস থাকায় কংগ্রেস সেই গৈরিকবর্ণ নিশ্চয় গ্রহণ করবেন না—এ ছাড়া পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা-বুদ্ধিই ভারতের শতাব্দিব্যাপী দুঃখের এবং পতনের মূল কারণ!

একটা গভীর শ্বাস ত্যাগ করে উনি বললেন—কুরুদের সঙ্গে পাণ্ডবদের, পৃথ্বিরাজের সঙ্গে জয়চন্দ্রের, সিরাজের সঙ্গে মীরজাফরের ঐ একই ইতিহাস। ঐ একই ঐতিহাস আর্য্যের সঙ্গে আদিবাসীর, উত্তরাখণ্ডের সঙ্গে দক্ষিণা-

গথের দ্রাবিড়দের, হিন্দুর সঙ্গে বৌদ্ধের, উচ্চবর্ণের সঙ্গে হরিজন নামক হিন্দুর! এই মানসিক গ্লানি আজও ক্ষালিত হোল না। ভেবেছিলাম, ইংরাজ যাই দিক,—হিন্দুমুসলমানের মিলন নাই হোক—ভারতের অন্য সকল রাজনৈতিক দল নিশ্চয় আজ এক হয়ে যাবে।

ইন্দ্রজিত ওঁর কথাগুলো নীরবে শুনে গেল, ওঁর উচ্ছ্বাসে কোথাও বাধা দিল না।

—অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে অশোক নিশ্চয়ই অবিস্মরণীয়;—সাম্য মৈত্রী-প্রীতির শাসনে তিনি ভারতকে শাসিত দেশ রাখেন নি, স্বর্গরাজ্য করেছিলেন—তাঁর প্রবর্ত্তিত এই চক্র, ধর্ম্মচক্র—ধর্ম্মকেই তিনি শাসকের আসনে বসিয়েছিলেন—যে ধর্ম্ম রাজধর্ম্ম, গণধর্ম্ম এবং মানবধর্ম্ম। শ্রীমন্ সূর্য্যদেবের প্রতিকৃতি ঐ চক্র—আর সূর্য্যই ভারতের চির উপাস্য দেবতা—তৎ সবিতুর্বরেণ্যং...সন্ন্যাসী নিম্নস্বরে আরো কি দু'এক কথা বললেন!

—সেই জন্যই তো বলছি, এ পতাকা ভারতের জাতীয়তার যোগ্য হয়েছে! ইন্দ্রজিত বললো এবার।

—যোগ্যতার কোনো প্রশ্নই আসে না বৎস, যে পতাকা জাতীয় মহাসভায় গৃহীত হয়েছে, সে পতাকা সব অবস্থাতেই সম্মানার্হ। তবে ওর সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে জহরলালজীর সঙ্গে আমি একমত নই!

—কেন প্রভু? ইন্দ্রজিত সবিনয়ে প্রশ্ন করলো!

—ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ বোদ্ধা তিনি; তাঁর Discovery of India এই কয়েকদিন আগে পড়েছি! মতের বহু বিভিন্নতা থাকলেও, বইখানি এক কথায় চমৎকার। তাঁর কাছে ওই পতাকার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অমন উচ্ছ্বাস আশা করি না! শিল্পীর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ওর সৌন্দর্য্য মলিন হয়ে গেছে শুধু নয়, রূপসুষমার মৃত্যু ঘটেছে। কেন, তাই বলছি।—বলে সন্ন্যাসী আবার জোড়হাত করে প্রণাম করলেন পতাকার উদ্দেশে। এই আশ্চর্য্য দেশভক্ত, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর আচরণ দেখে অবাক হচ্ছিল ইন্দ্রজিত আর অজয়।

—শুধু আলোচনা করছি ওর রূপশিল্পের—জাতীয়পতাকার সম্মান আমার মাথায় রইল। ঐ যে উপরে আর নীচে দুটি ঘন রঙ, তাদের উজ্জ্বলতার আওতায় ঐ চক্রের বৈশিষ্ট্য পিষ্ট হয়ে যাবে! ওদের তুলনায় চক্রের ক্ষুদ্রত্ব আর চক্রের দু'পাশের শ্বেত শূন্যতা চক্রটিকে নিতান্তই অকিঞ্চিতকর করে তুলবে, অথচ বলা হয়েছে যে অশোকের ধর্ম্মচক্রই ঐ পতাকার বিশিষ্ট বাণী এবং ভারতের প্রাচীনত্বের আর প্রজ্ঞার নিদর্শন; কিন্তু চক্রকে প্রতিষ্ঠা দিতে ওঁরা দুটি রং এর মোহ ত্যাগ করতে পারলেন না—কেন? ত্রিবর্ণ পতাকার অবশ্যই একটা ইতিহাস আছে ভারতের এই মুক্তিসংগ্রামে। হাজার হাজার মানুষ ঐ ত্রিবর্ণ পতাকা হাতে মৃত্যুবরণ করেছে, জেলে গিয়েছে, সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে—সে গর্ব্ব যদি থাকেই ওঁদের, তবে পতাকা পরিবর্ত্তন করার প্রয়োজন কি ছিল? ওর ইতিহাস মাত্র কয়েক বছরের ইতিহাস—তার সঙ্গে আড়াই হাজার বছরের ঐতিহাসিক চক্রকে জড়াবারই বা কি দরকার ছিল! আমি শিল্পরসপিপাসু সাধারণ মানুষ, আমি সন্ন্যাসী;—সত্যই আমার প্রিয় ভাষণ,—যদি কারো অপ্রিয় হয়, উপায় নাই।—বলে উনি আরো কিছুক্ষণ থেমে রইলেন। ইন্দ্রজিত ওঁর কথাগুলি ভাবছিল—বললো,

—সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আরো কিছু বলবার আছে আপনার?

—হ্যাঁ, নিশ্চয—মূল কথাটাই বলা হয়নি। পতাকাটি চতুষ্কোণ, ওর দুই পাশে—উপরে আর নীচে, সরল রেখাবং দুটি বর্ণ—বস্ত্রপ্রান্তের সরল রেখার সঙ্গে এই গাঢ় বর্ণ-রেখারও সুন্দর মিল হয়, কিন্তু মধ্যের ঐ বক্ররেখা-বিশিষ্ট চক্রবৃত্ত উপর-নীচের সরল বর্ণরেখার সঙ্গে আদৌ মেলে না—এই সরলে বক্রে সমন্বয় না হওয়ায়, সমগ্র পতাকাটির শিল্পকৌশল কোনো বিশিষ্ট বার্ত্তা তো দিলই না, উপরন্তু রসিকের চোখে দৃষ্টিকটু হোল। ঐ পতাকার চিত্র আঁকতে হলে শিল্পীকে ওর কাপড় এবং রংএর অংশকে বক্র করতেই হবে—কারণ শিল্পীরা সরলে-বক্রে মেশাতে চাইবেন না। কিন্তু যাক, বৎস, জাতীয় পতাকা

জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ, অতএব ওই পতাকাকে এসো, আবার আমরা নমস্কার করি।

সন্ন্যাসী মাথা নোয়ালেন, সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রজিত আর অজয়ও মাথা নোয়ালো।

বড়দাকে বসিয়ে সুবোধ তার "স্কীম" বলে চললো! যুদ্ধোত্তর শিল্প-সংগঠন আর দেশের বর্ত্তমান অর্থনীতির কিছু বিশদ আলোচনা করে বড়দাকে বোঝালো, যে, তার পরিকল্পনা দেশসেবারই পরিকল্পনা, এবং বর্ত্তমান জননেতাদের অনুমোদিত পরিকল্পনা। তাছাড়া, বঙ্গভঙ্গ হওয়ার জন্য যাঁরা বাধ্য হয়ে পূর্ব্ববঙ্গ ছেড়ে আসছেন, তাঁদের কর্ম্ম দিতে হবে পশ্চিমবঙ্গে; শুধু বাস করবার বাড়ীর জমি দিলেই তো চলবে না! আরো উঁচু দরের কথা হচ্ছে, ভারত যখন স্বাধীনই হয়ে গেল, তখন পৃথিবীর স্বাধীন অন্য সব দেশের সঙ্গে শিল্পে-বাণিজ্যে তাকে পাল্লা দিয়ে চলতে হবে—বিদেশে রপ্তানী করতে হবে দ্রব্যনিচয়; অতএব এখন বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়া কর্ত্তব্য!

বড়দা সবটাই ধৈর্য্য ধরে শুনলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন—তোমার পরিকল্পনা শোনার দিক থেকে খুবই উদার-মহান সুবোধ, কিন্তু আমাকে দিয়ে কি হবে ভাই এতে?

—আপনি বড়দা, চিরদিনের দেশসেবক,—আপনার অনুমোদন আর আশীর্ব্বাদ নিয়েই আরম্ভ করি।

—বেশ তো, আশীর্ব্বাদ করলাম—বলে উনি হাসলেন!

—শুধু তাই নয়, বড়দা, সক্রিয় সাহায্য কিছু করতে হবে। আপনি ডিরেক্টর হোন!

—না সুবোধ, দেশসেবকের কাজ শুধু দেশসেবা করা। ডিরেক্টর হওয়ার সময় কৈ ভাই! ভারতে নূতন রাষ্ট্রতন্ত্র প্রস্তুত হচ্ছে, নব শাসনের সঙ্গে নবীন ভারতের গঠন সুরু হবে—আহ্বান এসেছে আমার।

—তাতে কি বড়দা, যান না কাল! ডিরেক্টর হয়ে আপনাকে তো কিছুই করতে হবে না—শুধু নামে। নামের ঐ আশীর্ব্বাদের জন্য খোকার নামে দু'শো শেয়ার রইল।

—না সুবোদ, ধন্যবাদ—বড়দার বিরক্তিটা প্রচ্ছন্ন হয়েই রইল মুখের মিষ্ট হাসিতে। কিন্তু ঐ হাসিটাকেই সম্মতির সহায়ক ভেবে সুবোধ উৎসাহিত হয়ে উঠলো। বললো,

—সারা জীবন কে আর জেলে পচে মরে বড়দা—? দেখুন না, পশ্চিম বাংলার অবস্থা—কি রকম পদাধিকার বণ্টন আর দলাদলি চলেছে এর মধ্যে; তবু তো এখনো পনরোই আগষ্ট আসে নি! স্বার্থ-সিদ্ধির এই সাংঘাতিক অবস্থাটা দেখুন বড়দা! এতে দেশের কি উপকার হবে?

—উপকার হবে দেশের! হাজার হাজার মণ চাল বেরিয়ে যাচ্ছিল, টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছিল—সেগুলো অন্ততঃ রোখা যাবে এতে—বড়দার কণ্ঠস্বরে কঠোর গাম্ভীর্য্য। সুবোধ একটু ভয় পেয়ে গেল, কিন্তু আত্মসংবরণ করে বললো বিনীত কণ্ঠে,

—আমি কারো সমালোচনা করছি না, বড়দা, অত বিদ্যে আমার নেই। আমি আপনার সাহায্য চাইছি আমার এই কাজে!

—আমি এ পদ গ্রহণ করতে পারবো না সুবোধ, মাফ চাইছি। আমার সহানুভূতি রইল।

নিজকে শুদ্ধ সংযত রেখে বড়দা উঠবার জন্য উঠলেন, কিন্তু সুবোধ কাকুতি জানিয়ে বললো—বর্ত্তমান যুগে নেতাদের নাম না দিয়ে দেশের কাজ কিছু করা যায় না বড়দা; দেশের সুর-ই আজকাল এই রকম। সামান্য রেষ্টোরাঁ বা ডাইং-ক্লিনিংএর দোকানেও নেতাদের নাম দরকার হয়। আপনার মতন এত বড় একজন কংগ্রেসী নেতা এই গ্রামে থাকা সত্বেও অন্য কাউকে নিতে গেলে তাঁরা আমার সততায় সন্দেহ করতে পারেন। আপনি এই কারখানার ডিরেক্টর হোন; কোনো কাজই আপনাকে করতে হবে না।

—দেশ-সেবকের এসব কাজ করা চলে না সুবোধ—আইনতঃই চলে না। ভারতের জন্য যে নূতন নিয়মতন্ত্র প্রস্তুত হচ্ছে, তাতে এরকম কিছু কাজ রাজপুরুষদের করা চলবে না!

—চলবে—সুবোধ যেন অকস্মাৎ একটু উত্তপ্ত কণ্ঠেই বললো—স্বনামে না চলে, বেনামে চলবে তখন। আর স্বনামে চলবে পদাধিকার।—বলেই সুবোধ একোণে জড় করা একখানা খবরের কাগজ বের করতে করতে বললো তীক্ষ্ণ স্বরে,

—সততার কথা কেন আর বলেন বড়দা? এই দেখুন, স্বয়ং গান্ধীজি কতখানা দুঃখ প্রকাশ করেছেন পদাধিকারের প্রতিযোগিতা দেখে! কিন্তু ভেবে দেখুন, সারা জীবনই কি ওঁরা জেল ভোগ করবেন, বড়দা? মানুষের জীবনে একান্ত দরকার আর্থিক নিরাপত্তা, প্রতিষ্ঠা, সম্মান। আপনার মত আদর্শবাদী কটা আছেন, দেখান তো আমায়!

সুবোধ ব্যঙ্গ হাসলো! বড়দা জানেন—কোনো খবরই ওঁর না-জানা নেই। কংগ্রেসের আদর্শ রক্ষার জন্য তিনি পিতার সঙ্গে বিবাদ করেছেন। পিতৃদেব তারই জন্য গৃহত্যাগী। তিনি জীবিত কি মৃত, জানা নেই। তারপর বড়দা এই দীর্ঘকাল অহিংসা আর অসহযোগের আদর্শের জন্য শত সহস্র দুঃখ সহ্য করে এলেন। কিন্তু আজ সেই আদর্শ তিনি ঠিক রাখবেন কি ভাবে? একা তিনি ঐ মহান আদর্শ কতদিন পালন করতে পারেন!—বড়দার ভ্রূ চিন্তায় কুঞ্চিত হয়ে উঠলো, তবু তিনি তাঁর আজীবন-নিষ্ঠ আদর্শকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই যেন বললেন—পদাধিকারের প্রতিযোগিতা নিশ্চয়ই ভাল কথা নয়, তবে দেশের কাজ তো দেশের লোককেই করতে হবে—এসব কাজ তাছাড়া করবে কে আজ?

—তার জন্য দেশের লোকের তরফ থেকেই ওঁদের কাছে অনুরোধ-আবেদন চাওয়া উচিৎ ছিল বড়দা—

বড়দা নিশ্চুপে ভাবতে লাগলেন সুবোধের কথাগুলো। সুবোধ বুদ্ধিমান,

শিক্ষিত শুধু নয়, বিশ্লেষণ করবার শক্তি রাখে। "আমি ভেবে দেখবো"—কথাটা যেন তিনি বলতে যাচ্ছেন, কিন্তু সুবোধই বললো—এতকাল যাঁরা জেল ভোগ করে এলেন—সারাজীবন উপার্জ্জনের বা পরিবার প্রতিপালনের কোনো চেষ্টাই যাঁরা সাধ্য থাকতেও করেন নি, তাঁরা এই সুযোগ গ্রহণ করবেন ; করাই উচিৎ, এবং স্বনামে না হোলেও, বেনামে, অন্ততঃ পত্নী পুত্রের জন্য সঞ্চয় করেও যাওয়া উচিত, কারণ আগামী দু'পাঁচ বছরে দেশের অবস্থা যে কি হবে, কেউ জানে না। পরিবারের উপর প্রত্যেকেরই নৈতিক কর্ত্তব্য আছে বড়দা, যেমন দেশের প্রতি আছে ! আপনাকে একথা বোঝাতে যাওয়া আমার নিতান্তই ধৃষ্টতা ; তবু ছোট ভাই হিসাবে আর খোকার ভবিষ্যতের জন্য আমি প্রার্থনা করছি…।

—আচ্ছা সুবোধ, আমি তোমার কথাটা আর একবার ভেবে দেখবো। দিল্লী থেকে ফিরে আসি। কালই আমাকে যেতে হবে দিল্লী।

সুবোধের মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠলো এক ঝলক, সুবোধ কি যেন বলতে যাচ্ছে, হঠাৎ অযোধ্যার রাজোদ্যানে ইন্দুমতীর অঙ্গে পড়া পারিজাত মালার মত ঢুকলো এসে সেঁজুতি ! সুবোধ অবাক তো গেলই, আনন্দিতও হোল, কিন্তু বেশী হোল অপ্রস্তুত ! তার চেহারাটা ক্লান্ত আছে, পোষাকের পারিপাট্যও নেই। সেঁজুতি এরকম অবস্থায় তাকে দেখবে, এটা সে আদৌ চায় না।

—কি রে সেঁজুতি ! এই অন্ধকারে……আয় ? কি খবর ?—সুবোধ স্বাগত জানালো !

—বড়দা, শীগ্রি বাড়ী আসুন—সেঁজুতি সুবোধকে এড়িয়ে বড়দাকেই বললো। ও প্রায় ছুটে এসেছে। আরক্ত কপোল আর আতঙ্কিত দৃষ্টি জানিয়ে দিচ্ছে ভয়ঙ্কর কিছুর বার্ত্তা। বড়দা অতি ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

—কেন ? কি ব্যাপার, সেঁজুতি ?

—'তার' এসেছে কলকাতা থেকে—লকুদার খবর !

—কে 'তার' করেছে ? লকু ?

—না, তার বন্ধু সনৎ বাবু! 'তারে' বিশেষ কিছু বোঝা যায় না,—শুধু লেখা আছে, "লকু হাঁসপাতালে—শীঘ্র আসুন—"—বলতে বলতে সেঁজুতির চোখের বিষণ্ণতা যেন কান্নায় চক্‌চকে হয়ে উঠলো!—কলকাতার খবরও খারাপ, খুব হাঙ্গামা হয়েছে, বড়দা···বৌদি খুব ভাবছে—আপনি শীগ্রি আসুন!

—ভাববার কি আছে?—অসুখ করেছে কিছু—বলতে বলতেই সুবোধ আয়নাটার পাশে রাখা তোয়ালে দিয়ে মুখখানা মুছে কিঞ্চিৎ পরিষ্কার হয়ে নিল। বড়দা আর কোন প্রশ্ন না করে বেরিয়ে পড়ছেন, পিছনে সেঁজুতি; সুবোধ আদ্দির পাঞ্জাবীটা গায়ে দিতে দিতে দারয়ানকে বললো—ভজু সিং, আলো দেখিয়ে চলো। উজ্জ্বল আলোতে সুবোধের পাঞ্জাবীর হীরে বসানো সোনার বোতাম গুলো ঝলমল করে উঠলো। কিন্তু সেঁজুতি দেখলো না; সে ত্বরিতে চলেছে বড়দার পিছনে। ভজু সিং আলোটা নিয়ে এগিয়ে গেল সকলের আগে। এই এক মুহূর্ত্তের স্থিতিকে সুযোগরূপে গ্রহণ করে, সুবোধ সেঁজুতির প্রায় সামনে এসে বললো—অন্ধকারে তুই একা এসেছিস?

—হ্যাঁ—!

—এমন করে আসিস না; দিন-সময় বড় খারাপ। তুই আর ছোট মেয়ে নেই সেঁজুতি!

উত্তর দিল না সেঁজুতি—অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে সে। মানুষের এমন ঘোরতর বিপদের সময় কি ভূতের ভয় থাকে, নাকি চোরের ভয় থাকে? বড়দা আলোর পেছনে এগুচ্ছেন, তাঁর পিছনে সেঁজুতি, শেষে সুবোধ। সুবোধ বলল,

—চলুন দেখি, 'তার'টার মর্ম্ম কিছু বোঝা যায় কি না!

কেউ কোনো উত্তর দিল না। সুবোধ 'তার'টা দেখতে এবং আত্মীয়তা জানাতেই আসছে, কিন্তু ওর অন্তরের গোপনপুরে আসছেন অন্য একজন,—তিনি সুবোধের প্রেম দেউলের দেবতা! সমুখে-চলা সেঁজুতির দীপশিখার মত তনুলতা এগিয়ে চলেছে, সুবোধ সেই সান্নিধ্যটুকুর জন্য যেন সংসারের সব ছেড়ে

অরণ্যে যেতে পারে, অন্তহীন পাথার পেরুতে পারে—অমানুষ হয়েও যেতে পারে হয়তো ! কিন্তু প্রেমের দেবতা নাকি মানুষকে মহান করেন, সুন্দর করেন, সার্থক করে দেন মানব জন্ম ! সুবোধের হাসি পেল কথাটা মনে হতে। হীরের বোতামগুলো সকলের অলক্ষিতে পাঞ্জাবীর হাতা দিয়ে মুছে দিতে দিতে সে ভাবলো, 'ওসব প্রেম কাব্যিক প্রেম ; মানুষের বাস্তব জীবনে ওর ঠাঁই কোথায় ? মানুষ চায় বাঁচতে—নিরাপত্তার প্রাসাদে, নিজের রচিত পারিপার্শ্বিকের মধুর আবেষ্টনে, প্রিয়জনের নিগূঢ় অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মানুষ বাঁচতে চায়—ভোগে, সুখে, সৌভাগ্যে ভরে তুলতে চায় তার জীবন-কালের কয়েকটা মাত্র দিন ! এই বাস্তবতাকেই অনুরঞ্জিত করবার জন্য—আরো উপভোগ্য করবার জন্য মানুষ কল্পিত আদর্শের সৃষ্টি করেছে—কাব্য লিখেছে। আত্মত্যাগের আদর্শ তার আত্মতোষণেরই সহায়ক ;—প্রেমের পারমার্থিক ভাষ্য তার নিজেরই কৃত কাম-কদর্যতার উপর কল্পনার মর্মরদেউল !—সুবোধ আত্মপ্রসাদের হাসি হাসছে !

গ্রামখানা যথেষ্ট লম্বা এবং পথও অনেকটা। সুবোধ কথা বলবার জন্যই বলল,—আমার মনে হচ্ছে, সাধারণ কোনো অসুখ করেছে নকুর, নাহলে সনৎ সেটা লিখতো !

—সনৎকে তো তুমিও চেন ?—বড়দা প্রশ্ন করলেন !

—হ্যাঁ, আমরা সকলে একসঙ্গে পড়েছি। সনৎ এখন ইউনির্ভাসিটির প্রফেসার। ও বরাবর ভাল ছেলে ছিল। অবশ্য নকুও ইচ্ছে করলে ওরকম পোষ্ট পেতে পারতো !

—হুঁ—বড়দা কথাটা এড়িয়ে গেলেন। দেশাত্মবোধ আর আদর্শ-নিষ্ঠা তাঁদের দুইভাইকেই আজো চাকুরীর শৃঙ্খল থেকে বাইরে রেখেছে কিন্তু আজকার সরকারী চাকুরী তো দেশসেবারই নামান্তর—এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা তো স্বাধীন দেশের তরুণদের বিদ্যাদান করা রূপ দেশ-সেবাই।—কিন্তু নকুর বিপদের আশঙ্কায় চিন্তাটা আর অগ্রসর হোল না—বাড়ীতে এসে

পৌঁছুলেন ওঁরা। স্বাহা বসেছিল তুলসীতলায় প্রদীপের সামনে টেলিগ্রামের কাগজখানা কোলে নিয়ে। ওর ছেলেটা ঘুমিয়ে গেছে! বড়দা এসেই কাগজখানা তুলে প্রদীপের আলোতে পাড়লেন—'লকু হাঁসপাতালে; শীঘ্র আসুন।' এছাড়া আর কিছু লেখা নাই। হাসপাতালে কবে গেছে এবং কেন গেছে লকু, লিখলো না কেন?

ওরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ী করছেন, সুবোধ ইতিমধ্যে 'তার'টা হাতে নিয়ে গবেষণা করতে লাগলো। এদের ভাল লাগবে, অন্ততঃ সেঁজুতির ভাল লাগবে। অনেক ভেবে বললো,

—ভয়ের কি আছে? সনৎ যখন রয়েছে, সে নিশ্চয় দেখবে। তবে আমার মনে হয়, হাঙ্গামার জন্য নয়, হয়তো হঠাৎ কোনো অসুখ হয়ে পড়েছে লকুর।···

ওর কথার কেউ কোন উত্তর দিল না। বড়দা উঠানে বার কয়েক পায়চারী করলেন। বৃদ্ধা মা ঘরের এক কোণে বসে বসে হয়তো ভগবানের নাম জপ করছিলেন; বললেন,

—তোরা অত ঘাবড়াসনে। অনেক বিপদ সারা জীবন আমার মাথার উপর দিয়ে গেছে। ঈশ্বর সব বারই রক্ষা করেছেন, এবারও করবেন। আমার মন খাঁটি রয়েছে।

বড়দা উঠে গিয়ে মার চরণ বন্দনা করে বললেন—তাহলে লকু নিশ্চয় ভাল আছে, মা, তোমার মন যদি খাঁটি থাকে, তবে ভয় কিসের! বলেই তিনি বাইরে এসে স্বাহাকে বললেন—আমার একখানা কাপড়-গামছা ঠিক করে দাও। রাত সাড়ে দশটার ট্রেন এখনো পাওয়া যাবে। সকালেই পৌঁছে যেতে পারবো।

—আমি শুদ্ধ গেলে হোত না!—স্বাহা একবার মৃদু কণ্ঠে বললো।

—না—মার কাছে তোমরা থাক! আমি আগে দেখি, ব্যাপারটা কি।

কয়েক মিনিটের মধ্যে স্বাহা আয়োজন করে দিল যাবার। ইতিমধ্যে সেঁজুতি হাত ধুয়ে রান্নাঘরে ঢুকে ভাত, ডাল, আলুসেদ্ধ বেড়ে দিল বড়দার।

জন্য। বড়দা যা-হোক কয়েকগ্রাস মুখে দিয়েই উঠে পড়লেন। তারপর 'দুর্গা' বলে বেরিয়ে পড়লেন ; সঙ্গে সুবোধ, সেঁজুতি আর ভজু দরোয়ান।

ওঁরা বেরুনোর পর স্বাহা আবার তুলসী তলায় গিয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করলো—মার পেটের ভাইএর যায়গায় লকুকে আমি পেয়েছি, ভগবান, ওকে আমার বাবার অসমাপ্ত ইতিহাস রচনার জন্য বাঁচিয়ে রাখো।*

* * *

বড়দা বেরুলেন ষ্টেসনে ; সেঁজুতিদের বাড়ী এই পথেই পড়ে এবং সুবোধের দরজার সামনে দিয়েই যেতে হয়। নিজেদের বাড়ীর কাছে এসে সেঁজুতি নীরবে বড়দাকে প্রণাম করে ঘরে চলে গেল। সুবোধ আরো খানিক এগিয়ে এসে নিজের দরজার কাছ থেকে ভজু দারয়ানকে বললো—বড়দাকে ষ্টেশন পর্য্যন্ত আলো দেখিয়ে পৌছে দিয়ে আয়।—কালই একখানা 'তার' করে দেবেন বড়দা, লকুর খবর জানিয়ে—বড়দাকেও বললো!

—দেখি কেমন থাকে—বলে বড়দা এগিয়ে চললেন। ভজু দারয়ান আলো দেখিয়ে যাচ্ছে। সুবোধ নিজের দরজা থেকে কিছুক্ষণ দেখলো চেয়ে। তারপর বৈঠকখানায় ঢুকলো। বড়দাকে সে প্রায় গেথে এনেছে। আজই কাজ হাসিল হয়ে যেত, যদি এই আকস্মিক দুঃসংবাদটা না আসতো। কিন্তু এতে ভালই হয়েছে একরকম। ভাইএর অবস্থা দেখে বাংলার গুণ্ডাদলের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে কিছু দিব্য জ্ঞান লাভ হোক ওঁর। ইতিমধ্যে সুবোধ তার ডিরেকটারদের নামের তালিকায় বড়দার নাম ছেপে দেবে এবং খোকার নামে শ'দুই শেয়ারও রেখে দেবে। বড়দা নিশ্চয়ই আপত্তি করতে পারবেন না। আর কেনই-বা করবেন? সকলেই তো এই-ই করছেন। এ তল্লাটে বড়দার নাম আজ প্রায় গুরুর আসনে,—একবার ঐ নামটা দিয়ে প্রসপেক্টাস্ বের করতে পারলে টাকার আণ্ডি লেগে যাবে—সুবোধ হাসলো! ওর প্রতিষ্ঠিত কলোনীতে—, যেখানে পূর্ব্ববাংলার কয়েকজন এসে ইতিমধ্যেই বাস করছেন—সেখানে কাল

* হে মোর দুর্ভাগা দেশ, ১ম পর্ব্ব, মন্বন্তর

একবার যেতে হবে। ওঁদের মধ্যে বিস্তর ভাল কর্ম্মী আছেন, যাঁদের সাহায্যে সুবোধের কারখানা দুদিনে ফুলে উঠবে। আমেরিকার ফোর্ড সাহেব হয়ে উঠবে সুবোধ। হতেই হবে তাকে। অর্থ ছাড়া বিশ্বে বাস করার কোনো অর্থ হয় না। টাকা হয়েছে বলেই মার্কিণ আজ বিশ্বের অর্থনৈতিক ঐক্য সাধন করতে আসে—কোটি কোটি ডলার ধার দিয়ে পৃথিবীকে আয়ত্তে রাখতে চায়—বিরাট একটা প্রফিটের কোম্পানী খুলতে চায়। কিন্তু ওসব জটিল অর্থ নীতির বিষয় ভেবে অকারণ সময় নষ্ট না করে সুবোধ নিজকে আরো অর্থবান এবং আরো প্রতিষ্ঠিত করবার কথাই ভাবতে লাগলো।

—আছেন নাকি?—বলে এসে ঢুকলো ওগাঁয়ের মোড়লমশাই, যুদ্ধের সময় মিলিটারী সাপ্লাই দিয়ে যে বিস্তর টাকা রোজগার করেছে। মোহিত চাটার্জিকে মন্বন্তরের সময় যে চাল যুগিয়েছিল—নেতা সংকর্ষণের শ্মশানভূমি যার অনুগমনে হয়েছিল কলঙ্কিত। এত রাত্রে ওকে দূরগ্রাম থেকে আসতে দেখে সুবোধ অবাক হোল। অবশ্য অনেক বারই সে আসে নানা প্রয়োজনে; কিন্তু রাত্রে আসা এই প্রথম। সুবোধ শুধুলো,

—মোড়ল এত রাত্রে? খবর কি?

—আজ্ঞে, 'জিপ' একখানা কিনেছি! খবরও কিছু আছে! এ বছর আষাঢ় মাস পেরুলো, এখনো বৃষ্টি হোল না—নদীটা শুকনো খটখট্ করছে। জীপ দিব্যি চলে এল। বলতে বলতে মোড়ল বসলো একখানা খালি চেয়ারে। লোকটার মোশাহেবী করা ভালই অভ্যাস আছে—জানে সুবোধ—লেখাপড়াও মন্দ জানে না মোড়ল, অন্ততঃ তার বুদ্ধি ব্যবসায়ে বিশেষরূপ খোলে আর খোলে কূটনীতিতে!

—বেশ—আজকাল একখানা গাড়ী না থাকলে চলে না। তারপর, কি খবর?

—সাঁওতাল পরগনায় আদিবাসীদের মধ্যে খুব আন্দোলন চলছে, জানেন তো?

—শুনছি ঐ রকম খবর! এখনো বিশেষ কিছু জানি না।

—হ্যাঁ, চলছে। ওদিকে আমার কিছু সম্পত্তি আছে, আমার স্ত্রীর তরফ থেকে পাওয়া। মনে করছি, ঐখানে গিয়ে দু'দশ দিন কিছু বক্তিতে ঝেড়ে ওদের তরফ থেকে ইলেকশ্যানে দাঁড়ানো যায় না?—মানে, মন্ত্রী না হোক, মেম্বরও তো হওয়া যেতে পারে!

সুবোধ অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। এই নিতান্ত গ্রাম্য মণ্ডল, যার বিদ্যা বড় জোর থার্ড ক্লাস, সেও আজ মন্ত্রী হবার আকাঙ্খা পোষণ করে! কিন্তু কৃষক, প্রজা, মজদুরদের এরাই তো সত্য প্রতিনিধি; যদিও এ লোকটা এখন জীপএর মালিক—জমিদারীর মালিক—অতএব জনসাধারণেরও মালিক, অর্থাৎ প্রতিনিধি হতে ওর বাধাই বা কিসের? সুবোধ চেয়ারটায় ভাল হয়ে বসলো। জিজ্ঞাসা করলো,—ওখানে ইলেকশ্যান চলছে নাকি হে?

—চলছে, না হয় চলবে। সত্যি খোকাবাবু, টাকাকড়ি আপনাদের পাঁচজনের আশীর্ব্বাদে ভালই কিছু হয়েছে, এবার আপনাকে মনের কথাটি বলছি; একটুখানি নামযশ, একটুখানি পসার—কাগজে নামটাম বেরুনো—বড্ড ইচ্ছে করে—মোড়ল লজ্জার সঙ্গে অত্মপ্রত্যয়ের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

—তাতো হওয়াই উচিৎ! সকলেরই হয়। কিন্তু তোমার ইংরাজি বিদ্যে তো নেহাৎ কম, হিন্দিও জানো না—পরিষদে গিয়ে কথা বলবে কি করে?

—ওর জন্যে কি আটকায় খোকাবাবু? কি যে বলেন! মাইনে দিয়ে গোটাপাঁচেক প্রাইভেট সেক্রেটারী রেখে দিলেই হবে। ওরকম প্রায় সবারই থাকে। আর লেখাপড়া খুব না জানলেও "ইয়েস-নো" "আই প্রপোজ-আই সেকেণ্ড—" এসব আমি বলতে পারি। সেক্রেটারীদের লিখিয়ে নিয়ে সেটা পড়ে বলা বা মুখস্ত করে বলে দেওয়া কিছু এমন কঠিন নয় আমার পক্ষে।

সুবোধ চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। মোড়ল একটু ভেবে বললো,

—আপনি কেন দাঁড়াবেন না খোকাবাবু? নেক্সট্ ইলেকশ্যানে আপনাকে দাঁড়াতে হবে, এখন থেকে তার ফিল্ড তৈরী করুন আপনি।—হাসলো মোড়ল।

ওরকম আকাঙ্খা সুবোধের কিছুমাত্র কম নেই,—কিন্তু ঐ যে বড়দা,—ওঁকে ছাড়িয়ে এদেশে নেতৃত্ব করতে যাওয়া একান্ত অসম্ভব। তা'ছাড়া অসুবিধাও এতকাল ছিল যথেষ্ট। জেল না খাটলে নেতা হওয়া যেত না। এবার অবশ্য ব্যাপাবটা আলাদা রকম হবে এবং সুবোধ চেষ্টাও করবে।

—দেখি মোড়ল, ইলেকস্থানের এখন তো দেরী আছে। কিছুদিন আগে থেকে আরম্ভ করলে এই বঙ্গভঙ্গের সুযোগে হয়তো আরো পপুলার হতে পারতাম!

—ওর জন্যে ভাববেন না।—মোড়ল গালভরা হাসি হেসে বললো—ওরা আগে গেছেন, আগে পাবেন। তাতে কি! আপনি এখন নিজের প্রপ্যাগেণ্ডা চালান: ব্যাপারটার সবই হচ্ছে প্রপ্যাগেণ্ডার মহিমা!

নিজকে ইংরাজি ভাষায় অভিজ্ঞ জানাবার জন্য মোড়ল এত বেশী ইংরাজি কথা বলছে। সুবোধের হাসিই পাচ্ছিল, কিন্তু না হেসে শুধুলো,

—কি রকম প্রপ্যাগেণ্ডা করা উচিত, বলো তো মোড়োল।

—নানা রকম। প্রথমতঃ খবরের কাগজওয়ালাদের চাই-ই। প্রেসই হচ্ছে এযুগের প্রধান প্রপ্যাগেণ্ডার মিডিযম। ওর জোরে না হতে পারে, এমন কর্ম্ম নেই; নিদারুণ মিথ্যেকে একমাত্র এবং পরম সত্য বলে চালানো যায়। তারপর চাই দল গঠন, মানে, ঐ বড় দলেরই একটা ফ্যাকড়া বের করে নেওয়া—তাহলেই ভাল হয—যেমন লেফটিষ্ট, সোস্যালিষ্ট,—কমিউনিষ্ট। আরো কত-কি আছে; আপনি নিশ্চয় জানেন।

—বেশ বেশ—তারপর, আর?

—আর—নানা জেলায়, নানা প্রদেশে, এমন কি ভারতের বাইরেও কোনো কোনো বড় এবং বিখ্যাত লোকের সঙ্গে যোগ-সাজস রাখা চাই যারা মাঝে মধ্যে অকারণ আপনার সম্বন্ধে খবরের কাগজের মারফৎ আলোচনা করবে। আপনার ঔদার্য্যের কথা বলবে, আপনার বাণীর সারবত্তা তুলে দেখিয়ে দেবে জনসাধারণকে যে, আপনার মত মহান-উদার নেতা আর নেই।

সুবোধ ওর কথা শুনতে শুনতে মৃদু মৃদু হাসছিল। মোড়ল ফের বললো,

—শুধু তাই নয়, দুএকখানা ছোট খাট বইও বের করতে হবে আপনার বাণী দিয়ে, আপনার পরিকল্পনা দিয়ে, আপনার আদর্শ দিয়ে। ব্যস্,—মহামানব হতে দু'দিন দেরী হবে না। হাঃ হাঃ হাঃ!

মোড়লের হাসিটা আন্তরিক। সুবোধও হাসলো—বললো,

—তোমার বুদ্ধি খুবই তীক্ষ্ণ মোড়ল, জানতাম, কিন্তু এমন অসাধারণ, তাতো জানতাম না!

—আপনাদের চরণের আশীর্ব্বাদ—বলে মোড়ল আবার হাসলো—আমার বাবা ছিল গ্রাম্য কূটনীতির কর্ত্তা—যাকে বলে ভিলেজ-পলিটিক্স্; আমি তার ছেলে তো বটে! 'বাপকা ব্যাটা, সিপাইকা ঘোড়া, কুছ নেহি তবভি থোড়া থোড়া'—মোড়লের আত্মপ্রত্যয় আর আত্মপ্রসাদের সঙ্গে আত্মপ্রচারের চমৎকার সমন্বয় হচ্ছে। বর্ত্তমান বাজারে এ একটা মস্ত গুণ, নিজের গুণের কথা নিজে প্রচার। সুবোধ সস্মিত ঘাড় নেড়ে সায় দিল ওর কথায়। বললো,

—এখানেই খেয়ে যাবে মোড়ল।

—যে আজ্ঞে! প্রসাদ পাব! কিন্তু খোকাবাবু, আমার সব বুদ্ধি দিয়েও কয়েকটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না, আপনি একটু বুঝিয়ে দিন তো।

—বলো—বলে সুবোধ চাকরকে বাড়ীর ভেতর খবর দিতে বললো মোড়লের খাবারের ব্যবস্থা করতে।

—হ্যাঁ,—মোড়ল বলছে,—এক নম্বর হোল, ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেন্‌ডেন্স বিল পাশ হোল বিলেতে, কিন্তু আমরা নাকি পেলাম মাত্র ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্—তা হলে ওটা কি মার্কা ইন্‌ডিপেণ্ডেন্স? দু নম্বর—স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য আমরা পনরোই আগষ্ট উৎসব করবো, গান্ধীজিও উৎসব করতে বলেছেন, কিন্তু পঁচিশে কি ছাব্বিশে জুলাই উনিই আবার প্রার্থনাসভায় বললেন, "পূর্ণ স্বাধীনতা এখনো অনেক দূরে"—তাহলে এটা কোন্ অপূর্ণ স্বাধীনতা? তিন নম্বর, ভারতে আদি-কাল থেকে বাস করছে হিন্দু, তারপর যারা এসেছেন, তাঁরা হিন্দু যদি না হন তবে নিশ্চয় অহিন্দু ভারতীয় বা ভারতীয় অহিন্দু সম্প্রদায়। কিন্তু শোনা যায়

উল্টোটা—মুসলমান আর অমুসলমান। অর্থাৎ মুসলমানরাই যেন ভারতের আদি অধিবাসী; কিন্তু সত্যি, সংখ্যায়, প্রাচীনত্বে এবং প্রভাবে তাঁরা নিশ্চয়ই ভারতীয় মুসলমান।

তারপর আর একটা কথা, কংগ্রেস সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল—ইংরাজের ভাষায় দুই "মেজর পলিটিকেল পার্টি" বলতে অবশ্য কংগ্রেস আর মুসলেম লীগ বুঝায়। কিন্তু কংগ্রেস দাবী করেছেন হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, শিখ, পার্সী, সকলেরই নেতৃত্ব। আজ পাকিস্তান স্বীকার করে মুসলমানদের জন্য স্থান ছেড়ে দেওয়ার পর যাঁরা কংগ্রেসে রইলেন, তারা কি? হিন্দু, না অমুসলমান? যদি তাঁদের অমুসলমান বলেই গণ্য করা হয়, তবে যাঁরা নিজেদিকে হিন্দু, বা খৃষ্টান বা পার্শী বলে' অথবা অন্য কোনো ধর্ম্মী বলে' পরিচয় দেন—তাঁদের নেতাদের কেন আহ্বান করা হোল না?

সুবোধ হাসলো রহস্যময় হাসি। হেসে বললো—এ সব বুঝতে যেওনা মোড়ল; ওসব তত্ত্ব বুঝতে পলিটিক্সের পাতঞ্জল-ভাষ্যের দরকার হয়। অতশত বোঝবার সময়ও নেই আমাদের, ইচ্ছাও নেই! জেনে রাখ, ইংরাজ কিছু দিচ্ছে, আর এই সুযোগে যে যা পার, করে নাও!—চলো, খাওয়া যাকগে!

সুবোধ উঠলো—মোড়লও উঠলো। খেতে খেতে বাকি কথা হবে। কিন্তু অন্দরের দিকে যেতে যেতে বললো—বাংলা ভাঙ্গার জোয়ার তো জুড়িয়ে এল খোকাবাবু—এবার আর একটা কিছুতো করতে হয়। ওদেশে শুনছি "খুদিরাম—ডে" করছেন! আমাদেরও করলে হয় না?

সুবোধের মস্তিষ্কে অকস্মাৎ চিন্তার বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেল একটা! "খুদিরাম ডে—" ভারতের মুক্তি সাধনার অগ্রদূত খুদিরাম! মনে পড়লো ছোটবেলায় শোনা বাউলের গান…

বিদায় দে মা একবার ফিরে আসি,
অভিরাম যায় দ্বীপচালানে খুদিরামের ফাঁসী॥

পশ্চিমবঙ্গের বাউলরা এই গান গেয়ে বেড়াতো ঘরে ঘরে। দেশমাতাকে

যেন এই অপরাজেয় মুক্তিসাধক বলছেন—'আবার ফিরে আসবো মা, দিনকয়ের জন্য বিদায় দে···চিনেও যদি না চেন মা চিনবে গলার ফাঁসীর দাগ!'

কে জানে সেই বীর-বিক্রমকেশরী—বৃটিশ রাজের সেই বজ্রাদপি কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বী, সত্যিই ফিরে এসেছেন কি না আবার ভারতে! হয়তো এসেছেন—হয়তো, না এলেও ঊর্দ্ধ আকাশ থেকে দেখছেন সুবোধকে, সমগ্র বাংলাকে; সমগ্র ভারতকে। আজ দেশবাসী সেই বীরশ্রেষ্ঠ অগ্রজের তর্পণ করবে, তিনি নিশ্চয় তৃপ্ত হবেন।—কিন্তু···সুবোধ যেন নিজের উচ্ছ্বাসটা সামলে কি একটু ভেবে নিল—বললো,

—আমাদেরও করা উচিৎ; ওসবে অনেককিছু সুবিধে আছে, মোড়ল। কিন্তু আমরা অন্য কিছু করবো। নেতা সঙ্কর্ষণের সেই আখ্ড়াটা এখনো আছে তোমাদের গাঁয়ে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! ঘরখানা গত বছরের বৃষ্টিতে পড় পড় হয়েও আছে। তবে সেই ধোপানী রাণী তো নেই। ঘরটায় এখন শেয়াল থাকে রাত্রে; হ্যাঁ, গাঁয়ের ষাঁড়টা প্রায়ই বসে থাকে সেই তমাল গাছটার তলায়!

—আচ্ছা, ওতেই হবে! ঐ মহাবিপ্লবীর স্মৃতি-উৎসব করতে হবে আমাদের; নামও হবে—কামও হবে! রাণী থাকলে বড় ভাল হোত আজ। কিন্তু ওর মেয়েই তো রয়েছে—বড়দাদার স্ত্রী, স্বাগ বৌদি! লকুর খবরটা একটু ভাল পেলেই হয়।

—দেখলাম যে জামাইবাবুকে ষ্টেশনের পানে যেতে—মোড়ল বললো!

—হ্যাঁ, কলকাতা গেলেন। ওঁর ভাই লকুর অসুখ, কিম্বা হাঙ্গামায় আহত হয়েছে।

—তারপর আবার উনি গেলেন! কি মুস্কিল! কলকাতা কি আজকাল যেতে আছে?

সুবোধ ওকথার উত্তর না দিয়ে বললো—তুমি ঐ ঘরটা কালই মেরামৎ কর মোড়ল। উঠোনে দুচারটা ফুলগাছ লাগিয়ে দাও—আর তমাল গাছটার

কাছে, বেশ বড় করে একটা বেদী বাঁধিয়ে ফেল—কালই। আর, খুব জীর্ণ একটা ত্রিবর্ণ পতাকা পুরোনো একটা বাঁশের আগায় বেঁধে টানিয়ে দাও···সমবেত লোকদের বলা হবে, যে, এই কবছর আমরা এমনি করেই ওঁর স্মৃতিরক্ষা করছি। আজ সুযোগ পেলাম বলে সকলকে ডাকলাম! আর যা বলতে হবে, আমি ঠিক করে রাখবো!

—বেশ, কিন্তু কালপরশু লাগানো ফুলগাছগুলো যে লোকে ধরতে পারবে।

—না—নদীর কিনার থেকে বড় বড় করবী আর জবা গাছ মাটি সমেত তুলে নিয়ে পুঁতে ফেল। আমার ঘরে টবের উপর ঝাউগাছ আছে, বেলা, রজনীগন্ধা আছে, পাম, পাতাবাহারও আছে—তোমার জীপএ তুলে দিচ্ছি—গোপনেই কাজ করে ফেল, কালই!

—কিন্তু গাঁয়ের লোকরা ?···

—আরে দূর হোক গাঁয়ের লোক! লোক আনবো বাইরে থেকে। গাঁয়ের লোক সেই হুজুগেই মেতে থাকবে। তুমি বিশেষ বিশ্বস্ত লোক দিয়ে নেতা সঙ্কর্ষণের উঠোনে গর্ত্ত খুঁড়িয়ে রাতারাতি পুঁতে ফেলবে গাছগুলো—টবগুলো ভেঙে নদীর জলে ফেলে দেবে। আর কয়েকটা শুকনো মালাও ঐ বেদীতে রেখে দিতে হবে গাঁয়ের লোকদের দেখানোর জন্য। আমি কালই কাগজে নোটীশ ঝাড়বো "নেতা সঙ্কর্ষণ দিবস"—বুঝলে ?

মোড়ল হেসেই ঘাড় নাড়লো!

অতঃপর আরো কিছু গভীর পরামর্শ হোলে মোড়ল জীপে উঠলো গাছ নিয়ে। সুবোধ বললো—তোমার সাঁওতাল পরগণার মন্ত্রীত্ব আরো দিন কতক মুলতবী রাখ মোড়ল, এই বাংলাতেই তোমাকে আম মুৎসুদ্ধি বানিয়ে দেব।

—যে আজ্ঞে; আপনার চরণধুলো হয়েই রইলাম।—মোড়ল হেসে বিদায় নিল।

* * * *

গভীর রাত্রির শুদ্ধ অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে ভাবছিল সেঁজুতি। ঘুম নামছে

দেরী আছে ওর চোখে; হয়তো মোটেই ঘুম আজ নামবে না! লকু ওর আবাল্য সহচর—লকু ওর জীবনের বৃহত্তর অংশ অধিকার করে আছে—হয়তো চিরকালই থাকবে। বিবাহের দ্বারা লকুকে তার জীবনের সঙ্গে একত্র বন্ধন করবার কল্পনা সেঁজুতি করে না কিন্তু ওর মানসলোকে লকুই একমাত্র ছবি! সেঁজুতি লকুর কথাই ভাবছিল, তার অর্থই নিজের কথা। রবীন্দ্রনাথের "সেঁজুতি" বইখানা সেবছর কলকাতা থেকে কিনে এনে লকু উপহার দিল সেঁজুতিকে।

—তোর নামটা মহাকবি অমর করে দিলেন—রবীন্দ্রনাথের আঙুলের ছোঁয়ায় তুই আজ থেকে হলি "রক্তসন্ধ্যা"—লকু বলেছিল হেসে হেসে। সেঁজুতি উত্তরে বলেছিল—

—বেশতো লকুদা—সেঁজুতি হয়েই মহাকবির আশীর্ব্বাদ পেয়েছি। এবার প্রতি সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে সান্ধ্যদীপের সঙ্গে শঙ্খধ্বনি করে ডাক দেব…বলবো :—

"ঘরের মঙ্গল-শঙ্খ নহে তোর তরে .....
নহেরে সন্ধ্যার দীপালোক
নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ…

—তবে কি?—লকু সুধিয়েছিল।

সেঁজুতি বলেছিল—"বীরের এ রক্তস্রোত—মাতার এ অশ্রুধারা—
এর যত মূল্য সেকি ধরার ধূলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা—
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবেনা এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা—সে কি আনিবেনা দিন?"

—আনবে?—রাত্রির পর দিন আসেই! তুই সেঁজুতি হয়েই তপস্যা কর!—বলে লকু আশীর্ব্বাদ দিয়েছিল ওর মাথায়। আজ সেই লকু অসুস্থ—নাকি আহত—নাকি…না…না—সেঁজুতি উঠে বসলো—মনের উত্তেজনায়—চিত্তের আবেগে। এমন ওর কখনো হয় নাই। তারুণ্য-চঞ্চল মন যেন

আজ গভীর হয়ে, স্তব্ধ হয়ে, কোন্ এক নতুন বার্ত্তা জানাচ্ছে ওর কানে কানে—লকুকে না হলে ওর চলবে না—চলবেই না। লকু সূর্য্যের মত শত যোজন দূরে থাকলেও সেঁজুতি পদ্মের মত ফুটে থাকতে পারে? কিন্তু লকুর থাকা চাই। নইলে সেঁজুতির ক্ষীণ হাসির শিখা হয়তো রাত্রির অন্ধকারে ডুবে যাবে! না—না—না—কখনোই না।

"রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন—?" আনবেই। সেঁজুতি গভীর রাত্রেই দিনদেবের উদ্দেশে প্রণাম করলো—ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষ গুণৈকসিন্ধুং ভানুং সমস্ত জগতামধিপং ভজামি...মোটরের হর্ণ বাজছে! কে কোথায় এল! লকুদার কোন খবর নিয়ে কেউ এল নাকি? ছুটে বেরিয়ে এল সেঁজুতি বাইরের দরজায়—কিন্তু মোটরের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল নদীর দিকে। হয়তো সুবোধ কোথাও গেল কিম্বা আর কেউ। সেঁজুতি আবার ঘরে এসে শুলো—ওর চোখে রাত্রি জেগে আছে।

উত্তর কলিকাতার 'মহিলা-মণ্ডপ'। কৃষ্ণা এইখানেই আশ্রয় নিয়েছে এসে। এই মহিলা-মণ্ডলী মানুষের জীবনকে মহামানবত্বের নৈতিকতায় দীক্ষা দেয়—মানুষকে সাধারণ জৈব পর্য্যায় থেকে উন্নীত করে মানবত্বের পর্য্যায়ে আনাই এদের একমাত্র উদ্দেশ্য। মানুষের সৃষ্টিকর্ত্রী নারী, মানব-সমাজের গঠন-পালন-রক্ষণ কার্য্য নারীরই কার্য্য। তাই কতকগুলি সুশিক্ষিতা, মানব-সেবায় সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃতা মহীয়সী নারী এই মণ্ডলীর সভ্যা! এদের কর্ম্মচক্র সারা ভারতে, তথা বৃহত্তর ভারতেও বিস্তৃত। কিন্তু বর্ত্তমানে বাংলায় কেন্দ্রীভূত। অবশ্য পাঞ্জাবের ওদিকেও একটা বড় শাখা-আফিস ওদের রয়েছে, কিন্তু সেটি এখান থেকেই পরিচালিত হয়।

উৎপলা নাম্নী জনৈকা ধনবতী এবং মহীয়সী মহিলা ওদের নেত্রী; কিন্তু কৃষ্ণারও আসন প্রায় তাঁর নীচেই, যদিও কৃষ্ণা আইনসঙ্গতভাবে ওখানকার

নেত্রী নয়। কৃষ্ণা মাত্র বছর দুই হোল এখানে এসে যোগ দিয়েছে দূর এক পল্লীগ্রাম থেকে। কেন এসেছে, সেকথা এই কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নয়, শুধু এইটুকু জেনে রাখা দরকার যে নিজের আদর্শনিষ্ঠার অনিবার্য্য পরিণতিতেই সে এসে পড়েছে এখানে। কৃষ্ণা কুমারী এবং কমকান্তি বিশিষ্টা। তাকে দেখলে গল্পের সেই কেশবতী রাজকন্যার কথা মনে পড়ে, কিন্তু তার আদর্শ অশনির মত কঠোর।

বিদ্যা, বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতায় সে এই নারীমণ্ডলীতে যোগ্য স্থান অধিকার করেছে অতি অল্পদিনেই। এ সব ছাড়াও, তার সাহিত্যিক খ্যাতি দিনে দিনে বাড়ছে। সকালে বসে পার্লবাকের "গুড্ আর্থ" পড়ছিল কৃষ্ণা একা। ইংরাজি বইটাই পড়ছিল, বাংলা অনুবাদ ওর খুব পছন্দ নয়—পড়তে পড়তে ওর শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছিল,—পাশ্চাত্য জগতের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি খবর আমরা রাখি, কিন্তু প্রাচ্য জগতের কতটুকুইবা আমরা জানি! অথচ আমাদের সত্যিকার স্বাভাবিক সম্বন্ধ, সংস্কৃতিগত ঐক্য, অবস্থাগত বিপর্যয় এবং আদর্শগত সাম্য কত বেশী এই সব প্রাচ্যভূখণ্ডের মানুষের সঙ্গে! সুদূর অতীতের সেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের যুগ থেকে আমাদের সঙ্গে যাদের নাড়ীর যোগ, তাদের সম্বন্ধে আমরা কতটা ঔদাসীন! চীন, জাপান, বলিদ্বীপ, যবদ্বীপ, লঙ্কার ঘরের খবর আমরা প্রায় কিছুই রাখিনা। এক বিদেশিনী মহিলার লেখা পড়ে জানতে হচ্ছে আমাদের প্রতিবেশীর ঘরের খবর! এটা শুধু আমাদের লজ্জার কথা নয়, কূপমণ্ডুকতারও পরিচায়ক। ওদের কথা ভাল ভাবে জানলে আমাদের সাহিত্য অনেক বেশি পরিপুষ্ট হতে পারতো—হয়তো এমনি 'গুড্ আর্থ' কোনো বাঙ্গালী মেয়ের হাত দিয়েই বেরুতো—আশ্চর্য্য কি?

—কি ভাবছিস রে কৃষ্ণা? গুড আর্থ শেষ করলি?—উৎপলা এসে হেসে শুধুলো।

—না পলাদি—এ বই শেষ করা যায় না, এতে অনন্ত চিন্তার খোরাক রয়েছে।

—বেশ তো, খেয়ে মোটা হবি ; নতুন কি চিন্তার সন্ধান পেলি ওতে ?

—বিস্তর—কৃষ্ণা কথা বলতে গিয়ে আধ মিনিট থেমে রইল, তার উজ্জ্বল চোখ জ্বলছে—সব থেকে বেশি দেখছি—নারীরা সংসারকে, পুরুষ জাতকে আর নিজদিকে কিভাবে দেখেন—নারীদের মধ্যে থেকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী-সাহিত্যিক না জন্মালে তা জানা যাবে না। সাহিত্যকে আরো ব্যাপক করা, আরো বেশী প্রাণবান করা নারীদেরই কাজ, কারণ নারীই সত্যিকার শক্তি—সৃষ্টিশক্তি।

—যদিও সৃষ্টির অগ্নিকণা তাকে পুরুষেরই কাছ থেকেই নিতে হয়—বলে উৎপলা ব্যঙ্গ হাসলো।

—তা হোক—পুরুষ নিতান্ত নিরপেক্ষ ! একফোটা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ হয় তো সে এনে দেয় দাবানলের সৃষ্টিনাশা শক্তি থেকে, কিন্তু নারী তাকে প্রদীপের শিখায় পালন করে—প্রেমের দেউলে পরিপুষ্ট করে। নারী তাকে সৃষ্টি করে নতুন ভাবে—তার সৃষ্টিনাশা শক্তিকে করে সৃষ্টিপালনের ইন্ধন,—সভ্যতার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। নারীর হাতের ছোঁয়া না পেলে দাবানল হয় তো আজো দাবানলই থেকে যেতো, আর পুরুষ থাকতো পৌরুষ বর্জ্জিত পশু হয়ে—আলোকহীন আরণ্যক জীব হয়ে।

কৃষ্ণার কথা বলার একটা আশ্চর্য্য মিষ্ট ছন্দ আছে ; উৎপলা জানে, কৃষ্ণা নিজেই শুধু অসামান্য শক্তি-উৎস নয়, অন্যেরও উৎসমুখ খুলে দেবার শক্তি তার অসাধারণ।

—বেশ তো, তুই লেখ না একখানা বই ঐ রকম ধাঁজে—বলে উৎপলা আরাম করে বসলো।

—ধাঁজে নয় পলাদি—কারো ধাঁজে কিছু লেখার আমি প্রশংসা করি না—নিজেও লিখি না ; আমার বলবার কথা—নারী সংসারকে, সমাজকে, পুরুষকে আর তার নিজের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক নিষ্ঠাকে নিয়ে যে সাহিত্য রচনা করতে পারে, তার উচ্চতা পুরুষের সৃষ্টির মত আকাশ-স্পর্শী নাও হতে পারে, তার ব্যপকতা নিশ্চয় শ্যামল শস্যক্ষেত্রের মত বিস্তৃত হবে।

—যা পুষ্ট করে জীবনকে, তুষ্টি আনে অন্তরে, শান্তি জাগায় সংসারে! কি বল?

উৎপলা হাসছে মৃদু মৃদু—কৃষ্ণার ভাষা দিয়েই ও কৃষ্ণাকে ব্যঙ্গ করছে। কিন্তু কৃষ্ণা বলল,

—নিশ্চয়ই! তাই ঋষি সৃষ্টিকর্ত্রীকে বারম্বার নমস্কার করে বলেছেন—

'যা-দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ, পুষ্টিরূপেণ, শান্তিরূপেণ সংস্থিতা!'

উৎপলা গ্রাজুয়েট মেয়ে, কিন্তু সত্যিকার শিক্ষায় কৃষ্ণার হাঁটু অবধিও নয় সে! তাই সস্নেহ-বিদ্রূপবাণ হেনে তবে সহজ সুরে বললো—তোর মতলব কি? নতুন কিছু সৃষ্টি যদি করতে চাস তো কর—কিছু লিখছিস নাকি?

—না; লিখবার আগে তৈরী হতে হবে আমাকে। একবার ভারতের সব দিক আর বৃহত্তর ভারত, চীন, জাপান ঘুরতে হবে, পলাদি—আমাদের মহিলা-মণ্ডপ থেকেই তুমি ব্যবস্থা করে দাও, অবশ্য মহিলামণ্ডপের প্রয়োজনেই যাব আমি।

—বেশ তো, হবে। আমাদের কর্মচক্র তো দিনে দিনে বাড়ছে—তবে পনরই আগষ্ট ভারত স্বাধীনতা পাওয়ার পর সে ব্যবস্থা! কারণ, এখন ভারতের বাইরে ভারত-নারীর মর্য্যাদা হয় তো তেমন মর্য্যাদাজনক নাও হতে পারে। তাছাড়া, এখন নিজের দেশেই কাজ অসংখ্য, তোকে এসময় ছাড়তে পারি না কৃষ্ণা। এর মধ্যে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দিটাও শিখে নে, ভ্রমণের সময় কাজে লাগবে।

কৃষ্ণা চুপ করে রইল কয়েক মিনিট। তারপর বললো, আস্তে আস্তে,

—বাংলা ভাষা ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষা; অথচ বাংলা রাষ্ট্রভাষা হোল না—কেন যে হোল না—তা বোঝা দুষ্কর। ভারতের এই স্বাধীনতা লাভের অর্দ্ধেক আনন্দ আমার নষ্ট হয়ে গেছে পলাদি—আমার মনে হচ্ছে, বাংলাকে খর্ব্ব করা হচ্ছে অকারণে।

—বাংলাকে আরও অনেক কারণেই খর্ব্ব করা হচ্ছে—হবে। হবে বাঙ্গালীর

নিজের দোষেই—উৎপলা উত্তেজিত হয়ে উঠে পড়লো চেয়ার থেকে—বাংলার পাপ, বাংলার লোভ, বাংলার চরিত্র-দৌর্ব্বল্য শুধু নয়, বাংলার চাটুকারিতার পুরস্কার হচ্ছে। গোপাল ভাঁড়ের দেশ ঐটাই আয়ত্ত করেছে বহুদিন থেকে—ভঁড়ামী, ভাঁওতা, আর ভাগের পূজোয় ভট্‌চার্জ্জিগিরি—দুপয়সা বেশি দক্ষিণে পাওয়া যায় ওতে!

উৎপলা পুরুষ মানুষের মত পায়চারী করতে লাগলো বারান্দাটায়। ওর পায়ের চটির শব্দ প্রখর হয়ে উঠছে ক্রমশঃ—হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললো কৃষ্ণাকে,

—তুই ছেলেমানুষ, হয়তো খোঁজ রাখিসনা, গত পঁয়ত্রিশ সালে যখন পৃথক নির্ব্বাচন হবার আইন পাশ হয়, তখন বিলাতের 'টোরীপার্টি' বলেছিল মহা খুসীর সঙ্গে—

"বাংলার মাথায় মুগুর মারা গেল এবার। বাঙ্গালী হিন্দুর বঙ্গ-ভঙ্গ-রোধ আন্দোলনে জাগা জাতীয়তাবোধকে একদম সাবাড় করে দেওয়া গেল"। ঐ বিলের প্রতিবাদ করতে বাঙ্গালার মানুষ যখন বদ্ধপরিকর তখন কে তাকে বাধা দিয়েছিল, জানিস? এই দেশেরই মানুষ। তাদের অনেকেই আজ নেতা, পরিচালক, পরিত্রাতা!

—কিন্তু সে তো পুরোনো কথা, পিসিমি!—কৃষ্ণা কোমলস্বরে বললো!

—জাতির জীবনে ইতিহাস কখনো পুরোনো হয় না, কৃষ্ণা—পুরোনোকে ধরেই নতুন জন্মায়, যেমন পুরোনো ঠাকুরদার নাতী, নাত্নী জন্মায়; ঠাকুরদা তার অমর। সেই পৃথক এবং সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন আজ বাংলাকে ভাগ করে দিল দুই অসমখণ্ডে। রবীন্দ্রনাথ একদিন গেয়েছিলেন অখণ্ড বাংলার গান,

> "বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন,
> এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান!"

সেই বাংলাকে ভাগ করে আজ বাঙালী স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ছে—অন্ততঃ অর্দ্ধেককে বাঁচাতে পারবে, ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করছে। ওদিকে

এককোটির বেশি বাঙালী পড়ে রইল পাকীস্তানী বাংলায় ; তাদের বাঙালীত্ব বজায় থাকবে কি না ভগবান জানেন !

—বাংলা আবার জোড়া লেগে যাবে পলাদি—অন্ততঃ এই আশাই আমরা করবো ! এক ভাষা, এক সংস্কৃতি, শুধু ধর্ম্মের যে তফাৎ সেটা অস্থায়ী ! শিক্ষার মধ্যে দিয়ে সে প্রভেদ ভেঙে ফেলতে হবে আমাদের। প্রাচীন ঐতিহ্য উদ্ধার করে দেখাতে হবে, রামানন্দ, কবির, দাদু, নানক, রবিদাস, কেউ হিন্দুকুলে, কেউবা মুসলমানকুলে জন্মে এই ধর্মের মিলন-সেতু রচনা করে গেছেন ; —শাস্ত্রাচারের এবং লোকাচারের অতীত যে প্রেমধর্ম্ম তাই প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন তাঁরা। কবিরের সাধনার নাম "ভারতপংথ", তার অর্থই ভারতীয় নানা সাধনার ঐক্য। মুসলমান বংশজাত মহাসন্ত দাদু বিরোধের দিনেই বলেছিলেন—

হিংদু মারগ কহৈ হমারা তুরুক কহৈ রহ মেরী।
কিস পংথ হৈ কহো অলহকা তুম তো ঐসা হেরা॥

হিন্দু বলেন আমার পথ সত্য, তুরুক বলেন আমার পথই সত্য, বলতো ভাই, আল্লার পথটি কি ?

দাদূ দুন্যু ভরম হৈ হিংদু-তুরক গবাঁর।
জে দুহুবাঁ থৈঁ রহিত সো গহি তত্ত্ব বিচার॥

—অর্থাৎ…

—তোর পাণ্ডিত্য রাখ কৃষ্ণা, দাদু কবিরের কথা এতকাল কেইবা শুনেছে, আবার আজইবা কে শুনবার জন্য বসে আছে ! সাহিত্য করছিস, কর— আজকালকার রাজনীতি বড় ভয়ঙ্কর জিনিষ ; এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি নিরীহ সাহিত্যিকের না করাই ভাল—বাংলার আবার জোড়া লাগার স্বপ্ন যদি সত্যি হয় তো গোটা ভারতের জোড়া লাগার স্বপ্নও সত্য হবে—কিন্তু সে স্বপ্ন আজ শুধু স্বপ্নই—সত্য হবার সম্ভাবনাটাও স্বপ্ন বলেই মনে হয়।

উৎপলা আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলো যেন। কৃষ্ণা বুঝতে পারছে, মনের কোনো বিশেষ তারে ঘা পড়ায় উৎপলার প্রাণতন্ত্রী এমন ঝঙ্কার দিচ্ছে।

—বাঙালীর জাতীয়তা এই বঙ্গভঙ্গকে আশ্রয় করে আবার খুবই চাগিয়ে উঠেছে, কিন্তু তুই জেনে রাখিস কৃষ্ণা—এমন ভুলো জাত আর নেই—এমন স্বার্থপর জাতও নেই বোধ হয়। উনবিংশ শতকের বিশ্ববন্দিত বাঙালী,—ভারতের জাতীয়তা আর মুক্তিযজ্ঞের পুরোহিত বাঙালী—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল জাতির কোহিনুর বাঙালী আজ কোথায়—দেখছিস্? ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে আজ বাঙলার প্রতিনিধিত্বের জন্য আবেদন করতে হয়—বাঙলার ঘরোয়া ব্যাপারে বাইরে থেকে মধ্যস্থতা করবার জন্য লোক আসে—বাঙলার নেতৃত্বের টিকি বাঁধা থাকে, যেখানে কোনো বাঙালী নেই। হাজার দলে বিভক্ত বাঙলা খণ্ডিত হয়ে গেল, আর আমরা উৎসব করছি। সওয়াকোটি ভাইবোন বিচ্ছিন্ন হোল, আর আমরা উৎসব করবো—মৃত্যুর মত্ততায় বাঙলা মরণোন্মুখ, আমরা উৎসব করবো !—দম নেবার জন্য থামলো-যেন উৎপলা; কৃষ্ণা নির্ব্বাক বসে শুনছে ওর সুতীব্র কথা গুলো।

—সব যোগ্যতা থাকা সত্বেও বাঙলাভাষা রাষ্ট্রভাষা হোল না—বাঙালী চেষ্টা তো করলোই না, উপরন্তু বাঙলার বিখ্যাত সন্তানগণ হিন্দিভাষার প্রচার কার্য্য চালিয়ে নাম কেনেন! এই দুর্ভাগা দেশের দুর্ভাগ্যের শেষ হতে দেরী আছে কৃষ্ণা… রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রার্থনা কর—

"নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি পিতঃ,
বাঙালীরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত"—

যে স্বর্গ হবে তাঁরই কথায় "মৃত্যুর মূল্যে আর দুঃখের দীপ্তিতে গড়া"—মরণোত্তর বাঙলা আনবে সেদিন নব ভারতের নবজীবন।

—বাঙলা তো আজ সত্যি মরণোত্তর পলাদি—মরতে মরতে বেঁচে গেছি আমরা। এইবার এই স্বাধীনতার নূতন আলোয় বাঙালীর ভাষাকে অন্ততঃ

বিশ্বে প্রচার করবো। বাঙালী আজ অন্য সবদিকে দীন হলেও তার ভাষা আজও ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষা,—এ সত্য অস্বীকৃত নয়।

—স্বীকৃতিটা নিতান্তই মৌখিক কৃষ্ণা। মনীষী রামানন্দ একবার দুঃখ করে বলেছিলেন,—"বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা সম্বন্ধে কংগ্রেস আমল দেন না। ভারতবর্ষে এমন কোনো ভাষা নাই যাহার সাহিত্যে বাংলা সাহিতের অনুবাদ হয় নাই। বাংলা সাহিত্যের অনুমতি না লইয়াই অনেকে ইহা করিয়াছেন। আমাদের সব কিছু তাঁহারা লইবেন, কিন্তু বাঙলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া স্বীকার করিবেন না! গুজরাটী, মালয়ালাম, তামিল, তেলেগু, হিন্দি সব ভাষায় বাঙলা সাহিত্যের অনুবাদ হইয়াছে এবং পরোক্ষভাবে বাঙলাভাষার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে···কয়েক কোটি লোক হিন্দিতে কথা বলে, কিন্তু সব জায়গার হিন্দি একরকম নহে। খাস বিহারে তিন রকম উপভাষা আছে—মৈথিলী, ভোজপুরী ও মগাহি। গোরক্ষপুর হইতে বেনারস পর্য্যন্ত ৮টি জেলায় বিভিন্ন রকমের বিহারী ভাষা, প্রচলিত... মৈথিলী লিপি ও বাংলা লিপি এক। এই সকল ভাষা ও বাংলা ভাষা অনায়াসে এক হইয়া যাইতে পারিত। আসামের অক্ষর বাংলা ভাষার সঙ্গে মূলতঃ এক।...কয়েক শতাব্দি আগেও উৎকলের লোকেরা কেহ কেহ বাংলা অক্ষরে পুঁথী লিখিয়াছেন। অসমিয়া ভাষা, ওড়িয়া ভাষা, বিহারী ভাষা, এই তিনটি ভাষা কি কারণে এক হইল না বলিতে গেলে রাজনীতির কথা আসিয়া পড়ে।···বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার লোক যদি আমাদের সাহিত্য পাইতেন, তাহা হইলে লাভবান হইতেন এবং আমরা তাঁহাদের সঙ্গে মিলিয়া বড় সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিতাম···।" —রামানন্দ বাবুর মত কঠোর লেখনী সংযম বোধ হয় বাংলার কোনো লেখকের ছিল না,—তাঁর মত লোকের লেখনী থেকে একথা বড় কম দুঃখে বের হয়নি কৃষ্ণা—আশা নেই, বাঙালীর সূর্য্য অস্ত গেছে!

—ছিঃ! পলাদি, এরকম অলুক্ষুণে কথা বলতে নেই ভাই—কৃষ্ণা সস্নেহ

প্রতিবাদ জানালো। কবি বলেছেন—"মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারী নিয়ে করি ঘর।" বাংলা ভারতের প্রাচ্য ভূমি! সূর্য্যদেব আগে প্রাচ্যভূমি বাংলার আকাশে উঠবেন, তবে সারা ভারতে উঠবেন। বাংলার সূর্য্য কখনো অস্ত যেতে পারেনা পলাদি, নিত্য তাঁর নব অভ্যুদয় হয়—'উদার, তিমির-বিদারী'।

—তোর কাব্যিকথা রেখে দে কৃষ্ণা, ওর কোনো দাম নেই। কাব্য মাত্র কয়েকজনের জন্য। যিনি গেয়েছেন—"আ মরি বাংলা ভাষা, মোদের গরব মোদের আশা"—ক'জন সেই অতুলপ্রসাদকে আজ মনে রাখে বলতে পারিস? "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" বলে যিনি কেঁদেছেন, ক'জনার মনে আছে সেই রঙ্গলালকে! কালিপ্রসন্নর কথা ক'জন জানে যিনি গম্ভীর সুরে বলেছেন "মাগো যায় যেন জীবন চলে—শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে বন্দেমাতরম বলে—" কে মনে রাখে জাতীয় মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলালকে, যাঁর কল্পনায় ভারতমাতা বিশ্বজননী; যাঁর—

"উপরে গগনে ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা চন্দ্র,
মন্ত্রমুগ্ধ চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদ মন্দ্র।
শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীট, সাগর উর্ম্মী ঘেরিয়া জঙ্ঘা,
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার, পঞ্চ সিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
উপরে জলদ হানিয়া বজ্র করিছে প্রলয়-সলিল বৃষ্টি
চরণে তোমার কুঞ্জকাননে কুসুম গন্ধ করিছে সৃষ্টি—॥

এই অপরূপ রূপকার মহাকবিকে কার মনে আছে কৃষ্ণা? বঙ্কিম স্মরণে আছেন বন্দেমাতরমের দৌলতে আর রবীন্দ্রনাথ আছেন তিনি না থাকলে বাঙ্গালীর কিছুই থাকে না বলে! তিনি আছেন বাঙ্গালীর প্রতি কথায়, প্রতি উচ্চারণে; তাই তাঁকে ভোলা সম্ভব হচ্ছে না! যে সংস্কৃতি ধারা রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথে এসে বিশ্ববিজয়ী হোলো, তারই খবর ক'টা লোক রাখে? সংস্কৃতির কথা শুনলে লোকে রূপকথা মনে করে—অতীত ইতিহাসকে উপহাস করে,

বেদপুরাণকে বলে গঞ্জিকার গুণবত্তা, কাব্যকে বলে অলস-বিলাসীর অবশ্য-প্রয়োজনীয় খাদ্য ;—এরকম মানুষই তো বেশি !

—তা হোক পলাদি—সাহিত্য চিরদিনই স্বপ্নের জন্য ; কিন্তু সেই স্বপ্নই মহান, সেই স্বপ্নই মৃত্যুহীন। তাঁদের নিয়েই মরণোত্তর বাংলা তার সাহিত্যের মধ্যে অমরত্ব পাবে—এই হোক আমাদের সাধনা !

—হোক—বলে উৎপলা যেন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লো। একটু থেমে বলতে লাগলো,

—ইংরাজের দেশে লোক বাস করে পাঁচ-সাত কোটি কিন্তু ইংরাজিভাষায় কথা কয় কুড়ি কোটির কম নয়—কেন জানিস ? কারণ, ওরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে, আর যেখানে গেছে, সঙ্গে নিয়ে গেছে ওদের সাহিত্য। ভাষা প্রচারের সব থেকে বড় উপায় হোল, দেশ জয়, উপনিবেশ স্থাপন, আর বাণিজ্যবিস্তার। প্রচীন ভারতের ইতিহাস পড়ে দেখিস, ভারতীয় সংস্কৃতি কি ভাবে জাভা, সুমাত্রা বোর্ণিও, চীন, জাপান, তিব্বত দেশে গিয়েছিল। দেশ জয় করে, জোর করে ভারত কোনোদিন কারো উপর ধর্ম্ম বা সংস্কৃতি বা ভাষা চাপায় নাই কৃষ্ণা—প্রেমের বন্ধনে, বাণিজ্যের প্রসারে আর ধর্মের উদারতায় ওঁরা নিজেরাই এসে গ্রহণ করেছিলেন ভারতের ভাষা, ভারতের সংস্কৃতি।

—আজ ভারতের এই নবস্বাধীনতার তরণী বেয়ে আবার আমরা প্রেমের বন্ধনে. ধর্মের ঔদার্য্যে, বাণিজ্যের ব্যাপকতায়, ভাষা আর সংস্কৃতি প্রচার করবো পলাদি ! বাঙালীকে এবার ব্যবসায়ী হতে হবে, দেশে দেশে যেতে হবে, উপনিবেশ স্থাপন করতে হবে—তাছাড়া, বাঙালীমেয়েদের এবার বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ় করবার জন্য উদার হতে হবে, ছুঁৎমার্গ ছেড়ে, অন্যের ধর্ম্ম এবং আচারকে উদার দৃষ্টিতে গ্রহণ করে, অন্য দেশ বা জাতি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে, বাঙালীর মেয়েকে সৃষ্টি করতে হবে সমাজ, সংসার এবং সাহিত্যও।

—করতে পারিস—ভালই ! বলে উৎপলা যেন কিছুটা আনমনা হয়ে গেল।

কৃষ্ণাও চুপ করে কি ভাবছে। কলকাতায় কিছুদিন শান্তি থাকার পর আবার দিন কয়েক থেকে হাঙ্গামা আরম্ভ হয়েছে। মহিলামণ্ডলীর কাজ এসময় খুব বেশি। আহতের সেবা, বিপন্নের নিরাপত্তা তো তারা দেখেই—বিভিন্ন পল্লীতে গিয়ে বাড়ী বাড়ী মেয়েদের নৈতিক সাহস রক্ষার জন্য ওরা বক্তৃতা করে—একতার জন্য আবেদন জানায় আর অত্যাচারিত শিশু বা আততায়ীর হাতে লাঞ্ছিতা কন্যা-বধূকে স্ব-সমাজে ফিরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে। ওদের কাজের প্রশংসা প্রতিদিন কাগজে বের হয়। আজও দুদল বের হয়ে গেল। কৃষ্ণাও যাবে, কাপড় বদলাতে যাচ্ছে, হঠাৎ ঝিন্‌ঝিন্‌ করে টেলিফোন বেজে উঠলো। ত্বরিতে কৃষ্ণা গিয়ে ধরলো—হ্যালো, কে?

—হাঁসপাতাল থেকে বলছি। লোকাধীশ নামে এক ভদ্রলোক, খুব সম্ভব লেখক লোকাধীশ—কাল অজ্ঞান হয়ে যান আততায়ির আঘাতে। এম্বুল্যেন্সে এখানে আনা হয়। আজ জ্ঞান হওয়ার পর মাত্র দুটি কথা তিনি বলতে পেরেছেন,—'কৃষ্ণা, আর মহিলামণ্ডপ',—আপনাদের ওখানে কৃষ্ণা নামে কেউ আছেন কি?

—হ্যাঁ, আমিই কৃষ্ণা—কৃষ্ণার হাত কাঁপছে উদ্বেগে—তিনি কেমন আছেন?

—আবার অজ্ঞান হয়ে গেছেন। মাথায় আঘাত, তবে বেঁচেও যেতে পারেন। আপনি কি আসবেন?

—হ্যাঁ, এখুনি যাচ্ছি।

ফোন ছেড়ে কৃষ্ণা সব কথা বললো উৎপলাকে। শুনে, আর ওর মুখের অবস্থা দেখে উৎপলা বললো—ভালোবাসা সেবিকার ধর্ম্ম কৃষ্ণা, কিন্তু প্রেমে পড়া ধর্ম্ম নয় তার। সাবধান! লোকাধীশের জীবন মূল্যবান, কিন্তু প্রতিদিন অজস্র মূল্যবান জীবন নষ্ট হচ্ছে এই আহবে। যদি বাঁচে সে, ভালই—না বাঁচে, অমন হতাশ চোখে চাইবার কিছু নেই। চল—দেখে আসি।

কৃষ্ণা লজ্জিত হোল, কিন্তু কিছুই বললো না। তার মুখ চোখের উদ্বেগ

যে প্রেমে পড়ার জন্য নয় একথা বললো না কৃষ্ণা, ; বললে হয় তো পলাদি বিশ্বাস করবে না। নীরবে এসে গাড়ীতে উঠলো দুজনে।

পথ বিপজ্জনক, যদিও ওদের কারফিউ-পাশ আছে। বিশেষ সাবধানেই যেতে হোল। গাড়ীতে কৃষ্ণা কোনো কথাই কইল না। উৎপলার দৃঢ় ধারণা হচ্ছে, কৃষ্ণা নিশ্চয় লোকাধীশকে ভালোবাসে। বিচিত্র কিছুই নয়, লোকাধীশ সুন্দর, শিক্ষিত এবং সাহিত্যিক। কৃষ্ণাও সাহিত্য ক্ষেত্রে নাম করছে ক্রমশঃ। তার চেয়ে বড় কারণ, লোকাধীশই একদিন কৃষ্ণাকে এই মহিলামণ্ডপে এনেছিল। ওদের হযতো পূর্ব্ব থেকেই পূর্ব্বরাগ আছে। উৎপলা ভাবছিল; সত্যি যদি লোকাধীশ না বাঁচে, তবে কৃষ্ণার জীবন বড়ই দুঃখময় হবে। প্রথম জীবনের প্রেম মানুষ সহজে ভুলতে পারে না।

কৃষ্ণা ভাবছিল, লোকাধীশ সাহিত্যিক—তার মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা বিকাশের কৃষ্ণা আশা করে, তা কি এত অল্পকালের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যাবে! লোকাধীশ যে সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে স্বদেশকে স্বর্গ করে তুলতে চায়—সাম্য মৈত্রীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তার লেখনী বজ্রগর্ভ, তার শাণিত বাণী বিদ্যুতের কশাঘাত করে জাতির মনশ্চেতনায়। ঐ আশ্চর্য্য প্রতিভাধর একদিন কৃষ্ণাকে বলেছিল—জাতির অন্ধকার দিনের ইতিহাস সে উদ্ধার করবে, সে অগ্নির অক্ষরে লিখে যাবে এই দুর্ভাগা দেশের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস—কাউকে ক্ষমা করবে না—কারও তোষামোদী করে সে সত্যের অপলাপ করবে না। দীর্ঘদিনের একনেত্রীত্বের অজস্র ভুলে কেমন পরে একটা বীর জাতি ক্লীব হয়ে গেল, কেমন করে ভেদ-বিভেদ-বিদ্বেষ-বিষ মানুষকে মৃত্যুর পথে এনেছে—শাসক-শক্তির সঙ্গে যোগ-সাজস করে কিভাবে এই দেশেরই মানুষ এই হতভাগ্য দেশটাকে নিবীর্য্য, নিস্তেজ খোলসে পরিণত করেছে—সে লিখে যাবে—তার উপাদান সংগৃহীত আছে। সেই সব পরিকল্পনা কি তার নষ্ট হয়ে যাবে? কৃষ্ণার সাহিত্য-গুরু লোকাধীশ। লোকাধীশ না বাঁচলে কৃষ্ণার সাহিত্য-সাধনাও হয়তো এইখানেই বন্ধ হয়ে যাবে।

দুজনে এসে পৌঁছালো হাসপাতালে। ওদের দুজনেই পরিচিতা এখানে। ভেতরে গিয়ে দেখলো, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা লোকাধীশ অজ্ঞান ;—উৎপলা শুধুলো, —জ্ঞান হচ্ছে তো মাঝে মাঝে ?

—হ্যাঁ, কাল আসার পর থেকে অজ্ঞান ছিলেন। আজ দুবার জ্ঞান হয়েছে। আঘাত গুরুতর হলেও শরীর বলিষ্ঠ আর মাথার আঘাতটা মারাত্মক হয়নি—বেঁচে যাবেন!

কৃষ্ণা ঈশ্বরের উদ্দেশে হাত তুললো। দেখতে পেয়ে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার নিকট-আত্মীয় উনি—কেমন ?

—হ্যাঁ—আমার দাদা! কৃষ্ণা বললো। উৎপলা জানতো না। জনান্তিকে শুধুলো,—সত্যি নাকি রে, কৃষ্ণা ?

—হ্যাঁ—সোদর ভাই নন—তবে ভাই-ই। উনিই তো আমাকে মহিলা-মণ্ডপে দেন।

বলে কৃষ্ণা বসলো লোকাধীশের বিছানায়। কেমন করে এই ঘটনা ঘটল, ডাক্তার কিছু জানেন না ; উৎপলাকে তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। কৃষ্ণা বললো—আমি কিছুক্ষণ থাকতে চাই পলাদি—ওদিকে হাঙ্গামা খুবই চলছে সহরে। তুমি যাও, আমাদের মণ্ডলীর কাজ যেন বন্ধ না হয়!

—বেশ,—থাক—উৎপলা চলে এল। তার অনেক কাজ। মেয়েদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য ওরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে গিয়ে তাদের সঙ্ঘবদ্ধতা শিক্ষা দেয়—নির্ভয় হতে বলে—নৈতিক শক্তি বাড়িয়ে তোলে। জনশূন্য পথ ; দিনের বেলা এশিয়ার সর্ব্ব বৃহৎ সহরের রাজপথ জনশূন্য! মানুষের সভ্যতার এই যে গ্লানিকর কলঙ্ক—এ ক্ষালন হবে কি দিয়ে ? কোনো গঙ্গার জল একে পবিত্র করতে পারবে কি ? সপ্ত সিন্ধুর সলিলরাশি একে ধৌত করতে পারবে কি ? উৎপলা ভাবতে ভাবতে ফিরছে। ভারতের শান্তিময় মহাবাণী বহন করে দেশে দেশে ছড়িয়ে দেবে—এই আশায় সে তার মহিলা-মণ্ডপ স্থাপন করেছে—নারীর মধ্যে সাম্য প্রীতি মৈত্রীর বিকাশ করে

সে নরের মহত্ত্ব জাগাবার জন্য জীবন পাত করবে—কিন্তু কেমন করে হবে? পৃথিবী আজো তেমনি হিংসা-পঙ্কিল; তেমনি কূটিল-ক্রুর! মানবত্বের মহাবাণী শুনবে কে? যেটুকু শোনে, সেটুকু শুধু তার কূট-নীতির প্রয়োজন সাধনের জন্যই। পৃথিবীর মহামানবদের বাণীকে স্বার্থপর সমাজগত মানুষ চিরদিন স্বস্বার্থ সাধনোদ্দেশেই প্রয়োগ করে এসেছে প্রয়োজন বুঝে। ব্যাপক ভাবে কেউ তাকে মানব-কল্যাণে কখনো প্রয়োগ করেনি—তাই পৃথিবীর বুকে অনন্ত মহামানবের আগমন ব্যর্থ হয়েছে। হাজার বছর ধরে হিন্দু মুসলমানের পাশাপাশি বাস আজও তাদের মধ্যে ঐক্য আনতে পারলো না, অথচ কত না মহামানব, হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবির্ভূত হয়ে মানুষের ভ্রাতৃবন্ধনকে জাগ্রত করবার মহাবাণী ঘোষণা করে গেছেন। মনে পড়লো, মুসলমান দাদুর কথা,

দাদু—হিংদু তুরককা দ্বৈ পথ পংথ নিবারি।
সংগতি সাচে সাধকী সাঙ্গ কোঁ সংভারি॥

দাদু—হিন্দু মুসলমানের দলাদলির পথ ছেড়ে দিয়ে সত্য সাধকের সঙ্গ লাভ কর।

ন তঁহা হিংন্দু দেহুরা ন তঁহা তুরকা মসীতি।
দাদু আপৈ আপ হৈ নহি তঁহা রহ রীতি॥

সেখানে হিন্দুর দেউল নাই, মুসলমানের মসজিদ নাই সেখানে তিনি আপনার মধ্যেই আপনি বিরাজিত।

কিন্তু এসব ভেবে কোনো লাভ নেই। উৎপলা চিন্তাটাকে উড়িয়ে দিল মাথা থেকে। ভাবতে লাগলো,—ভারত আজ যতটুকু স্বাধীনতা পাচ্ছে, তাতে পৃথিবীর জাতিসঙ্ঘে সে নিশ্চয় ঠাঁই পাবে। ঠাঁই পাবে নিশ্চয়ই। ইন্দো-নেশিয়ায় ডাচ আক্রমণের প্রতিবাদ করে জহরলালজী আজ বলতে পারছেন,—"No European Country whatever it might be has any business to use its army in Asia..."

সত্যই ; গণতন্ত্রের এই প্রতিষ্ঠার দিনে ইউরোপের কি অধিকার আছে এমন করে যবদ্বীপের উপর হানা দেবার ? ইউরোপ নিতান্তই শোচনীয় ভাবে অক্ষম হোল পৃথিবীতে সাম্য মৈত্রী-প্রীতির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে। এখন সেই দায়ীত্ব এসে পড়েছে এশিয়ার উপর, বিশেষ করে ভারত আর চীনের উপর। প্রাচীনতম ভারত, সুপ্রাচীন চীনের সঙ্গে একত্র হয়ে পৃথিবীকে মুক্তি দেবে এই বর্ব্বর যুদ্ধ-লিপ্সা থেকে—যদি না দিতে পারে, তবে ভারতের আজকার এই মুক্তি-উৎসবের কোনো অর্থ নেই !

উৎপলা ঠোঁট কামড়ে ধরলো দাঁত দিয়ে—নিশ্চয় দেবে—ভারতই চির দিন মানুষের মুক্তির পথ দেখিয়েছে, কি আধ্যাত্মিক কি আধিভৌতিক ! আজও দেখাবে। কিন্তু কেমন করে—কোন্ পথে, সেইটাই ঠিক করতে হবে বর্ত্তমান ভারতীয় নেতৃবর্গকে।—অখিল ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের অধিবেশন হচ্ছে—উৎপলা যোগদান করতে যাবে—ও গিয়ে বলবে, বর্ত্তমান পৃথিবীর নিদারুণ নৈতিক সংকটের এই বিপর্য্যয়কর দিনে নারীর কর্ত্তব্য কি ? নারীকে আজ পুরোভাগেই দাঁড়াতে হবে। এতকাল পৃথিবীটা পুরুষেই চালিয়ে এসেছে, আজও চালাচ্ছে—চালাচ্ছে শুধু নারীর রক্তপুষ্ট স্নেহের সন্তানদের হত্যালীলা। পুরুষ কোনোদিন এই হিংস্রবৃত্তি ত্যাগ করবে বলে মনে হয় না। পুরুষ-গঠিত এই পৃথিবীকে এবার নারী নিজের হাতে গড়বে—নবজীবন দেবে—হত্যাকে সে ঘৃণা করতে শেখাবে—যুদ্ধকে সে অতীত যুগের বর্ব্বর ইতিহাসের পাতায় ঠেলে দেবে—মাতৃত্বের মহিমায় নারী এবার গড়বে তার মহত্তম সন্তানকে, যে সন্তান হবে শান্তির উদ্গাতা নরদেবতা।—এই কাজের সর্ব্বপ্রধান দায়িত্ব ভারত-নারীর ; উৎপলা কি এ কাজের নেত্রীত্ব করতে পারবে ? কিন্তু উৎপলা না পারে, যোগ্যা নারীর অভাব ভারতে নেই ! পৃথিবী থেকে পাপের বর্ব্বরতা পুরুষ কোনো দিন ঘোচাতে পারলো না—নারী পারে কিনা দেখতে হবে। আপন সৃষ্টির মহিমাকে নারী আর কিছুতেই এমন নিষ্ঠুর ভাবে যুদ্ধহত দেখতে চায় না !

কিন্তু একি সম্ভব ? উৎপলা যেন নিজের আকাশ-কুসুম রচনার স্বপ্নে

নিজেই নির্ব্বোধের হাসি হাসলো! কিন্তু আবার তার মনে হোল, নারী যদি একাজ করতে না পারে, তাহলে জগতে সে শুধু মানুষ সৃষ্টির একটা যন্ত্র মাত্র। কিন্তু সত্যি কি তাই? এই বিশ্বের বিপ্লবের বহ্নিশিখায় নারীর ব্যক্তিগত এবং সমাজগত ক্ষতি যত বেশি হচ্ছে, এত আর কার হচ্ছে? কেন নারী নীরবে সহ্য করবে পুরুষের এই অত্যাচার! চিরদিন তাকে দুর্ব্বল করে রাখা হয়েছে, দুর্ব্বলা আর অবলা বলে। ওদের মুখের কথাতেই নারী অবলা দুর্ব্বলা হয়ে আছে। তার সত্য স্বরূপ প্রকাশ পাবার পথে ঐ অসত্য কথা দুটি হয়ে আছে অচলায়তনের মত দুর্লঙ্ঘ্য। কিন্তু দিন এসেছে—নারী এবার আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করবে পুরুষের এই হিংস্র যুদ্ধ-লিপ্সার বিরুদ্ধে।

উৎপলা বাড়ী পৌঁছাল।

কৃষ্ণা বসে আছে লকুর শয্যাপ্রান্তে; অজ্ঞান লকু,—হয়তো জীবনের আশা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। কে জানে, লকু আবার কোনোদিন সবল-সক্ষম হয়ে উঠে দাঁড়াবে কিনা! কেন এমন হোল—কে আঘাত করলো লকুকে, কৃষ্ণা কিছুই জানে না! লকুর বাড়ী-ঘর, আত্মীয় পরিজন সম্বন্ধেও সে খুব বেশি জানে না। শুধু জানে তার মা, দাদা—বৌদি আর একটি ভাইপো আছে। কিন্তু তাদের সকলের নাম বা বাড়ীর পুরো ঠিকানা ওর জানা নেই। আদর্শের সন্ধানে অকস্মাৎ কৃষ্ণা একদিন কলকাতায় এসে পড়েছিল; অকস্মাৎ লকুর সঙ্গে তার আলাপ হয় এবং আদর্শগত মিলনের জন্য ওদের বন্ধুত্ব হয় গভীর। সেই থেকে লকু হয়েছে কৃষ্ণার আত্মীয়। ওকে গুরু হিসাবে কৃষ্ণা পেয়ে তার সাহিত্য-সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছে। আজ লকুর যদি কিছু হয় তো কৃষ্ণার চেয়ে ক্ষতি কার বেশি, কৃষ্ণার জানা নেই!

কিন্তু ভয়ঙ্কর গোলমাল উঠছে বাইরে। উৎপলাদি নিরাপদে পৌঁছুতে পারবে তো? কে জানে! নিরাপত্তা আজ কোথাও নেই। মানুষের

জীবন বনমানুষের জীবনের থেকেও বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠেছে! মা'র কোলের থেকে ছেলে কেড়ে নিয়ে হত্যা—স্বামীর পাশ থেকে স্ত্রীকে ছিনিয়ে নেওয়ার কদর্য্যতা—পরিবারের মধ্যে থেকে পুত্রকন্যাকে নিয়ে গিয়ে গুম্ করা—এ যেন নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে গেল। এই হত্যা, এই মৃত্যু, এই নৃশংস বর্ব্বরতা, কার বুকে সবার থেকে বেশী বাজে! নারীর—কৃষ্ণা যেন উত্তরটা নিজেই দিল! নারীর বুকছেঁড়া ধন বিপ্লবের মাঝেও বেরুতে বাধ্য হয়—না বেরুলেও ঘরে নারী তাকে রক্ষা করতে পারে না—এমনি দুর্ব্বলা সে! তার নিজের বিপদ এতে যে সবথেকে বেশি,—এই সত্য বুঝেও নারী নিরুপায়! কিন্তু আশ্চর্য্য সহনশীলা এই নারী! নীরবে সে সয়ে যাচ্ছে এই অত্যাচার যুগযুগান্তর ধরে! যুদ্ধ-বিগ্রহ-বিপ্লব-বিপর্য্যয়ের বিড়ম্বনা সর্ব্বাগ্রে স্পর্শ করে নারীকে—মাতাকে, পত্নীকে, কন্যাকে, ভগ্নিকে। মাতৃত্ব বা পত্নীত্ব তো কোনো ধর্ম্মের ধূযা তুলে সাম্প্রদায়িকতা জাগায় না! মানুষ মরলে সে যে সাম্প্রদায়েরই হোক, তার মা, তার স্ত্রী, তার কন্যা যে দারুণ শোকাঘাত পাবে, সে কথা কেন ভাবছে না ওরা! ওদের কি মা-বোন-বৌ নেই? ওরা যদি গুণ্ডাই, গুণ্ডারাও তো আকাশ থেকে পড়েনি—তাদেরও তো মা, বোন, আছে! তবু কেন তারা থামে না—ওদের কেন থামায় না ওদের মা-বোন-বৌ?

কে যেন আসছে! হয়তো আবার কেউ এল, কোনো আহত পথচারী, নয় তো অর্দ্ধমৃত গৃহবাসী! ওরা যোদ্ধা নয়—ওরা নিতান্তই নিরীহ,—দুদিনের শান্তিময় জীবন ভোগ করে সংসারের দেনা মিটিয়ে চলে যেতে চায়। ওরা সাম্রাজ্য চায় না, ওরা পদাধিকারের প্রত্যাশী নয়—

ওরা—'শুধু দুটি অন্ন খুঁটি, কোনরূপে কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া...'

ওদের সংখ্যা লক্ষ, কোটি, কোটি-কোটি! কিন্তু ওরাই মরে। পিপীলিকার মত মরে ওরাই! ভারত স্বাধীন হবে, তাতে ওদের কি! কতটুকু ওরা

পাবে সেই স্বাধীনতার? কত তুচ্ছ অংশ? সেটাও কবে পাবে তা জানা নেই, এবং সত্যি পাবে কি না, তাও জানা নেই। অথচ ওরাই সর্ব্বাগ্রে দুঃখ বরণ করেছে সর্ব্বাপেক্ষা বেশি। অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়েছে—উপবাস করেছে—জেলে গিয়েছে—ফাঁসীকাঠে ঝুলেছে এই স্বাধীনতার জন্য। দেশমাতা আজ স্বাধীন হচ্ছেন—কিন্তু ওরা? ওদের স্ত্রী-কন্যা-ভগ্নিরা, যারা হাসিমুখে জেলে যাবার জন্য ওদের সাজিয়ে দিয়েছিল একদিন পরম গৌরবে, আজও এই মৃত্যুযজ্ঞে তারাই আত্মাহুতি দিচ্ছে সর্ব্বাগ্রে। ওদের স্ত্রী-কন্যার চোখের জল তেমনি রইল বহমান! অন্নহীনতা, বস্ত্রহীনতা সয়েছিল ক্ষীণ আলো আসার আশায়, স্বাধীনতা আসবে। আজ সেই স্বাধীনতা এসেছে! কিন্তু কি তারা পাবে? কতটুকু? শুধু দেশ স্বাধীন হবে—এর থেকে আনন্দের কথা আজ কিছু নাই আর। স্বাধীন দেশের মৃত্তিকায় মানুষ স্বাধীন ভাবে মরতে পারবে—তার আত্মীয়-স্বজন তাকে দেশের স্বাধীন মৃত্তিকায় কবর দেবে, না হয় দাহন করবে—এও খুব বড় সান্ত্বনা! কিন্তু বহু শতাব্দির দুঃসহ শৃঙ্খল চূর্ণ করে সুস্থ এবং স্বস্থ পরিচয়ে পৃথিবীর বুকে আপনাকে বিকশিত করবার মত স্বাধীনতা কি এই? শিক্ষায়, সমৃদ্ধিতে, আত্মমর্য্যাদায় মানুষের মত বেঁচে থাকবার এই কি পন্থা? রাষ্ট্রে, সমাজে, অর্থনৈতিকতায় আত্মাধিকার লাভের এই কি উপায়? বিশ্বের জীবনছন্দে ভারতের সাম্য-মৈত্রীর বাণী প্রচারের এই কি সুযোগ? কতো ত্যাগ, কতো শোণিত ক্ষরণ, কতো কারা-বরণের মহিমা এই অভিযান-পথের বাঁকে বাঁকে স্মৃতিস্তম্ভ স্বরূপ খাড়া হয়ে আছে। সিপাহী-বিদ্রোহ, বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান, অসহযোগের ইতিহাস, আইন অমান্য থেকে এই তো সেদিনও আগষ্ট বিপ্লব, আজাদ হিন্দের অভিযান, নৌবাহিনীর আন্দোলন, আর-এ-এফ, ছাত্র কৃষাণ মজুর বিদ্রোহের রক্তাক্ত স্বাক্ষর লেখা রয়েছে জাতির অভিযান-পথের ইতিহাসে। ইংরাজ ভয়ত্রস্থ শুধু নয়, সাম্রাজ্য-রক্ষার আশায় হতাশ হয়ে পড়েছিল। তাই এলো স্বাধীনতা প্রত্যর্পণের প্রতিশ্রুতি। ভারতের রাজনৈতিক প্রধান দলগুলি খুসী হোল—বন্ধুর

মত ইংরাজকে গ্রহণ করলো তার স্বাধীনতার যাত্রাপথে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ সুকৌশলে রচনা করলো ইণ্ডিপেণ্ডেনস্ বিল—ভারতকে শুধু পাকিস্তান হিন্দুস্থানেই বিভক্ত করলো না, আরো কত স্থান করবে, জানা নেই। বাংলা, পাঞ্জাব ভাগ হোল, নেপালের সঙ্গে আলাদা চুক্তি হচ্ছে—পার্ব্বত্য অঞ্চলগুলির অবস্থা অদ্ভুত হয়ে উঠলো এবং আরো কি সব হোল তা আজ এই বৃহত্তম পরিবর্ত্তনের আলো-আঁধারে অগোচর রয়েছে দৃষ্টির। কিন্তু সব থেকে মজা হোল, এই ভয়ঙ্কর বিভাগ-বিচ্ছেদ ইংরাজ ভারতীয়দের দ্বারাই সানন্দে গ্রহণ করালো; আবার এই ব্যবস্থা আমাদেরই প্রার্থিত ব্যবস্থা বলে আমরাও দুহাত তুলে নেচে বেড়াচ্ছি! কূটনীতির এতবড় পরিচয় পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তারপর এই শাসনতন্ত্র রচনা—সেই গভর্ণর, আপার আর লোয়ার হাউস, সেই মাথা ভারী আমলাতন্ত্রে ইংরাজের অধীনে স্বাধীন থাকবার ডোমিনিয়ন সামর্থ্য, চমৎকার! ভারত বিভাগ নাকি শান্তির জন্যই প্রয়োজন ছিল—কিন্তু বেশ চমৎকার শান্তি তো ভোগ করছি!!...আবার একটা প্রচণ্ড গোলমাল উঠলো—চমৎকার শান্তি! সাম্প্রদায়িক কলহ—পুঁজিবাদীর শোষণ, গুণ্ডামীর বিপর্য্যয় আর ব্ল্যাকমার্কেটের চরম শান্তি...জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে, এই কি স্বাধীনতার সত্য রূপ?

একজন ভদ্রলোক এসে পৌছালেন, সঙ্গে হাঁসপাতালেরর ডাক্তার; লোকাধীশের মুখের সঙ্গে এত বেশি সাদৃশ্য যে কৃষ্ণা মুহূর্ত্তে বুঝতে পারলো, ইনি বড়দা। কৃষ্ণা উঠে দাঁড়ালো। বড়দা ওর দিকে একবার চেয়ে লকুকে দেখলেন। লকু অজ্ঞান।

—আপনি কি নার্স?—বড়দা কৃষ্ণার পানে চেয়ে প্রশ্ন করলেন!

—না—আমি ওঁকে দাদা বলি; আপনি আমারও বড়দা—বলে কৃষ্ণা পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো।

—ও হাঁ—লকুর চিঠিতে পড়েছিলাম, তোমার নাম কৃষ্ণা, নয়? তুমি কখন খবর পেলে?

—আমাকে এরাই খবর দিয়েছেন—বলে কৃষ্ণা সংক্ষেপে বললো খবর দেওয়ার কথা।

—আমার দেরী হোল, প্রথম সনতের বাড়ী গিযেছিলাম। তার কাছ থেকে সব জেনে রাস্তায় নেমে দেখি, ভীষণ গোলমাল—যাক্, অবস্থা কি রকম দেখছেন ডাক্তারবাবু?

—এখনো ঠিক কিছু বলা যায় না। তবে নিরাশ হবার মত নয়—ডাক্তার বললেন। বড়দা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন জানালার ধারে। বাইরে ফুলবাগানে অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে। লকু বড় ভালবাসে ফুলবাগানের চাষ করতে। বড়দা যেন কাঁদছেন। কৃষ্ণা কাছে এসে বললো—মৃত্যুকে কেউ এড়াতে পারে না বড়দা, মৃত্যুকে অতিক্রম করবার যে সাধনা, তাই উনি বেছে নিয়েছেন।

—কিন্তু ওর সাধনা হয়তো অপূর্ণ থেকে গেল, দিদি—বড়দা সত্যি কেঁদে ফেললেন।

—না—ওঁর সাধনা পূর্ণ হোক, এই প্রার্থনাই করবো আমরা—সে প্রার্থনা পূর্ণ হবে—আপনি হতাশ হবেন না! ঈশ্বর যাকে মহৎ কাজ করতে পাঠান, তার কাজ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাকে রাখেনও! যদি তা না হয়, বুঝবো, ওঁর ঐটুকু কাজই করবার ছিল—তাই ঈশ্বর ওঁকে নিয়ে গেলেন!

বড়দা চুপ করে রইলেন। কৃষ্ণা আবার বললো,—উনি সৈনিক! ওঁর জন্য শোক করতে উনি নিজেই বারণ করেছেন বড়দা!—বলতে বলতে কিন্তু কৃষ্ণা নিজেই কেঁদে ফেললো। এই দুর্ব্বলতা মানুষের মজ্জাগত—একে এড়িয়ে যাবার শক্তি কোন মানুষেরই নাই,—এই স্নেহ-প্রেম-ভালবাসার বন্ধনকে! এই হৃদয়ের বন্ধনই মানুষকে পশু থেকে উন্নীত করেছে!

—বৌদি!···

দুজনে চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখে, লকু চোখ মেলেছে। বড়দা তৎক্ষণাৎ কাছে এসে বললেন,

—তোর বৌদি বাড়ীতে রয়েছে···চিনতে পারছিস আমায়?

—হ্যাঁ দাদা···ও কে, কৃ···ষ্ণা ? আমার কি হয়েছে ?

—মাথায় সামান্য চোট লেগেছে—বলে কৃষ্ণা এসে পায়ের কাছে দাঁড়ালো ; বললো,

—একটু ঘুমান···ঘুমুলেই ভাল হয়ে উঠবেন···বলে সে বসলো লকুর পায়ে হাত বুলুতে ; লকু যেন ক্লান্তিতে চোখ বুজলো। বড়দা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার ডাক্তারকে ডাকলেন। তিনি বললেন,—আর অজ্ঞান হন নি, ঘুমুচ্ছেন ! খুব সম্ভব আঘাতটা সামলে উঠতে পারবেন।

কৃষ্ণা, কেন জানিনা—কথাটা শুনবা মাত্র দুহাত তুললো কপালে তার। হয়তো লকুর জীবনের জন্য প্রার্থনা করলো। বড়দা নিঃশব্দে বসে রইলেন একধারে। উনি বর্ত্তমান দিনে একজন বিশিষ্ট দেশকর্ম্মী এবং সকলেই জানে ওঁর নাম—ওঁর কর্ম্মশক্তি। হাঁসপাতালের ডাক্তার, নার্স প্রত্যেকেই বিশেষ শ্রদ্ধা-সম্মানের সঙ্গে কথা বলছেন ওঁর সঙ্গে এবং লকুর জীবনের জন্য অন্য পাঁচজন আহতের চেয়ে বেশি চেষ্টাও যে হচ্ছে, তা বুঝতে দেরী হয় না ! এই স্বার্থপরতা ওঁর নিজের পছন্দ নয়, কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না। শুধু ভাবছেন, তাঁর কি নৈতিক অধোগতি হচ্ছে ক্রমশঃ ! সুবোধের সঙ্গে কথাগুলো মনে পড়লো—তার সঙ্গে এখানকার আচার ব্যবহারও দেখছেন···সত্যি কি উনি ক্ষমতালাভে মোহগ্রস্ত হয়ে পিতা রুদ্রাধীশের পুত্রত্বের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছেন ? তথাপি তিনি কিছুই বললেন না। দীর্ঘ-সময়-অতিবাহিত হয়ে গেল নীরবেই। লকু ঘুমুচ্ছে, কৃষ্ণা আস্তে ওর পায়ে হাত বুলুচ্ছিল। হঠাৎ বড়দা প্রশ্ন করলেন—তুমি থাক কোথায় কৃষ্ণা ? বাড়ী যেতে হবে তো তোমায় ? বেলা প্রায় একটা হোল।

—যাব···আর একবার ঘুম ভাঙার অপেক্ষা করছি। আপনিও চলুন আমার ওখানে—স্নানাহার করবেন।

বলে সে উঠে গিয়ে ফোন্ করলো উৎপলাকে। উৎপলা সানন্দে জানালো, —ওঁকে নিয়ে আয়।

ফিরে এসে কৃষ্ণা দেখে, লকু ধীরে ধীরে কথা কইছে বড়দাদার সঙ্গে ! তাহলে জীবনের আশা করা যেতে পারে !

—কৃষ্ণা. দাদাকে তোমাদের ওখানে নিয়ে যেতে পারবে ?—লকুই কথা বললো !

—হ্যাঁ, নিয়ে যাচ্ছি…তুমি তো বেশ ভাল রয়েছ এখন ! তাহলে আমরা আবার সন্ধ্যার দিকে আসবো !

—হ্যাঁ—যাও ! লকু আবার ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজলো। কৃষ্ণা বড়দাদাকে নিয়ে আসছে, লকু আবার ডেকে বলল,

—শোন কৃষ্ণা, যদি বাঁচি তো ভালই, যদি না বাঁচি তো আমার শেষ কথাটা শুনে যাও—'মানুষের জীবনে সব থেকে বড় প্রয়োজন মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ !'—সেই সত্য-মানুষকে সৃষ্টি করো তোমার সাহিত্যে।

কৃষ্ণা মাথা নুইয়ে জানলো, যে, সে শুনেছে এবং বুঝেছে। বড়দাদাকে নিয়ে বাইরে এসে দুঃশ্চিন্তা জাগ্‌লো, কেমন করে যাবে অতখানা পথ। কিন্তু বড়দা বর্ত্তমানে বিশিষ্ট ব্যক্তি ! একজন মোটর-বিহারী যাচ্ছিলেন—দেখতে পেয়েই গাড়ী থামিয়ে সাদরে তুলে নিলেন ওদের। এঁরা এখন অনেক কিছু আশা করেন এই জেলখাটা ত্যাগব্রতধারী দেশসেবকদের কাছে। ওঁর গাড়ীতে ত্রিবর্ণ পতাকা লাঞ্ছিত এবং সঙ্গে সশস্ত্র রক্ষীও রয়েছে ! কৃষ্ণা নিরাপদে বড়দাকে নিয়ে মহিলামণ্ডপে পৌছাল।

স্নানাহার সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন বড়দা। রাত জেগে আসার জন্য শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত ছিল—কিন্তু উঠেই মনে পড়লো—স্বাহা, সেঁজুতি, মা নিদারুণ দুশ্চিন্তায় সময় কাটাচ্ছে, তাদের একটা সংবাদ পাঠান দরকার। উঠেই উনি তাড়াতাড়ি একখানা টেলিগ্রাম ফর্ম্ম চেয়ে নিলেন উৎপলার কাছ থেকে। লকুর সম্বন্ধে শুধু লিখলেন—'এক্‌সিডেন্ট হয়েছিল, অবস্থা ভালর

দিকে আসছে।' কার নামে টেলিগ্রামটা পাঠাবেন, মিনিট দুই ভাবলেন উনি—বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই—তাই সুবোধের নামেই পাঠিয়ে দিলেন শেষটায়। সুবোধ তাঁদের আত্মীয় এবং গত সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা আরো নিবিড় হয়ে উঠেছে···অতএব সুবোধকেই পাঠানো উচিৎ। দারয়ান টাকা আর কাগজখানা নিয়ে চলে গেল; উনি একা বসে ভাবছেন—অন্য একখানা 'তারে' উনি দিল্লীতে খবর পাঠালেন যে ভাইএর একটা দুর্ঘটনা ঘটার জন্য ও'র যেতে একদিন দেরী হবে।—দিল্লীতে পৌঁছুতে এই একটা দিন দেরী হওয়ার জন্য ও'র ভবিষ্যৎ ক্ষতি কিছু হতে পারে কি না, সেইটাই তিনি চিন্তা করছিলেন। হয়তো ক্ষতি হবে, হয়তো এতো দিনের কারাবাস, দুঃখ-নির্য্যাতনের পুরস্কার স্বরূপ তিনি যে-টুকু পেতে পারতেন, তা' নাও পেতে পারেন—যা তীব্র প্রতিযোগিতা! কিন্তু—বড়দা যেন চমকে উঠলেন—উনি কি পুরস্কার পাবার জন্যই এতকাল দুঃখবরণ করেছেন, যে, আজ সেটা না পাওয়ার জন্য নিরাশ হবেন! ওঁদের বংশের তিন পুরুষের মত্—'দেশসেবকের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেশের সেবা করতে পাওয়ার অধিকার লাভ।' পদাধিকার নাইবা পেলেন তিনি! কিন্তু পদাধিকার না পেলে যে আর দেশসেবা করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। আর তো দুঃখ-নির্য্যাতন বা কারাবরণের প্রয়োজন হবে না। ইংরাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে, বেয়নেটকে অগ্রাহ্য করে,আর তো সত্যাগ্রহের অভিযান-পথে বেরুতে হবে না—এখন শান্তি—সুখ—সৌভাগ্যের মধ্যে দেশকে পরম মঙ্গলের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সেবক চাই—সেবাধিকার চাই, কিন্তু তার জন্য পদাধিকারও প্রয়োজন, নইলে কৃষক-প্রজা মজুরের সেবা করা যায় না—গণজীবনের অগ্রগতিপথ পরিষ্কার করা যায় না, ব্যষ্টিজীবনের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করা চলে না!

এই চিন্তার সূত্র ধরেই ওঁর মনে চিন্তা জাগলো—এই দীর্ঘ ত্রিশবছর ধরে যাঁরা স্বরাজের সাধনা করে এলেন—স্কুল-কলেজ ছেড়ে, অর্থ নৈতিক বিদ্যায় অশিক্ষিত থেকে, যাঁরা শুধু রাজনীতি নিয়ে থেকেছেন, ননকো-অপারেসন

করেছেন, জেল খেটেছেন আর চরকা কেটেছেন—এবার, এই নব-স্বাধীনতার তোরণদ্বারে দাঁড়িয়ে তাঁরা কি কার্য্যে আত্মদান করবেন—কোন্ গৌরবময় কাজে, কোন্ সেবাব্রতে, কোন্ ঐহিক পারত্রিক কল্যাণে? স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকেই বা কি তাঁরা খাওয়াবেন আর নিজেই বা কোন্ শান্তিময় জীবনের পথে চলবেন? তাঁদের সংখ্যা শত সহস্র নয়, কোটির পর্য্যায়ে! স্বাধীন ভারত তাঁদের কি ব্যবস্থা করবে আজ? হয়তো করবে! নাই যদি করে, তাতেও অপশোষের কিছু নেই। যে বীর সৈনিকদল একদিন মাতৃভূমির আহ্বানে সব ছেড়ে অগ্নিময় পথে পা বাড়িয়েছিল—তারা আজ শৃঙ্খলমুক্তা স্বাধীনা দেশ-জননীর অঙ্কে ফিরছে—একি কম সান্ত্বনা!

বড়দা যেন অকূলে কূল পেলেন! দিল্লীতে যদি তাঁর প্রাপ্য পুরস্কার নাই যোটে, দুঃখ কেন তিনি করবেন! এতো অধঃপতন হবে রুদ্রাধীশের জ্যেষ্ঠপুত্রের, যার পিতা শুধু আদর্শ রক্ষার জন্য পত্নী-পুত্র-পুত্রবধু ছেড়ে বনবাসী হয়ে গেছেন! না—না; বড়দা যেন নিজেকে সামলে নিলেন—কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার মনে পড়লো—বাড়ীর 'তার'টা সুবোধের নামে কেন তিনি পাঠালেন! তাঁর অবচেতন মনে সুবোধের উপর একটা প্রীতি জন্মেছে—যে অত্যাচারী মন্বন্তর-মারীভয়ের মূল কারণ জমিদার সুবোধ কখনো ওঁদের দুভাই-এর অন্তরের নাগাল পায়নি—তারই উপর প্রীতি শুধু জন্মালো না, তাকে অবলম্বন করে বড়দা আজ মিলমালিক, মিলিওনিয়ার হতে যাচ্ছেন—ধিক্! কিন্তু বড়দার ধিক্কারটা মুখে উচ্চারিত হোল না, অন্তরেই গুম্ফিত হয়ে গুপ্ত হয়ে গেল।··· কৃষ্ণা ঠিক সেই সময় নীচে এসে বললো,—চলুন বড়দা, দেখে আসি!

—চলো, কিন্তু তুমি ফিরবে কি করে? আমাকে পশ্চিমবঙ্গীয় দু' একজন বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে হবে।

—বেশ তো। আপনি যাবেন। আমি উৎপলাদির সঙ্গে ফিরবো!

ওরা বেরুলো মোটরে।

নিজদিকে আর্য্যগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত বুঝে আদিবাসীগণ সত্যি আনন্দিত হোল, উল্লাসধ্বনি করলো ওরা কয়েকবার। রংলাল নামে অপর একজন মাঝিকে সন্ন্যাসী ডাকালেন কাছে। ওরা মিশনারী স্কুলে পড়েছে, সামান্য ইংরাজি জানে। সে কাছে এলে বললেন,—তোদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বড় বড় ইংরাজ লেখকরা কি বলেছেন, পড়ে দেখ; প্রসিদ্ধ জাতিতত্ত্ববিদ নৃতাত্ত্বিক **Dr. Verrier Elwin D. Sc. F. N. I. F. R. A. I.** বলেছেন—**"I have come to the conclusion on no other grounds than those of fact. And that conclusion is that the aboriginals of peninsular India profess a religion of the Hindu family that they should be classed as Hindu at the time of the census."**—মানেটা বুঝিয়ে দিই, 'বাস্তবতার উপর নির্ভর করেই আমি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করেছি যে, ভারতের পার্ব্বত্য জাতিগুলি সবই হিন্দুগোষ্টির অন্তর্গত; কাজেই লোক-গণনার সময় তাদের ধর্ম্ম 'হিন্দু' লেখাই উচিত।" আর একজন পণ্ডিত**Mr: W. V. Crigson I. C. S.** তাঁর **The Aboriginal problem in C. P. and Berar** নামক বইতে লিখেছেন,—লোক গণনার হিসাবে পার্ব্বত্যগণকে হিন্দু সমাজ থেকে আলাদা করে দেখানো নিতান্ত অর্থহীন।—এরা সব বড় বড় পণ্ডিত এবং মানুষের আদি ইতিহাসের অন্ধকার পথে জ্ঞানের আলো জ্বেলে গেছেন!

—ই তো খুব ভাল কথা বলছে। তা আমাদিগে তুরা হিন্দু করেই লিখাবি!—মধু বললো!

—লেখাতে হবে। এতকাল যে লেখানো হয়নি সেটা তোদের দোষে নয় আমাদেরই হিন্দু সমাজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য। আজ দেশে দেশী সরকার স্থাপিত হচ্ছে, তোদের শিক্ষা, তোদের সমাজ-ব্যবস্থা, তোদের ধর্ম্ম-সংস্কার সব এবার থেকে দেখতে হবে সরকারকে!

—মিশনারীরা আমাদের শেখায়,—রংলাল বললো—আমরাই নাকি এদেশে

ছিলাম, তোরা এসে কেড়ে নিয়েছিস এই দেশ। তোরা নাকি এসেছিলি হৈ ককেসাসের উদিক থেকে—

—মিথ্যে কথা—সন্ন্যাসী সজোরে উচ্চারণ করলেন। সে ইতিহাস বিদেশীর কল্পিত ইতিহাস। এদেশে তোরা ছিলি আমাদের মধ্যে। আমাদের ঋষিরা তোদেরকেও সমান শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে আমাদের সঙ্গেই নিতে চেয়েছিলেন—"কৃন্বন্ত বিশ্বমার্য্যম্"—সারা বিশ্বকেই তাঁরা আর্য্য করতে চেয়েছিলেন—ভারতের দুর্ভাগ্য যে সেকাজ শেষ হবার পূর্ব্বেই, বিদেশী এসে আক্রমণ করলো ভারত, শক, হুণ, মোগল, পাঠান।

—আমাদের পুরাণ-কথা তো তোদের পুরাণের সঙ্গে মিলছে—রংলাল বললো,—কিন্তুক উয়োরা বলে যে সীতাকে উদ্ধার করেছিল রাম আমাদিকে নিয়ে, তারপর আমাদের তাড়াইয়ে দিল!

—না—তোদের আমি মূল রামায়ণ পড়ে শোনাব—শোন, তোদের পুরাণ-কথায় অবতার আছে হাকো আর হড়; আমাদের মীন আর কূর্ম্ম। কূর্ম্ম (ধারতি) ধারণ করেছিল, তোরাও মানিস, আমরাও মানি। আরো দেখ, তোদের বিয়ে সগোত্রে হয় না, আমাদেরও হয় না। তোরা সতীত্বকে বড় করে দেখিস, ঠিক আমরা যেমন করে দেখি। তোদের মেয়েরা আমাদের মেয়েদের মতই সিন্দুর পরে। তোরা মানুষ মরলে পুড়িয়ে দিস আমাদের মতই—অস্থি দিস নদীর জলে, গাঙের জলে।

—হুঁ—হুঁ, ই সব খুব ঠিক কথা বলছিস তু বাবা-ঠাকুর। আমাদের ছেলে হলেও অশুচ হয়।

—হয়ই তো, তোদের ধর্ম্ম-সংস্কার আচার-ব্যবহার সবই হিন্দুর মত। তবে কেন তোরা অহিন্দু হতে যাবি? এবার থেকে যাতে তোদের জন্য আরো ভালো ব্যবস্থা হয়, তার জন্যই আমি বেরিয়েছি দিল্লীর পথে—তোরা অন্য কারো কথায় কাণ দিস না।

—না বাবাঠাকুর, কোথ্‌থোনো না!—ওরা সমস্বরে বললো।

কথায় কথায় রাত হয়ে গেল অনেকখানা, কিন্তু সন্ন্যাসী সেই গভীর রাত্রেই ওদের কাছে বিদায় গ্রহণ করলেন। অনেক দূর পথ ওঁকে পদব্রজে যেতে হবে,—মধুপুরে গিয়ে ট্রেণ ধরে তিনি যাবেন দিল্লী, সেখানে প্রথম দেখা করবেন কয়েকজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে, যাঁরা যমুনাতীরে এসে যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন এবং হয়তো গ্রহবৈগুণ্যে যাঁদের যজ্ঞশালার সঙ্গে পর্ণকুটিরগুলিও অগ্নিসাৎ হয়ে গেছে !

উনি চলেছেন—গভীর গহন বন, উচু নীচু জমি, পার্ব্বত্য পথ—কিন্তু তিনি অভ্যস্থ এই পথে চলতে। একটু খানি গেলেই পাকা রাস্তা পাবেন—দুমকা থেকে সে পথে মোটর বাস যায় মধুপুর পর্য্যন্ত। যদি বাস পান তো চড়বেন, ভেবেই উনি যাচ্ছেন—জ্যোৎস্না উঠলো। বিশাল বনরাজি মধুর জ্যোৎস্না-লোকে অপরূপ সুষমাময় হয়ে উঠলো। সন্ন্যাসী আর একবার আদিম দিনের আরণ্যক সভ্যতার শান্তিময় তপোবনের কথা মনে করলেন। কি অপরূপ শান্তির দিনই না ছিল !

উজ্জ্বল আলোটা এগিয়ে আসছে—নিশ্চয় মোটরবাসের হেড্‌লাইট্‌। তাড়াতাড়ি এসে উনি পাকা রাস্তায় উঠলেন, হাত তুললেন। বাস কাছে এসেই থেমে গেল—উনি উঠলেন। স্থানাভাব দেখে উনি বসলেন একেবারে পিছনের স্বল্প-পরিসর একটু যায়গায়। বড়ই অসুবিধা হবার কথা, কিন্তু অসুবিধাকে উনি কখনো গ্রাহ্য করেন না ! ঐ বাসে যে-কজন ছিল, সকলেই একবার চেয়ে দেখলো ওঁর পানে—উনিও দেখলেন !

দুজন যুবক—বেশ ভদ্রবেশী, হয়তো কোনো ভালো চাকুরী করে—ওঁর দিকে বার কয়েক তাকালো। একজন বলল,—বাউল বৈরাগী—বাবাজীরা বেশ আছেন; পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে সেবাদাসী নিয়ে দিব্যি থাকেন।

—তার থেকে আরো ভালো থাকেন সন্ন্যাসীরা, গাঁজায় দম দিয়ে পরমানন্দে ব্রহ্ম লাভ করতে থাকেন।

দুজনেই ওরা পরস্পর কথা বলে বেশ হাসতে লাগলো; দীর্ঘ পথ, চুপ

চাপ বসে যাওয়া কষ্টকর। কাজেই ওদের উপভোগ্য আলাপে অন্য একজন অর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তি যোগ দিয়ে বললেন,—মন্বন্তরেরও ধার ধারেন না, মহা প্রলয়েরও খোঁজ রাখেন না—বেশ আছেন। গৃহস্থের ঘরে গেলেই ট্যাক্স আদায় হয়ে যায়।

—ট্যাক্স তো দিনের বেলায় আদায় হয় মশাই, রাত্রে ওঁরাই মেকি টাকা তৈরী করেন, পথে-বিপদে মানুষ খুন করেন—আর ভোর না হতেই জটা গুছিয়ে বেঁধে, তিলক ফোঁটা চড়িয়ে ছাই মেখে বসে পড়েন সুবিধে মত যাযগায়। আমি বুঝতে পারি না যে এখনো ঐ ধাপ্পাবাজ শয়তানগুলোকে জেলে দিচ্ছে না কেন গভর্ণমেণ্ট।

—সত্যি—আইন করে এই সন্ন্যাস-প্রথা উঠিয়ে দেওয়া উচিৎ—তার সঙ্গে বাউল, বাবাজি, বৈরাগীর আখড়াও।

—দেওয়া হবে। দেশী সরকার হলে ওদের আর জোচ্চুরি করে খেতে হবে না। কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, খালি বসে গাঁজা টানবেন আর মানুষের কাছে ধাপ্পা দিয়ে পয়সা নেবেন—এ আর চলবে না।

—চলা উচিৎ নয়:—এই সন্ন্যাসী সিষ্টেম—বাউল বৈরাগীর আখড়া—আর মাতাজি পোষা আমাদের সমাজের জঘন্য কলঙ্ক।

—শুনেছেন, মাদ্রাজে দেবদাসী-প্রথা আইন করে তুলে দেওয়া হয়েছে?

—হাঁ। বাঙ্গলা বিহারেও এই বৈরাগী প্রথা আর মাতাজি পোষা প্রথাও আইন করে বন্ধ করা উচিৎ—সজোরে বললো যুবকদের একজন—তা'ছাড়া মাথায় জটা, গায়ে ছাই আর হাতে ত্রিশূল দেখলেই বোঝা উচিৎ যে, সে হয় ফেরারী আসামী, না হয় নারী-হরণকারী লম্পট!

—কিম্বা উৎকৃষ্ট পকেটমারও হতে পারে—প্রথম শ্রেণীর গাঁটকাটা!

—প্রথম শ্রেণীর গোয়েন্দাও হতে পারে—কথাটা বললেন সন্ন্যাসী তরল কণ্ঠে। সমস্ত বাসখানা যেন উচ্চকিত হয়ে উঠলো মুহূর্ত্তে! কে এ? কে এই সন্ন্যাসী বেশধারী? প্রত্যেকের মনে এই একটি মাত্র প্রশ্ন উত্তাল হয়ে

উঠলো ; সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল হাস্ত-কল্লোল। কে জানে, সত্যিই উনি গোয়েন্দা কি না ? এখনো ইংরাজরাজ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, এখনো ভারতীয় কংগ্রেস রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি—কে জানে, এই বাসের মধ্যে কার পোঁটলা খুলে উনি রিভলভারার বের করে ফেলবেন আর সঙ্গে সঙ্গে বাসশুদ্ধ সকলের কপালে 'চলো থানায়'—আদেশ হবে।

—সন্ন্যাসী মিনিট খানেক চুপ করে থেকে শুধুলেন—সন্ন্যাসী বা বাউল বাবাজিদের উপর এতখানি বিরূপ হবার কারণটা কি মশাইগণ ?

—না—বিরূপ না—আম্‌তা আম্‌তা করে করে বললো একজন যুবক—, দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে ওঁদের দিয়ে দেশ কোনো উপকারই তো পেল না ; ওঁরা আর কিছু না হলেও প্যারাসাইট্।

—না—ওরা পরগাছা নয়, ওরা মহীরুহ—কিন্তু প্যারাসাইট্‌কে তোমরা এত ঘৃণা কর কেন ? জগতের শ্রেষ্ঠ মূল্যবান ফুল অর্কিড, সেগুলো প্যারাসাইট্ ! তোমাদের ইংরাজিশিক্ষার প্রয়োজন ফুরুলো—ওটা প্যারাসাইট্ হয়ে গেল। এই গরম দেশে তোমাদের অতঅত জামাকাপড় প্যারাসাইট্, তোমাদের চিন্তাধারা প্যারাসাইট, দৃষ্টিভঙ্গীও প্যারাসাইট।

নিস্তব্ধ হয়ে রইল যুবকদুটি এবং অন্য সকলেই। ওরা ভাবতেই পারে নি যে এই নিতান্ত নিরীহ বাউল বেশী সন্ন্যাসী তর্ক তুলবেন এবং বক্তৃতা দেবেন !

—শোনো—সন্ন্যাসী বলতে লাগলেন—এই বিরাট দেশটা যেমন তোমাদের, তেমনি বাউল-বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীদেরও। গান্ধী, জহরলালের যে অধিকার এই দেশে বাস করবার পক্ষে, আমার তা থেকে কিছু কম নেই। এবং এই দেশের জন্য তাঁদের থেকে আমাদের বাউল বৈষ্ণবদের দুঃখ দুশ্চিন্তা কিছু কম নয়। অবশ্য আমাদের মধ্যে যেমন চোর বাটপাড় দু' দশ জন আছে, তেমনি তোমাদের নেতাদের মধ্যে আর তোমাদের মধ্যেও থাকতে পারে। আছে কি না, প্রচারের মহিমায় হয়তো সেটা জানা কঠিন হয়—কারণ এ যুগে প্রচারই হচ্ছে বড়রকম বাটপাড়ী ; কিন্তু সকল সন্ন্যাসী বাউল বৈরাগীকে বাটপাড় বলার

কি অধিকার তোমার আছে, বলতে পার? কতটুকু তুমি জান তাদের বিষয়ে? এই যে দেশীয় প্রথার উপর ঘৃণা, দেশের মানুষের উপর সন্দেহ পোষণ, যুগ-পরম্পরাগত দেশীয় ধারার উপর বীতশ্রদ্ধা—এর মূলে কি তোমাদের ইংরাজী প্যারাসাইট-নীতি নাই? বল, তোমার ঠাকুরদার আমলে যাঁরা প্রণিপাত পেতেন, তোমার আমলে তাঁরা ঘৃণার জীব হলেন কেন?

—মাফ্ করবেন—আমাদের বিদেশী শিক্ষা তার জন্য নিশ্চয়ই অনেকাংশে দায়ী।

—তাহলে সেই বিদেশী শিক্ষার সংস্কার আগে কর, তারপর আমাদের সমালোচনা করবে।

—হ্যাঁ, কিন্তু সন্ন্যাসীরা সত্যি কি কিছু করেন, অন্ততঃ ভাবেন কি দেশে জন্য? অর্দ্ধবয়স্ক লোকটি শুধুলেন।

—নিশ্চয়ই, দিল্লীতে সন্ন্যাসীদের আন্দোলনের কথা কি শুনছেন? আপনারা কি করে শুনবেন? বুদ্ধিমান ইংরাজিশিক্ষিত বাঙ্গালী যে বিদ্রূপ করে ওঁদের। বাঙ্গালার কাগজে তাই সে খবর প্রচার হয় না! এই দুর্ভাগা দেশের এযে কতবড় দুর্ভাগ্য তা বলবার নয়। কিন্তু বাংলা ছাড়া প্রায় সারা ভারতের সহানুভূতি ওঁরা পাচ্ছেন! বাঙ্গালী মহাচীন, ইন্দোনেশিয়া থেকে মার্কিন, মার্শালপ্ল্যানের খবর রাখে অথচ দেশের এতবড় বিপ্লবাত্মক সন্ন্যাসী-সত্যাগ্রহের খবর রাখতে চায় না। কিন্তু শুনুন, সন্ন্যাসীর মধ্যেই আজও ভারতের শ্রেষ্ঠ গৌরব ধৃত রয়েছে; সন্ন্যাসীকে বিদ্রূপ করার অর্থ ভারতের আত্মাকে অস্বীকার করা। সন্ন্যাসী শঙ্কর না আবির্ভূত হলে ভারতের হিন্দুত্ব আজ প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার হোত! বর্ত্তমান ভারতের গণ-জাগরণ সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ ইত্যাদি আজকার ধর্ম্মগুরু দ্বারাই হয়েছে। আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দায়ানন্দজী সন্ন্যাসী—আর কত নাম করবো? সর্ব্বস্বত্যাগী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসীর নিন্দা করবার পূর্ব্বে দুবার ভাববেন—এই অনুরোধ।

কেউ কিছুই বললো না উত্তরে। ইনি তাহলে ডিটেক্টিভ নন—আরামের

নিশ্বাস ফেললো সকলে। ওদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত রেশনের মাল ব্লাকমারকেট করবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল, কেউ হয়তো অননুমোদিত গাঁজা আফিমের চোরাকারবার করতে যাচ্ছে—সবাই বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে গেল এতক্ষণে! কিন্তু বাসে আর আলাপ তেমন জমলো না।

ষ্টেশনে পৌছালেন,—ট্রেণের অনেক দেরী আছে। সন্ন্যাসী আপনার চিন্তাতেই বিভোর ছিলেন—ভারতের ক্ষাত্রধর্ম্ম কেমন করে লুপ্ত হয়ে গেল, কেমন করে ক্ষত্রিয় আদিবাসীরা অন্ত্যজ জাতি বলে গণ্য হোল, কি ভাবে সমাজের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ—কোটি কোটি বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি 'হরিজন' পর্য্যায়ভুক্ত হযে আলাদা জাতি হিসাবে গণ্য হতে যাচ্ছে—সেই শতশতাব্দির ভেদ-বিভেদের আলোচনা করছিলেন তিনি নিজের মনে। আলোকিত বিশ্রামাগারের একদিকে বেঞ্চে বসে কথা কইছিল দুজন ভদ্রলোক—। একজন বললো,

—ভারতের হস্তক্ষেপে ইন্দোনেশিয়ার যুদ্ধটা হয়তো থামলো। ইউ এন, ও, আজ "সিজ ফায়ার" অর্ডার দিযেছে। সাধারণ মজলিস করে ব্যাপারটার মীমাংসা করা হবে।

—হয়তো হবে—হয়তো না হতে পারে—অপর একজন বললো—ইন্দোনেশিয়াতে যুদ্ধের মূল কারণ খুঁজলে আমরা ইংরাজ আর মার্কিনের কারসাজিই দেখতে পাই। তবে একটা কথা সত্যি যে ইউ, এন্, ও, এতে হাত দিল, আর ভারত সর্ব্বপ্রথম এই বহির্ভারতীয় ব্যাপারের বৃহত্তর শান্তি কার্য্যের জন্ম সহযোগিতা করে নিজের মর্য্যাদা বাড়ালো।

—ওদিকে কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বিদ্বেষ সমানে চলছে। ওর কিছু একটা কিনারা না হলে, সত্যি, ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল্যই থাকে না কিছু।

—ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে ১৫ই আগষ্ট। তারপর দেখবেন, ভারত কিছুতেই এই কালা-ধলার বৈষম্য স্বীকার করবে না—আপনি কি মনে করেন, এসিয়া চিরদিনই হীন হয়ে থাকবে ইউরোপের কাছে? এসিয়া আজ জেগেছে।

—জেগেছে। দ্বিতীয় মহাসমর, চীনের অন্তর্বিপ্লব, জাপানের পতন আর ভারতের দুর্জ্জয় স্বাধীনতা-সংকল্পে নেতাজীর অবিস্মরণীয় অবদান, আজ পশ্চিম গোলার্দ্ধকে ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছে, প্রাচ্য আবার মানব সভ্যতার শীর্ষে উঠবে—কিন্তু, আজও প্রাচ্যের উদয়সূর্য্য মেঘাবৃত—সন্ন্যাসী স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে বলতে লাগলেন,—তাঁর উজ্জ্বল আয়ত চক্ষু ঘরের বিজলী আলোতে জ্বলছে,

—এখনো প্রাচ্যভূমি পশ্চিম গোলার্দ্ধের মতো সংহত হতে শিখলো না। এখনো প্রাচ্যের গণজাগরণ ধর্ম্মের তুচ্ছ আচার-আচরণেই বিদ্বেষ-বিভক্ত, এখনো পশ্চিমি নীতিকে প্রাচ্যে প্রচলিত করবার নির্লজ্জ প্রয়াস চলছে। এখনো প্রাচ্যের মহামানব-স্রোত—"দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে"—এই অধ্যায়ে পৌছুলো না।

সন্ন্যাসীর কথার মধ্যে যে ঐকান্তিক আবেগ এবং সত্যোজ্জ্বল দৃঢ়তা, তাতে ভদ্রলোক দুটি শুধু বিস্মিত নয়, বিশেষ আকৃষ্ট হলেন। একজন জিজ্ঞাসা করলেন,

—আপনি কি আশা করেন, প্রাচ্যভূমির সেই একতা কোনো দিন জাগবে?

—ঐ আশাতেই আজো বেঁচে আছি—বলে সন্ন্যাসী উর্দ্ধদিকে চাইলেন, বললেন, বহু যুগ ধরে ভারত ভুল পথে চলেছে, কিন্তু যে ভাবেই হোক, আজ যে স্বাধীনতার রবিরশ্মি দেখা দিয়েছে, তারই আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এই পবিত্র ভূমি—আর জাগবে তার নদীপ্রান্তর, অরণ্য পর্ব্বত আচ্ছন্ন করে সেই প্রাচীন সংস্কৃতির ঐক্য, যে মিলন-সুরের অখণ্ড রাগিণীতে সমস্ত প্রাচ্যভূমি একদিন বিধৃত ছিল,—বিভাসিত ছিল, বিলসিত ছিল।

গাড়ী আসছে, আপনাপন মোট-গাঁঠ গোছাতে লাগলেন ওঁরা—কথা আর কিছু হোল না; কিন্তু সন্ন্যাসী সানন্দে ভাবতে লাগলেন—পঁচিশ বছর আগে এই দেশের মানুষগুলোকে রাজনীতি দূরে থাক্—দেশ সম্বন্ধে কোনো কথাই বোঝানো যেতো না—এমন কি, ম্যালেরিয়া, মন্বন্তর সম্বন্ধেও ব্যাপক কোনো প্রতিকারের কথা শুনলে ওরা হাসতো। আজ শুধু শিক্ষিত নয়,

নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তিও স্বদেশের কথা চিন্তা করে—স্বজাতির এবং স্বধর্ম্মের কথা সমাজগত, সাম্যগত ভাবে দেখতে চায়—এই অঘটন ঘটেছে এক কটিবাস-পরিহিত বৃদ্ধের ঐকান্তিকতায়। মত এবং পথে যতই বিভিন্নতা থাক—ঐ মহান মানবাত্মা ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে যা ঘটিয়েছেন—পৃথিবীর কোনও নেতাই বোধ হয় এমন অঘটন ঘটাতে পারেন নাই। তাই উনি আজো এই বিশাল দেশের একছত্র নেতা—নমস্কার,—ওঁকে নমস্কার!

কিন্তু আরো বহু কথাই মনে হোল ঐ নমস্কার বাণী উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে। ওঁরা দীর্ঘদিন ধরে নেতৃত্বের একছত্রত্ব করে মৃতকল্প ভারতের রাজনৈতিক জীবনে যে চেতনাস্পন্দন তুলেছেন, তারই ফলে আজ কৃষক, প্রজা বা মজুরের মধ্যেও রাজনীতির কথা আলোচিত হয়—কিন্তু যুগের দানও আছে তাতে। সে দানকে অস্বীকার করা অন্যায়—দ্বিতীয় মহাসমরের পূর্ব্ব থেকে যে বিপ্লববাদ এবং তৎপরবর্ত্তী পৃথিবীর পটভূমিকায় যে নিত্যনূতন রাজনীতির আবর্ত্তন—ভারতের রাজনৈতিক জীবন তাতে কম আবর্ত্তিত হয় নি। তারপর অসহযোগের সক্রিয় যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে অহিংসাবাদের অজেয় অভ্যুত্থান! কিন্তু অহিংসা কি সত্যি অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই দিন থেকে এ পর্য্যন্ত? না—ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে—হয়নি। কেন? মানুষ মূলতঃ অহিংস নয়—মানুষও জীব, এবং জৈবধর্ম্ম হিংসারই প্রশ্রয় দেয় চিরদিন। এ প্রাকৃতিক নিয়ম—তার সাক্ষী পৃথিবীর ইতিহাসের প্রতি পাতায়, জীব-জগতের প্রতি প্রগতিতে—প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রতি কঙ্কালে। নিরীহ, নিরামিষাশী অতিকায় প্রাণীদের ধ্বংসের স্তূপেও হিংস্র ক্ষুদ্রকায় প্রাণীর জীবনাভিযান আজও প্রমাণ করছে, জীব হিংস্র; কিন্তু মানুষ—সমষ্টিগতভাবে না হলেও ব্যষ্টিগতভাবে অনেকেই এই হিংসাকে জয় করেছেন, যেমন বুদ্ধ, খৃষ্ট চৈতন্য। কিন্তু সেই অহিংসানীতি ব্যাপক ভাবে মনুষ্যগোষ্টিতে

পরিচালিত হতে পারেনি পৃথিবীর ইতিহাসে। ভারতের ইতিহাসেও পারলো না—একথা স্বয়ং মহাত্মাই বারংবার স্বীকার করেছেন।

ট্রেণ এসে পড়ায় তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে হোল ওঁকে, এক তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়; বড় বেশি ভিড়—হিন্দু-মুসলমান-জৈন-খৃষ্টানের কোন বিসম্বাদ নেই—কোনরকমে হাতখানেক যায়গা যোগাড় করতে পারলেই যেন বেঁচে যায় সকলেই—কিন্তু বিরোধ এখানেও আছে, তবে ধর্ম্মগত নয়—স্বার্থগত; সন্ন্যাসী নিশ্চুপে দাঁড়ালেন এককোণে।

—এসো বাবাঠাকুর—এখানে এসো!—এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ওঁকে আহ্বান জানালেন।

—থাক্—থাক্—আমি দাঁড়িয়েই যেতে পারবো—তিনি বললেন। কিন্তু ভক্তিমান লোকটি ওঁকে হাতধরে নিয়ে নিজের পাতা কম্বলে বসালেন। গাড়ি ছেড়ে দিলে দেখা গেল, যতখানা ভিড় মনে হয়েছিল, ঠিক ততখানা ভিড় নয়—নিশ্চিন্তে বসলেন উনি।

—ঠাকুরের কোথায় যাওয়া হবে?…প্রৌঢ় লোকটি শুধুলেন।

—দিল্লী পর্য্যন্ত; তারপর দরকার হয় তো হরিদ্বারের ওদিকেও যেতে পারি—উনি বললেন।

—বেশ! আমিও দিল্লী যাব। ওখানে যে সন্ন্যাসীরা খুব সত্যাগ্রহ চালাচ্ছে—খবর জানেন?

—জানি!—তিনি সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে মৌন হলেন। ওঁর আগেকার চিন্তাতেই নিবিষ্ট হতে চান, কিন্তু পাশের থেকে অন্য একজন বললো—স্বাধীন ভারতের সন্ন্যাসীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করবার জন্যই সন্ন্যাসীরা সত্যাগ্রহ করছে নাকি মশাই?—হাসলো লোকটি নিজেরই কথায়।

—না—ওদের দাবী অনেকগুলি! কিন্তু আজকালকার ইংরাজি সভ্যতার যুগে কে ওসব কথা শোনে মশাই?

—ওদের কথা শুনলে আর রাজ্য চালানো যায় না—যতসব গাঁজালের দল—বললো সেই লোকটি !

—রাজ্য ওঁরাই চালাতেন একদিন—সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর গাঢ় এবং উদ্দীপ্ত—যে রামরাজ্যের কথা বলতে আপনাদের মহাত্মা গান্ধী উচ্ছ্বসিত হন, সেই রামের রাজ্য চালাতেন বশিষ্ঠ ! ভারতের ইতিহাসে নিশ্চয় চন্দ্রগুপ্তই বৃহত্তর ভারতরাষ্ট্র গঠন করেন, তাঁর রাজ্য চালাতেন চানক্য—তিনি সর্ব্বত্যাগী এবং সেই হিসাবে সন্ন্যাসীই ছিলেন : ছত্রপতি শিবাজীর গুরু রামদাসই তাঁকে চালনা করতেন। ভারতের রাজনৈতিক ঐতিহাসে সন্ন্যাসীর গুরুত্ব সম্রাটের থেকে বেশী। আজও ভারতের রাষ্ট্র-নীতিতে যে অমোঘ শক্তি, তার মূলে রয়েছেন সন্ন্যাসী গান্ধী—উনি থামলেন !

—গান্ধিজি রাজনৈতিক সন্ন্যাসী—লোকটি প্রতিবাদের সুরে বললো !

—হ্যাঁ—যিনি সম্যক নিষ্ঠার সঙ্গে কোনো কাজে সর্ব্বস্ব নিয়োগ করেন, তিনিই সন্ন্যাসী : একটা বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের ছাই-মাখা গেরুয়া পরা লোকদের কথা বলছিনা,—সন্ন্যাসী তিনিই, যিনি মানব-কল্যাণের জন্ম সর্ব্বত্যাগী—যিনি ভূতে ভূতে ভগবানকে দেখেন—যাঁর কাছে চন্দন-বিষ্ঠা বা রাজা-ভিখারী সমান !

লোকটি অল্প কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—আপনার কথার প্রামাণ্য সত্য অগ্রাহ্য করা যায় না—তবে বর্ত্তমান যুগের সন্ন্যাসীরা দেশের সমস্যা নিয়ে ক'জন মাথা ঘামান ?

—ঘামান। বঙ্কিমের জীবানন্দ ঘামিয়েছেন, যাঁর আদর্শে আজ ভারতের এই রাজনৈতিক চেতনা : বিবেকানন্দ ঘামাতেন মাথা—তিনিই বজ্রগর্জনে স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বাংলার আর বাঙালীর—সে আজ শুধু পিতৃপুরুষকেই অগ্রাহ্য করছে না, সে আজ অন্য প্রদেশের হাতে তার নেতৃত্ব বিলিয়ে দিয়ে, তার স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত করে, তার স্বাধীন চিন্তাধারাকে উৎসন্ন করে তার যথাসর্ব্বস্ব হারাতে বসেছে। পরের কথায় শ্লোগান হেঁকে

নেচে বেড়াতে বেড়াতে সে তার ঘরের শালগ্রামকে আঁস্তাকুড়ে সমাধি দিল।—কণ্ঠস্বর ওঁর বেদনাতুর।

অনেকক্ষণ সকলেই নীরব—তিনজন বাঙালীই যেন ঐ সুস্পষ্ট সত্য কথাটার তীব্রতা অনুভব করছেন। গভীর রাত্রি—গাড়ীর অধিকাংশ যাত্রীই ঘুমুচ্ছেন কিম্বা ঢুলছেন। লোকটি সিগারেট টেনে বললো,

—আপনার কি মত, যে, রাজনীতিক্ষেত্রে আবার ধর্ম্মই প্রভাব বিস্তার করুক—? ধর্ম্মের জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে যত কাটাকাটি, রক্তারক্তি হয়েছে, এত রাজ্যলোভের জন্যও হয়নি। ধর্ম্মের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্রতা রয়েছে আর রয়েছে হিংসার বিষ।

—না—ধর্ম্মের ঔদার্য্যকে অস্বীকার করে যে ধর্ম্মান্ধ প্রচারক—সাম্প্রদায়িকতা তারই মধ্যে,—সন্ন্যাসী বললেন: পরধর্ম্ম সহিষ্ণুতার শিক্ষা হিন্দুর ধর্ম্মশিক্ষা—এবং সেই শিক্ষাই দরকার আজ। মানুষকে আজ হিন্দু বা মুসলমান বা খৃষ্টিয়ান হিসাবে শিক্ষা দিলে চলবে না, মানুষ গড়ার শিক্ষা দেওয়া দরকার! প্রত্যেক ধর্ম্মেই কিছু সার্ব্বজনীন সত্য রয়েছে,—সেই সত্যই সকলের গ্রাহ্য হওয়া উচিত।

—কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মই বলে—তার ধর্ম্মমতই শ্রেষ্ঠ—ও ছাড়া কিছুই আর সত্য নেই।

—তাতে পৃথিবীর কোনো উপকার হবে না—না সাংসারিক, না সাংস্কৃতিক, না আধ্যাত্মিক। সব ধর্ম্মের সার সত্যকে নিষ্কাষণ করে আগামী পৃথিবীর ধর্ম্মরাজ্য গঠিত হলে, সেই দিন সত্যি হবে মানুষের মহাধর্ম্ম, সত্য হবে মহামিলন। আপনাপন ধর্ম্মের গণ্ডীবদ্ধ আচরণীয় ক্ষুদ্রতাকে বিসর্জ্জন দিয়ে বিশ্বমঙ্গলকর বাণীকেই গ্রহণ করতে হবে মানবধর্ম্মে। মানুষ তার শক্তিতে এবং হৃদয়বৃত্তিতে পূর্ব্বে বা পশ্চিমে সর্ব্বত্রই এক, সুতরাং তার ধর্ম্ম মানুষের সর্ব্বজনমঙ্গলকর হওয়া দরকার। রাজনীতির কৌশল বিস্তার করে মানুষে মানুষে সম্প্রদায়গত এবং ধর্ম্মগত ভেদ বিদ্বেষ সৃষ্টি, রাজনৈতিকত্বের অপ্রাকৃত অপকৌশল

মাত্র। রাজনীতি মস্তিষ্কের জটিল কূটনীতি—আর ধর্ম্মনীতি হৃদয়ের উদার অনুভূতি। একটার সঙ্গে অন্যটার সমন্বয় দুরূহ, তবু হতে পারে এবং আগামী পৃথিবী এই সমন্বয়ের জন্যই অপেক্ষা করছে ;—অপেক্ষা করছে মানব-সভ্যতা।

কথাগুলো গুরুগম্ভীর শোনাচ্ছে গাড়ীর গতির ঝম্‌ঝম্ শব্দের সঙ্গে মিলে। সকলেই চুপ করে রইল এরপর অনেকক্ষণ। ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরালেন, আর অন্যলোকটি এক টিপ নস্য নিলেন নাকে। ও পাশের বাঙ্কে শায়িত একজন নিশ্চিন্তে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল, কখন জেগে উঠে এঁদের কথা শুনছে, হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে নেমে পড়লো বাঙ্ক থেকে! গাড়ীও একটা বড় ষ্টেশনে এসে থামলো। বাঙ্কের লোকটি আভূমি নত হয়ে সন্ন্যাসীর চরণোপান্তে প্রণত হয়ে বললো—বহুদিন পরে চরণদর্শন হোল; কেমন আছেন?

—সন্ন্যাসীর ভাল-মন্দ একই! কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারলাম না!

—নাইনী সেন্‌ট্রাল জেলে আপনি দিন কয়েক ছিলেন—তারপর আপনাকে দ্বিপান্তরে নিয়ে যায়, মনে পড়ছে? আমি সেখানে ছিলাম মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যার আসামী।

—ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আপনার নামটি···জনমেজয় জানা—নয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—এখন কি করছেন?

—জেল থেকে খালাস হয়েই ওপথ ছেড়েছি! এখন স্বদেশী জিনিষের ব্যবসা করি—ভালই চলছে আপনার আশীর্ব্বাদে।

সন্ন্যাসী নির্নিমেষ নেত্রে ওর পানে চেয়ে রইলেন মিনিট খানেক। ঐ লোকটি বললো,

—কিছু খাবার কিনে আনি, বড় খিদে পেয়েছে—বলেই সে নেমে গেল। সন্ন্যাসী ভাবতে লাগলেন, এই অসাধারণ বিপ্লবী একেবারে পুরো ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছে! আশ্চর্য্য! মাথায় খদ্দরের টুপী, পরণে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী—

খদ্দরের বিছানা বালিশ পর্য্যন্ত। কিসের ব্যবসা করে? খদ্দরেরই ব্যবসায় নাকি? সন্ন্যাসী ভাবছিলেন, লোকটি ফিরে এল। বললো,

—অনুগ্রহ করে যদি কিছু খাবার গ্রহণ করেন!—ঠোঙাটা বাড়িয়ে ধরলো সে ওঁর দিকে।

—ধন্যবাদ—! আমি সন্ন্যাসী, যখন-তখন খাওয়া আমার নিয়ম নয়। আপনি খান।

লোকটি খেতে আরম্ভ করলো। সন্ন্যাসী কয়েকমিনিট একটু ভেবে ওকে শুধুলেন,

—আপনার বৈপ্লবিক মতবাদ তা' হলে পরিবর্ত্তিত হয়েছে?

—হ্যাঁ—ওটা একদম নেই আর—খাবার চিবিয়ে গিলে তিনি আবার বললেন—ও ধাকারো কোনো মানে হয় না। অনর্থক দুর্ভোগ ভুগলাম কিছুদিন। কিন্তু ওতে একটা সুবিধা এবার হবে, আশা করছি। ঐ জেল খাটার সার্টিফিকেটে একটা ভাল কনট্রাক্‌ট্‌ পাবার সম্ভাবনা হয়েছে—সেই জন্যই যাচ্ছি দিল্লী···লোকটী অম্লান হাসলো, বললো আবার—আপনি তো সন্ন্যাস নিলেন—নইলে আজ যে সুযোগ-সুবিধা আমরা পাচ্ছি, যিনি অন্ততঃ মাস দুয়েক ও জেল খেটেছেন—তিনিও ভালরকম চাকরী বা বড়রকম ব্যবসার সুবিধা পাচ্ছেন! এত দীর্ঘ দিন ধরে দেশের যুবকদের কারাবরণ আজ সার্থক—দেশ স্বাধীনতা পাচ্ছে!

—পাচ্ছে ডোমিনীয়ন!—সন্ন্যাসী রুক্ষস্বরে বলেই চুপ করলেন। ওঁর যেন ঘৃণা জেগে উঠছে!

—আপনার যে অসামান্য যোগ্যতা আর বয়সের অভিজ্ঞতা, আপনি ফিল্ডএ থাকলে আজ প্রাদেশিক লাটগিরি ঠেকায় কে!—বলেই লোকটি যেন কিঞ্চিৎ ত্রুটি সংশোধন করবার জন্য বললো—তবে আমরাও ভালই পাচ্ছি! অবশ্য আমরা কৃষক-মজুদুররাজ প্রতিষ্ঠিত করবোই!

—কবে?—সন্ন্যাসী রুক্ষতম কণ্ঠে বললেন আবার, যেন ধমক দিলেন!

—কবে তা কেমন করে জানবো, বলুন? ওঁরা বলছেন, তাই আমাদের-কেও বলাচ্ছেন। এখন বড় বড় লোকেরা তিনটি কাজ করছেন—খেতাব পরিত্যাগ করে ইংরাজকে জানিয়ে দিচ্ছেন, যে, খেতাবের মোহ তাঁদের কিছুমাত্র নেই!

—দু নম্বর?

—হরদম বলছেন কৃষক-প্রজা-মজদুর রাজ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যেন এত কাল কৃষক-প্রজা আর মজদুরের জন্য ওঁদের কারো ঘুম ছিল না!

—তিন?

—এই ল-লেস-নেস অর্থাৎ কিনা, যেমন করে হোক গুণ্ডামী, চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা, নারীহরণ ঠেকাতে হবেই, আর মাইনরিটি রক্ষা, শিক্ষা-সাম্য, সংস্কৃতির পরিরক্ষণ ইত্যাদি যত ভাল ভাল কথা আছে অভিধানে, তিন নম্বরে সবগুলোই পড়ে!

লোকটা হাসছে মৃদুমধুর। বেশ বললো কথাগুলো, কিন্তু সন্ন্যাসীর অসহ্য বোধ হচ্ছে—উনি আধমিনিট খানেক চুপ করে থেকে বললেন,

—আপনি তো কিঞ্চিৎ সুবিধা করে নিতে পারলেন?

—হ্যাঁ, খুব; চান তো আপনিও পারেন। আপনার রেকর্ড আমার থেকে অনেক ভাল।

—আমি কোনো সুযোগ সন্ধানের জন্য দেশের সেবা করি নাই।

—করলে ভাল করতেন। আজ আপনাকে থার্ড ক্লাসে যেতে হোত না, এয়ারে যেতে পারতেন।

সন্ন্যাসী নীরব রইলেন। কিন্তু লোকটি নিজেই বলতে লাগলো,

—বিস্তর দুঃখ পেয়েছেন ওঁরা—বহু লোক মরেই তো গেলেন। যাঁরা ভাগ্যগুণে বেঁচে আছেন তাঁরা দিনকতক অন্ততঃ আধিপত্য করুন, সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটান—তবু মরণ কালে সান্ত্বনা পাবেন!

সন্ন্যাসী যেন বিরক্ত হয়েই উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু গাড়ী চলছে—উনি তাই বললেন,

—রাত শেষ হয়ে এল ; আমার পূজা-উপাসনার দরকার এবার—আপনি যান, শোন গিয়ে।

লোকটি আবার বাঙ্কে উঠে শুলো ; সন্ন্যাসীর পূজ্যা-উপাস্যা একমাত্র দেশমাতা, তিনি সেই চিত্তহারিণী, আসমুদ্র হিমাচলবাসিনী ভারতমাতার কথাই ভাবতে লাগলেন—স্বাধীনা মাতা ! মাতা স্বাধীনা—তাঁর অগণ্য সন্তান আজ স্বাধীনতা-উৎসবের আয়োজন করছেন। দীর্ঘ সহস্র বৎসর পরে হবে এই উৎসব ; এর বিস্তৃত বর্ণনা যুগের ইতিহাসে লিখিত থাকবে। ভারতের সনাতন নিয়মানুসারে ইংরাজ আমলে অবহেলিত জ্যোতিষ-শাস্ত্রকেও নাকি আহ্বান করা হয়েছে শুভ সময় নির্দ্দেশের জন্য। সময় শুভ হোক—মধুময় হোক এই পবিত্র মহাক্ষণ—ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি···

সমস্ত মন্ত্রটা উচ্চারিত হবার পূর্ব্বেই ভীষণ আঘাতে ট্রেণখানা যেন প্রলয় কালের পৃথিবীর মত টলমল করতে লাগলো—উঃ ! কী ভয়ঙ্কর কর্ণবিদারী শব্দ ! তার সঙ্গে তীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদী ক্রন্দন রোল—কি হোল ? হোল কি ?

সমস্ত যাত্রীই জেগে উঠেছে—বাইরে নিদারুণ অন্ধকার আর চীৎকার ক্রন্দন। সন্ন্যাসী নিজকে সম্বরণ করে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখলেন, গাড়ী লাইনচ্যুত হয়েছে, আর ইঞ্জিন সমেত তিনখানা বগি উল্টে গিয়ে বিপর্য্যয় কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে—মৃত্যুর কলকল্লোল—মহাকালের হত্যালীলা ! মানুষের জীবনের বীভৎস অবসান-অধ্যায় কত ভয়ঙ্কর, কত হৃদয় বিদারক···কত করুণ ! মানুষ তার মৃত্যুকে মহিমময় করবার জন্য বহু আদর্শই সৃষ্টি করেছে : যুদ্ধক্ষেত্রে স্বদেশ রক্ষায় মৃত্যু, আশ্রিতকে রক্ষার জন্য মৃত্যু—অপরের প্রাণদানের জন্য মৃত্যু, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপুষ্টির জন্য মৃত্যু—কিন্তু এই যে অনর্থক অপমৃত্যু, এর জন্য দায়ী কে ? বর্ত্তমান সভ্যতা ? নাকি অতীতের ভগবান ?

সন্ন্যাসী নীরবে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন—রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

সামনের ষ্টেশন থেকে সাহায্য না এলে ওঁদের আর যাবার উপায় নেই। জীবিত লোকদের হরেক রকম জটলা—কেউ বলে ড্রাইভারের গা-ফিল্‌তি, কেউ বলে, গুণ্ডাদের কারসাজি, কেউ বলে আর কিছু! কিন্তু এরকম ঘটনা রেলের ইতিহাসে বহুবারই ঘটেছে এবং ঘটবেও। আধুনিক সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান মৃত্যুর হার বৃদ্ধি। বর্ত্তমান সভ্যতা, বর্ত্তমান বিজ্ঞান, বর্ত্তমান রাষ্ট্র মৃত্যুহারকে যতবেশী বাড়াতে পেরেছে, এমন আর কখনো হয় নি—সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দান এই মৃত্যুবাণের শক্তিবৃদ্ধি।

সকাল হোল—অসংখ্য হতাহতের জন্য ব্যবস্থাও হতে লাগলো এবং অন্যান্য যাত্রীদের নিয়ে যাবার জন্য ব্যবস্থাও করা হোল—চলমান পৃথিবী আবার ঠিকই চলতে লাগলো—এতোটুকু থামলো না—সন্ন্যাসীও চলতে লাগলেন দিল্লীর পথে। কিন্তু ওঁর মনটা যেন থমকে গেছে এই ভীষণতার আঘাতে। এর থেকে ঐ সাঁওতাল পল্লীর অসভ্য আদিবাসীদের জীবন কত বেশী নিরাপদ! কিন্তু নিরাপত্তাই জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু নয়। বিপদই মানুষকে সম্পদের পথে, সংস্কৃতির পথে আর সভ্যতার পথে এগিয়ে এনেছে। কিন্তু যে সভ্যতার পথে সে এগিয়ে এল এতকাল, সেই পথকে পিচ্ছিল করে তুলছে তারই সৃষ্ট শক্তি-মত্ততা—এই শক্তিই তার মৃত্যুরূপী মহাকাল।

সন্ন্যাসী দিল্লী পৌছালেন।

—পাওয়ার পলিটিক্স, নেতৃত্বের মোহ তো দিনে দিনে বেড়েই চলেছে, বড়দা!

উৎপলা রাস্তায় নেমেই বললো বড়দাকে, কথা কইয়ে কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক করবার জন্য: কারণ ভাইএর বিপদের জন্য ওর মন নিশ্চয়ই ভারী হয়ে রয়েছে।

তা ছাড়া ঐ আজীবন কংগ্রেস সেবকের মতামতগুলোও জানতে ইচ্ছে ওর। বড়দা একটু গম্ভীর ভাবেই উত্তর দিলেন,

—নেতৃত্বের মোহ বড়ই ভয়ঙ্কর বস্তু উৎপলা, তার থেকে রেহাই পাওয়ার মত মনোবল কৈ আমাদের? স্বয়ং গান্ধিজি সেদিন এর জন্য গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন প্রার্থনান্তিক সভায়।

—তাহলে এই স্বাধীনতা লাভের শ্রেয়ঃ কেমন করে আমরা লাভ করবো বড়দা! উৎপলার কণ্ঠস্বরে ঐকান্তিকতার সঙ্গে যেন সকরুণ অবসাদ রয়েছে। বড়দা ওর পানে চেয়ে বললেন,

—নিরাশ হবার কারণ নেই দিদি—গণমনের ঐরাবৎ জেগে উঠেছে, ক্ষমতার মোহ সে টুটিয়ে দেবে! আজ যাঁরা পদাধিকারী হতে চলেছেন, তাঁদের শক্তি যোগায় যারা, তারা আজ জাগ্রত!

—না—না বড়দা, তারা আজো পূর্ণরূপে জাগে নি—কৃষ্ণা প্রতিবাদ করলো, —তারা জাগলে হাজার দলে আর হাজার মতবাদে দেশটা খণ্ডবিখণ্ড হোত না। কেউ চাইছেন জাতীয়তা, কেউ চাইছেন হিন্দুত্ব, কেউ সোস্যালিজিম্, কেউ কমিউনিজম্, কেউ বামপন্থী, কে দক্ষিণী, কেউ উগ্র ধর্ম্মান্ধ, আবার কেউ ধর্ম্মকে উচ্ছন্ন দিয়ে শুধু চায় জাতীয়ত্ব! কার কথা ওরা শুনবে? ওরা, অর্থাৎ ঐ ঐরাবতের দল? গলার জোরে বহু অসত্য কথা সত্য না হলেও সত্যের মর্য্যাদা অন্ততঃ কিছুদিন পায় বড়দা—ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাসে এর বহু প্রমাণ পড়ে আছে। আজও যার যত গলার জোর, সে তত তারস্বরে তার মত প্রচার করে; যার যত দৈনিক কাগজ হাতে, তার মতবাদ ঐরাবতদের কানে তত বেশি জোরে পৌছায়—ঐরাবৎরা আজো সেই প্রপাগেণ্ডারই পথ থাকে চেয়ে—পরমত-নির্ভরশীল হয়!

—থামো কৃষ্ণা—বড় উগ্র হয়ে উঠছো তুমি—বড়দা মৃদু হেসে বললেন—বৃহত্তর কোনো পরিবর্ত্তনের সময় বহু বিপর্য্যয়, বহু বিরোধ, বহু বিচ্ছিন্নতা দেখা

দিয়ে থাকেই—এটা ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু তা দেখে নিষ্ঠাবান কর্ম্মী কখনো নিরাশ হন না!

—নিরাশ আমি হচ্ছি নে। যে স্বাধীনতার সূর্য্যালোক আসছে আজ আমাদের আঁধার ঘরে, তাকে অভিনন্দন দেবার জন্য আমি শাঁক-উলু-আল্‌পনা নিয়ে প্রস্তুত রয়েছি; কিন্তু বড়দা, সত্যি কি আমরা স্বাধীনতা পেলাম? আমাদের ভারতমাতা শুধু ভাগ হোল না, আমাদের বাঙলা-মাও ভাগ হয়ে গেল, আমাদের এক ভাষা ভাষী হিন্দু-মুসলমান দুভাই ভিন্ন হাঁড়ি হোল—আমাদের সংস্কার সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র বাংলা-সাহিত্য, পূর্ব্ব পাকিস্থানে কে-জানে কিসে, আর পশ্চিম বাংলায় বাংলার বদলেই হয়তো হিন্দুস্থানীতে হাত পাকাবে। কত ক্ষয় আর ক্ষতি হলো বড়দা, যদি খতিয়ে দেখা যায়, তাহলে এই স্বাধীনতায় অন্ততঃ বাঙালীর আনন্দ করবার কিছু পাই নে।

—আমরা ধীরে ধীরে আবার সব গড়ে তুলবো কৃষ্ণা! মহাত্মাজী সেদিন গভীর বেদনার সুরেই বলেছেন, 'ভারত দু ভাগ হওয়ায় থেকে দুঃখের আর কিছু নেই। আর বেশি ভাগ হলে সে পাপ যুগান্তরেও খণ্ডাবে না!'

—কিন্তু আরো বেশি ভাগ হচ্ছে—হবে—উৎপলা বললো—মহাত্মাজী যাই বলুন বড়দা, যত ব্যথার কথাই উনি শোনান, বর্ত্তমান তোষণ-নীতিই এর জন্য দায়ী।

—মিট্‌মাটের চেষ্টার সর্ব্বশেষ স্তরেও নেমে ছিলেন নেতারা। কিন্তু উৎপলা, এতে নিরাশ হলে চলবে কেন? এটা নিশ্চয়ই বেদনার কথা, কিন্তু অনিবার্য্যকে স্বীকার করার ঔদার্য্য আমাদের থাকা উচিত। বিভক্ত ভারতের সবটাই তো আজ বৃটিশ শাসন থেকে মুক্তি পেল—একি কম আশার কথা? যদি অখণ্ড ভারত ইউরোপীয় রাজনীতি আর সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব মুক্ত হয়ে খাঁটি ভারতীয় আদর্শ বিশ্বমানবের কল্যাণে লাগাতে পারতো, তাহলে বিশ্বের ভবিষ্যৎ সভ্যতা হোত বিস্ময়কর; কিন্তু তা না হলেও, যেটুকু হোল,—তার পূর্ণ সুযোগ আমরা নিতে পারলেও মানুষ উপকৃত হবে।

—হয়তো হবে—উৎপলা যেন নিরাশায় আশা জাগিয়ে বললো কথাটা। বড়দা বললেন,

—শোনো—ঐতিহাসিক যুগথেকে ভারত অখণ্ড ছিল না—ইংরাজ তাকে অখণ্ড করেছিল! তার শৃঙ্খলে বন্দী পরাধীন ভারতের অগণ্য জনশক্তির জীবন স্তব্ধ থাকা সত্বেও এ দেশের প্রতি মানুষ এমন একটা বেদনার ঐক্য অনুভব করেছে সমগ্রভাবে, যার ফলে সারা ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের রূপ হোল এত প্রচণ্ড। কিন্তু ইংরাজের কূটনীতি অখণ্ড ভারতের জাতীয়তাবাদের এই ঐক্যকে বারম্বার খণ্ডিত করেছে, সংহত হতে দেয় নি,—তার সব দোষটাই কিন্তু ইংরাজের নয়, আমাদের মধ্যেও ভেদ বুদ্ধি ছিল বলেই ইংরাজ তার সুযোগ নিতে পারলো।

—সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে গেল কংগ্রেস নিশ্চয় অখণ্ডতা রাখতে পারতো ভারতের।

—হয়তো পারতো কিংবা হয়তো আরো বেশি বিভেদ-বিদ্বেষ জাগতো ভারতে এবং সেই প্রাচীন দিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যেত ভারত; কারণ রিভলিউসনের অনিবার্য্যতা কাউণ্টার রিভলিউসনে প্রকাশ পায়! কংগ্রেস যা করেছে, ঠিকই করেছে—ভারত ভাগ স্বীকার করেছে বলেই অখণ্ড ভারতের আদর্শ কংগ্রেস ত্যাগ করে নি! গণকল্যাণের পথে আজকার খণ্ডিত স্বাধীন ভারত যদি বিশ্বকল্যাণের পথে অগ্রসর হতে পারে, তাহলে খণ্ডতা-অখণ্ডতার প্রশ্নই তার কাছে আসে না—তবে সেটা করা দরকার।

—কেমন করে সেটা হবে?—উৎপলার কণ্ঠে যেন বিদ্রূপ; কিন্তু শান্তকণ্ঠে বড়দা বললেন,

—হবে। ভারতের মহাসৌভাগ্যে যে তার মহানেতা মহাত্মাজী। তাঁর আদর্শে এবং পরিচালনায় ভারত বিশ্বের কল্যাণব্রতে আত্মোৎসর্গ করে ধন্য হবে। শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে নিজের দেশের সুখ-সম্পদ বৃদ্ধি এবং পররাজ্যের উপর লোলুপ দৃষ্টিই যদি এই স্বাধীনতা লাভের

একমাত্র উদ্দেশ্য হোত, তা হলে এ স্বাধীনতা না আসাই উচিৎ ছিল,—কিন্তু তা নয়। আমাদের আদর্শ অনেক মহৎ, দৃষ্টি অনেক দূরপ্রসারী! তাই আজ স্বাধীনতার তোরণদ্বারে ভারতের চোখে ভেসে উঠছে সমগ্র জগৎ, অখণ্ড পৃথিবী, আগামী যুগের মানব-সভ্যতা···কিছুক্ষণ থেমে উনি আবার বললেন—, সৈন্য নিয়ে ভারত কখনো দেশজয়ে বের হয়নি—কিন্তু তার সাংস্কৃতিক বিজয়ের ইতিহাস চীন, কম্বোড়িয়া, যবদ্বীপ, মালয়—জাপান—ব্রহ্মদেশে আজো অক্ষয় হয়ে রয়েছে। সে বিজয় মানুষের পরাধীনতার শৃঙ্খলে মসীময় নয়,—মানুষের মুক্তির মন্ত্রে অভিষিক্ত। ভারতের সেই আদর্শ ই সনাতন এবং পৃথিবীতে সেই আদর্শই সত্য হবে।

—হবে বড়দা? সত্যিই হবে?—কৃষ্ণা সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলো।

—হবেই—ভারতের প্রাচীনতম আত্মা তাই আজ নবযৌবন লাভ করলো জাতির মুক্তি-যজ্ঞের পূর্ণাহুতিতে!

ওঁরা হাসপাতালে পৌছালেন।

লকুর শয্যাপ্রান্তে বসে একটি সুন্দরী নারী—রোদনাতুরা। ওদিকে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে একজন পুরুষ! কৃষ্ণা বা উৎপলা ওদের কখনো দেখে নি, কিন্তু বড়দা দুজনকেই চেনেন। বললেন,

—আবার কাঁদছো তুমি, শুভ্রা! তোমায় অত করে বুঝিয়ে এলাম, সকালে।

—ঘেন্নায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে বড়দা,···শুভ্রার কণ্ঠস্বরে গভীর বেদনা!

—কিন্তু এখনো ওঁর মস্তিষ্ক অত্যন্ত দুর্ব্বল···উৎপলা ঝাঁজের সঙ্গে বললো— কি আপনার হয়েছে, আমি জানি না, যাই হোয়ে থাক্, ওঁর পায়ের কাছে বসে আপনার কাঁদা উচিৎ হচ্ছে না।

সত্যি : শুভ্রা যেন এক মুহূর্তে সামলে গেল। লকু উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে—ওর মাথায় যেন এই নরনারীর বাক্যালাপ প্রবেশই করছে না। কৃষ্ণা বলল,—কতক্ষণ থেকে এ রকম দেখছেন আপনারা ?

—আধঘণ্টা প্রায় হোল।—সনৎ জানালার কাছ থেকে সরে এসে বলল।

বড়দা তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে ডেকে আনলেন। ডাক্তার ভাল করে পরীক্ষা করে বললেন—এখন দু'একদিন আপনারা এত বেশি লোক আসবেন না একসঙ্গে। আমি ওকে ঘুম পাড়িয়ে দেব—আপনারা চলে যান।

সকলেই চলে আসতে বাধ্য হোল, শুধু উৎপলা ডাক্তারকে বলে এল যে, রাত আটটার সময় সে ফোন করে যেন খবর পায়। বাইরে এসে বড়দা ওদের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং কি ভাবে এই বিপর্যয় ঘটেছে তাও সনৎ জানালো! শুভ্রা লজ্জায় ঘৃণায় অধোমুখে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। উৎপলা নিজের তিরস্কারের কথা স্মরণ করে শুভ্রাকে বললো—সত্যিই ঘৃণার কথা শুভ্রা দেবি, কিন্তু মানুষের জীবনে ওর থেকে অনেক বেশী ঘৃণার্হ ঘটনা ঘটে থাকে—আমারই জীবনে ঘটেছে। ঈশ্বর পরম মঙ্গলময়—এই সত্য মানুষ সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে বিশ্বাস করে ঐ ঘৃণিত জীবনের পথেও যখন সে পরম সত্যের আলোক দেখতে পায়। দেখতে সে পায়ই, শুধু চাইতে হবে দেখবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। কাঁদবেন না, আপনার জীবন হয়তো অন্য কোনো দিক থেকে সার্থক হয়ে উঠবে! আমি একটা বিরাট কাজের প্ল্যান করেছি, আপনাদের দরকার হবে।

—আমায় নিন! এই দেহমন নিয়ে আমি স্বামীসেবা আর করতে চাইনে! শুভ্রার কণ্ঠে করুণতম আবেদন—ওর দেহবল্লরী ক্রন্দনের আবেগে কাঁপছে থরথর। কিন্তু সনৎ সস্নেহে বলল—তোমায় আমি মুহূর্তের জন্যও অপবিত্র মনে করি নি শুভ্রা। আমি বড়দার কথাই বিশ্বাস করি—নারীর হিরণ্যদেহ কোনো সময়েই কলুষিত হয় না! তবে দেশাচার আছে, কিন্তু তাকে অগ্রাহ্য করবার সাহসও আছে আমার।

—দেশাচারও বদলাতে আজ বাধ্য হবো সনৎবাবু—কৃষ্ণা বললো—নইলে

পূর্ব্ববঙ্গে, কলকাতায়, পাঞ্জাবে এবং ভারতের সর্ব্বত্রই আজ যে তাণ্ডব চলছে, তাকে ঠেকাবার আর কোনো উপায় নেই। জাতিকে আজ জীবিত রাখতে হলে দরকার হবে তার জীবনীশক্তিতে নতুন বিধানের রস সঞ্চার, নতুন নিয়মের প্রবাহ,—নতুন সমাজের পত্তন—যে সমাজ নারীকে অকারণে পতিতা বলে ত্যাগ করতে পারবে না—অস্পৃশ্যবোধের অহঙ্কারের আভিজাত্যে উদ্ধত হতে পারবে না—বিশেষ শ্রেণীগত জন্মসৌভাগ্যে ব্যাভিচার করেও এড়িয়ে যেতে পারবে না—অর্থের ঔদ্ধত্যে অবিচার করতে পারবে না। মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখতে শেখাবে সেই সমাজ সেই রাষ্ট্র।

বড়দা ওর কথা বলার ভঙ্গী দেখে বললেন—তুই তো বেশ কথা বলিস কৃষ্ণা!

—দাদার কাছে শিখেছি। বলে কৃষ্ণা হাসলো মিষ্টি।

দাদা অর্থে লোকাধীশ। কৃষ্ণার পূর্ণ পরিচয় জানেন না বড়দা—তবে শুধু জেনেছেন যে ওর বাবা উনিশ শ' চোদ্দ সালের বিপ্লবী এবং কাকা এক বিরাট শ্রমিক-সঙ্ঘের নেতা। ভাই বোন নেই ওর। লোকাধীশের সঙ্গে যোগ দিয়ে কৃষ্ণা সাহিত্য সাধনার ব্রত গ্রহণ করেছে—তাই বড়দা বললেন,

—লকুর সৌভাগ্য যে তোর মত শিষ্যা পেয়েছে। যদি বেঁচে ওঠে তাহলে তুই ওকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী যাস, সেখানে তোদের বৌদি আছে—তারও সাহিত্যপ্রীতি তোদেরই মত।

—শুনেছি আমি দাদার কাছে। দাদা ভাল হলেই আমরা যাব!

বড়দার সহকর্ম্মী এক বন্ধুর বাড়ী থেকে গাড়ী এলো তাঁকে নিয়ে যেতে। উনি গাড়িতে উঠে বললেন—দুচারজন বন্ধুব সঙ্গে দেখা করে আমি তোদের ওখানেই ফিরে যাব। তোরা বাড়ী ফিরে যা।

উনি চলে গেলে পর উৎপলা নিজের গাড়ীতে পৌছে দিল সনৎ আর শুভ্রাকে—তারপর কৃষ্ণাকে নিয়ে মণ্ডপে ফিরলে। কৃষ্ণা সারা পথ কথা বলে নি। এতক্ষণে বললো—তোমার প্ল্যানটার কথাই ভাবছিলাম, পলাদি। মানুষের জগৎ থেকে এই হত্যার কলঙ্ক মুছে ফেলতে হলে মা'কে এগিয়ে আসতে

হবে। মাতৃজাতিরই এই দায়িত্ব, কিন্তু মাতৃজাতিকে বড় বেশী দুর্ব্বল করে রাখা হয়েছে বহু যুগ ধরে···তার উপায় কি করবে ?

—করতে হবে তার উপায়। শক্তিকে দুর্ব্বল বলে অস্বীকার করা মূঢ়তা, সেই মূঢ়তা ওদের ভাঙতে হবে। পুরুষ গঠিত এই পৃথিবীর সভ্যতায় নারীর দান পুরুষের থেকে বেশি—এমন কি, সভ্যতার মূলরস নারীই যুগিয়েছে।

—সেই সভ্যতাকে ধ্বংস করতে বসেছে পুরুষ—নারী কেন তা সহ্য করবে ? তার নৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে দিতে হবে, পলাদি—বিশ্বের নারী-শক্তিকে নিশ্চিতরূপে বুঝিয়ে দিতে হবে যে তার সন্তানমেধযজ্ঞ সে আর হ'তে দেবে না !

—ভারত আজ স্বাধীন হচ্ছে। স্বাধীন ভারতের আন্তর্জ্জাতিক মূল্য কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আর ভারত তার বিশিষ্ট সভ্যতায় নারীর শ্রেষ্ঠত্ব চিরদিনই স্বীকার করেছে—সৃজয়িত্রী বলে সম্মান দিয়েছে—পালয়িত্রী বলে পূজা করেছে।

—কাজেই এই হত্যার বিভীষিকা বন্ধ করবার দায়িত্ব সর্ব্বাগ্রে ভারতীয় নারীর—কৃষ্ণা সমর্থন করল।

দুড়ুম ! দুড়ুম ! পর পর দুটো আওয়াজ হয়ে গেল, নিতান্ত নিকটে। এ বেলা শান্তই ছিল মহানগরী—আবার অশান্ত হয়ে উঠলো। কে জানে, কি কারণে এমন আকস্মিক ভাবে ওরা এমন করে মারমুখী হয়ে ওঠে। মণ্ডপের বাসিন্দা অন্যান্য মেয়েগুলি ছুটে এসে ঢুকলো উৎপলার ঘরে। উৎপলা আশ্বাস দিয়ে বলল,

—থাম্ থাম্, অত ভয় কেন ? মরতে একদিন হবেই। যে মৃত্যু অনিবার্য, তাকে গৌরবান্বিত করবারই সাধনা করে চল্ জীবনের বাকী কয়টা ক্ষণ। ভীরুতার কলঙ্ক মাখাসনে সেই মরণের গৌরবে।

বলেই উৎপলা আশ্চর্য্য ত্বরিতবেগে বাইরে বেরিয়ে গেল। কৃষ্ণাও গেল

সঙ্গে। অন্যান্য মেয়েগুলি ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। উৎপলা একেবারে রাস্তায় নেমে গিয়ে বলল,

—আমি আমার হিন্দু আর মুসলমান ভাইদের মাঝখানে দাঁড়ালেম,—আমায় গুলি করে মার।

কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ। উৎপলা আবার বললো,—তোমরা আমাদের ভাই, আমাদের স্বামী, পুত্র—সর্ব্বস্ব—তোমাদের নিয়েই আমরা এই সভ্যতার সংসার গড়েছি—সেকি এমনি করে হত্যার উৎসব করবার জন্য ? তোমাদের মা-বোন-স্ত্রীর চোখের জল কি শুকিয়ে গেছে, ভেবেছ ? না, তারা আমাদের মতই তোমাদের জননী, ভগ্নি, কন্যা, আমাদের মতই তারা কাঁদছে। তোমরা এমনি করে নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করবার আগে নারী-জাতটাকে কেটে ফেল—তারপর তোমরা মর, পৃথিবী শ্মশান হোক !

ওর আবেগমাখা কথাগুলোতে কাজ হোল। দুই পক্ষই রুদ্ধ আক্রোশে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—অকস্মাৎ একজন এগিয়ে এসে বলল—সত্যি কথা মা, যে পক্ষেরই যে-কেউ মরুক, তার মা-বোন-স্ত্রী অনাথা হয়।

—তাহলে এই তাণ্ডব থামে না কেন ?—উৎপলার ওষ্ঠ কাঁপছে।

—আপনাদের মতন জনকয়েক মা যদি এই শান্তির বাণী নিয়ে পল্লীতে পল্লীতে ঘোরেণ, তাহলে হয়তো মানুষের এই বর্বর দানব-শক্তির কিছু চৈতন্য হয়।

—বেশ, তাই হবে !—উৎপলা বললো।

মহানগরীর আকাশ-বাতাস মৃত্যু-মলিন। স্তব্ধতার আতঙ্ক নেমেছে পৃথিবীতে দৈত্যের মত। উৎপলা ঘরে-ফিরে চুপকরে বসেছিল। যে নীতি সে আজ গ্রহণ করলো, তাকে প্রসারিত করে বিশ্বের মাতৃজাতির অন্তরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে—নারীকে বোঝাতে হবে, সে শুধু নিখিল-পুরুষ-চিত্তের উর্ব্বশীই

নয়, নিখিল মানব-সভ্যতার মাতা—কন্যা—বধূ! পশ্চিমী সভ্যতায় নারী শুধু প্রেয়সী,—কিন্তু প্রাচ্যভুবনে নারী সৃজয়িত্রী জননী। ভারতীয় সভ্যতায় নারী রুদ্রেরও জননী, আবার সৃজয়িত্রী রুদ্রাণী, নারীকে অতবড় সম্মান জগতের আর কোনো জাতিই দেয় নি—কিন্তু সম্মানকে প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় আবদ্ধ রাখলে আর চলবে না—ভারতের নারীকে তার শান্তিবাহিনী গঠন করে বিশ্বশান্তির কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে—নইলে ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদান থেকে বঞ্চিত হবে পৃথিবী!

উৎপলার ওখান থেকে হাঙ্গামাকারীরা চলে গেছে বটে, কিন্তু হাঙ্গামা থামে নি; চলছে বন্দুকের আওয়াজ, অসহায়ের আর্ত্তনাদ, আর আততায়ীদের উল্লাসধ্বনি! উঃ উঃ উঃ! নিকটেই কোথায় কাতর ক্রন্দনধ্বনিতে অতিমাত্রায় বিচলিত হয়ে উঠলো উৎপলা। 'কী ভীষণ! ওরে থাম্'…আমি তোদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবো—আমি—আমি হিন্দু নই, আমি মুসলমান নই, আমি খৃষ্টান, পার্শী, শিখ…সম্প্রদায়ের গণ্ডীবদ্ধ ধর্ম্মের কেউ নই, আমি মা—আমি জননী—আমি সব মানবসন্তানের জননী…আমার বুক খালি করে তোরা এমন করে হত্যার উৎসবে মাতিস না। বড় দুঃখে আমি হিন্দুর জননী, আমি মুসলমানের জননী, আমি খৃষ্টান, শিখ-পার্শীর জননী তোদের লালন করেছি সভ্যতার আলোতে—সে কি এর জন্য!

কোন্ এক বিস্মৃত দিনের বেদনাতুরা জননী যেন ওর মধ্যে জাগ্রত হয়ে উঠেছে, যেন এই আহবে মত্ত, অগণ্য আততায়ী আর অসংখ্য আহত সকলেই ওর সন্তান! কিন্তু কোথায় ওর সন্তান? কে ওর সন্তান? উৎপলা আত্মসংবরণ করার চেষ্টা করতে লাগলো!—বহুদিন হোল, উৎপলা তাকে নিজের হাতে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছে কুমারী-জীবনের কলঙ্ক ভেবে। কিন্তু সে উৎপলার শরীরাশ্রিত সন্তান। আজও উৎপলার বত্রিশ নাড়ীতে তার পদচিহ্ন পরিস্ফুট, তাকে ভোলা যায় না—যায় না! কে জানে কোথায় সে? হয়তো এই মত্ততার মধ্যে তার শিশুকণ্ঠ 'মা-মা' রবে……

উঠেছিল সমুদ্র মন্থনে! স্বাধীনতারূপ অমৃতের আবির্ভাবের এটা পূর্ব্বাভাস! তোরা চাইছিস, এক দিনেই সব ঠিক হয়ে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক; কিন্তু তা হয় না। বহু পুরাতন একটা রাষ্ট্রচক্র বদলে গিয়ে নতুন একটা আসছে! তাকে সর্ব্বাগ্রে শক্তিশালী হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে দে—আজ যে জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে দিকে দিকে—তার জট খুলে শৃঙ্খলা স্থাপন করতে যে সময় দরকার, তা দিতে হবে…তারপর আমরা দেখাবো, সবই ঠিক হয়ে গেছে।

—তাই হোক বড়দা…সুদীর্ঘ তমসার পারে আজ যে নবীন সূর্য্যের আলোকাভাস জেগেছে, তাকে বরণ করতে শৃঙ্খলা, সাম্য আর শান্তিই আজ বড় বেশি প্রয়োজন! ভারত যদি তার আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অক্ষম হয়, তাহলে এই স্বাধীনতাও সে রাখতে পারবে না।

—সেই জন্যই এই অন্তর্বিদ্রোহকে সর্ব্বাগ্রে শাসন করা দরকার এবং কংগ্রেস তাই করছেন!

—'শাসন' কথাটা আপনি প্রত্যাহার করুন বড়দা—কৃষ্ণা হেসে বললো—স্বাধীনতার সজ্ঞা শুধু শক্তির হাত-বদলানোতেই সীমাবদ্ধ নয়, শাসকের হৃদয়বৃত্তির মহত্ত্বও তাতে রয়েছে।

—মহত্ত্ব মানুষের জন্য, প্রজার জন্য, পৃথিবীর জাতিধর্ম্ম-সমাজের সকল মানুষকে মানুষের হৃদয়বৃত্তিতে দেখবার ঔদার্য্যের জন্য মহত্ত্ব, কৃষ্ণা—চোর, ডাকাত, খুনী—বা দেশদ্রোহীর জন্য মহত্ত্ব নয়—। আজ যারা নানা দল পাকিয়ে, নানা মত প্রচার করে, নানান দাবী তুলে এবং নানান ছুতোনাতায় আমাদের স্বরাজশক্তি দুর্ব্বল করতে চাইছে—বিশ্বের কাছে প্রমাণিত করতে চাইছে আমাদের অক্ষমতা, তারা শুধু আমাদের শত্রু নয়, তারা দেশের এবং পৃথিবীর শত্রু। তাদেরকে শাসনই করতে হবে!

কৃষ্ণা আর কিছু বললো না। এঁর সঙ্গে তর্ক করতে ওর বাধে যেন।

বড়দা জানালেন,—ভোর সাড়ে ছটায় এরোপ্লেনে উনি দিল্লী যাবেন। কৃষ্ণা আর উৎপলা রইল লকুকে দেখবার জন্য।

বেলা তিনটার সময় টেলিগ্রামখানা হাতে পেয়ে সুবোধ মহা উৎসাহিত হয়ে উঠলো। স্বাহার সঙ্গে দেখা করবার একটা সুযোগ—সেঁজুতি ওখানে প্রায়ই থাকে। বড়দা তার নামে 'তার' পাঠানোতে সুবোধ আজ সত্যি গৌরব অনুভব করলো। বড়দা তো আজ আর জাতে-ঠেলা জেলকয়েদী নন—আজ তিনি রাষ্ট্রযন্ত্রের একটি বিশিষ্ট চক্র।

দাড়িটা কামিয়ে মুখে কিঞ্চিৎ প্রসাধন দ্রব্য লেপন করলো সুবোধ, স্বাহাকে মুগ্ধ করবার জন্য নয়, সেঁজুতির সঙ্গে দেখা হবার আশায়। ধুতি-পাঞ্জাবী বাজারে নেই কিন্তু ব্ল্যাকমারকেটের দৌলতে সুবোধের ওসব প্রচুর। তবে সুবোধ সে-সব পরলো না। খদ্দরের ধুতি আর ফতুয়া পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একবার দেখে নিলে। তারপর গান্ধী টুপীটা মাথায় বসিয়ে আবার দেখলো,—কোথায় যেন খুঁৎ বোধ হচ্ছে। বুকে একটা ব্যাজ থাকা দরকার··· সুভাষের ব্যাজ আছে ওর, লাগিয়ে বেরুলো।

সেঁজুতির বাড়ী রাস্তাতেই পড়ে। উদ্বিগ্ন সেঁজুতি পাঁচিলের ধারে শিউলী গাছটার ডাল ধরে দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ থেকে। পিওনের অপেক্ষাই করছিলো হয়তো। সুবোধ তাকে দূর থেকে দেখেই নিজেকে আর একটু সামলে নিয়ে সস্নেহ সুরে ডাকলো,

—বড়দার 'তার' পেলাম সেঁজুতি, লকু ভাল আছে। বৌদিকে খবর দিতে যাচ্ছি।

সেঁজুতি দুহাত তুলে মাথায় ঠেকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল; সুবোধের পিছনে চলতে লাগলো স্বাহার বাড়ী। সুবোধ পিছনের সেঁজুতিকে লক্ষ্য করে বলছে,

—লকু তো ভাল আছে। এখন আমাদের একটা কাজের মত কাজ করতে হবে সেঁজুতি, তোকে সাহায্য করতে হবে! বৌদিকে তো চাই-ই! কি কাজ আন্দাজ করতে পারিস্?

—তোমার বিয়ের বন্দোবস্ত?—সেঁজুতি হেসে উঠলো। হাসি তার স্বভাবগত। গভীর দুঃখের মুহূর্তেও ও হাসতে পারে অবাধে! কিন্তু হাসিটা বহু সময়েই দুঃখের বাহ্যিক প্রকাশ।

—বিয়ের এখন সময় কৈ রে? আর কনে'ই বা কোথায় পাচ্ছি, বল?

– কনে'র অভাব নেই, আর সময়েরও অভাব হবে না। যা সাজগোজ করে বেরিয়েছ রাস্তায়! পুরাকালের পক্ষীরাজ একটা থাকলে বলা যেত যে "কেশবতী কন্যে"র খোঁজেই চলেছ—হিঃ হিঃ!

সুবোধ লজ্জিত হোল না, সাহসী হোয়ে উঠলো। অকস্মাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললো,

—কেশবতীর আজকাল কদর নেই, এখন সাঁজবাতির দামই বেশী! কেশ তো আজকালকার মেয়েরা বব্ করে দেয়! এখনকার যুগ চায় আলোর মত, শিখার মত, বিদ্যুতের মত মেয়ে!

সেঁজুতি হাসিমাখা মুখেই ঠোঁটখানা একবার কামড়ে নিল। বললো,

—আলেয়াকেও আলো ভ্রম হয়; শিখায় পতঙ্গরা পুড়ে মরে, আর বিদ্যুতে থাকে সংহার-বজ্র! ও রকম চাওয়াকে প্রশংসা করা যায় কেমন করে সুবোধ দা?

—শক্তিকে সংহত করেই মানুষ সভ্যতার সৌধ রচনা করেছে সেঁজুতি—, সুবোধ মৃদু হেসে বলল। —আদিম দিনের বাড়বাগ্নি থেকে আজকার এ্যাটোম-বোম্ পর্যন্ত সবই শক্তির সংহতির লীলা।

কথাটা ভারী চমৎকার বলেছে সুবোধ। যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ জাগছে ওর মনে। সেঁজুতি হেরে গেল আজ ওর সঙ্গে কথার পাল্লায়! কিন্তু সেঁজুতি বললো,

—মানুষ কিন্তু আজো তার লোভ, পাপ আর অহঙ্কারকে সংহত করতে শিখলো না—তার সভ্যতার সৌধের কোণায় কোণায় তাই শক্তির মত্ততার ফাটল। ম্যাজিনো লাইন গড়েও ফ্রান্স আরামে ঘুমুতে পারে নি; উড়োবোমা

আবিষ্কার করেও জার্মানী যুদ্ধে হারলো। শক্তির সংহৃতি সর্বকালের আচরণীয় হয় নি ; সে সত্য দেশ, কাল এবং পাত্র সাপেক্ষ হয়েই রয়েছে। আজ যে নদী তটের সংযমে শাসিত, কে বলতে পারে কাল সেই নদী তটভূমি উৎসন্ন করে দেবে কি না ? শক্তির সংযমনে যে সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে, শক্তির অসংযমেই সেই সভ্যতা যুগে যুগে ধ্বংস হয়েছে।

—তবু শক্তিকে আয়ত্তীভূত করা আনন্দের, আর মানুষ চায় আনন্দই ! সুবোধ দৃঢ় স্বরে জানালো কথাটা।

—আনন্দেরও আবার প্রকার-ভেদ আছে, ভৌমানন্দ আর ভুমানন্দ !

—ও সব তো আধ্যাত্মিক কথা সেঁজুতি ?

—শক্তি যেখানে সত্যই সর্ব্বকালের জন্য সংহত, সেটা আধ্যাত্মিক জগৎ— এবং সেইটাই সত্য জগৎ !

সুবোধ বুঝতে পারছে না সেঁজুতির কথাগুলি! অতি সাধারণ প্রেম নিবেদনের বাঁধা রাস্তা ছেড়ে একেবারে দর্শন শাস্ত্রের অন্ধকার পথে এসে পড়েছে ওরা। সুবোধ চুপ করে চলতে লাগলো। লকুদের বাড়ীর দরজাতেই এসে পড়েছে। সুবোধ গলায় একটা শব্দ করে সাড়া দিয়ে জানালো যে সে আসছে ; তারপর ঢুকে পড়লো, পিছনে সেঁজুতি। স্বাহা ঘুমন্ত ছেলেটার পাশে চুপ করে বসেছিল। ওর চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায়, গতরাত্রি থেকে ও ঘুমোয় নি। সুবোধ প্রসন্ন কণ্ঠে বললো,

—অত ভাবছো কেন বৌদি—লকু ভাল আছে। এই দেখ, বড়দার 'তার' পেলাম।

'তারটা' সে দিল স্বাহার হাতে। স্বাহা এক মিনিট চেয়ে দেখলো, তারপর উঠে গিয়ে তুলসীতলায় প্রণাম করলো গলায় আঁচল জড়িয়ে। ঈশ্বর-বিশ্বাসের সেই অনাদি কালের ধারা ওর প্রণাম নিবেদনের মধ্যে পরিব্যক্ত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক যুগেও বাঙালীর মেয়ে ঈশ্বরকে ছাড়তে পারলো না। দেশ স্বাধীন হলে এই সমস্ত আচার বিচারের ব্যাপার আরও বেড়ে যাবে। সুবোধ

ভাবছিল এই রকম কত কি—ওর ইংরাজী শিক্ষিত বিলাসী বৈদেশিক মনের কাছে এই রকম প্রণাম-প্রার্থনা একান্ত অর্থহীন বোধ হয়। স্বাহা উঠে বললো,

—ভাল খবর দিলে ঠাকুরপো, ভগবান তোমার ভাল করুন!

—তা করবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে, বৌদি—দিতে হবে!

—কি চাই, বলো! আমার সাধ্য থাকলে নিশ্চয়ই দেব।

—ভারত স্বাধীন হচ্ছে বৌদি—১৫ই আগষ্ট আর দূরে নয়…সুবোধ একটু থামলো।

স্বাহা উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে ও কি বলে শুনবার জন্য; সেঁজুতিও উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে।

—আজ এই স্বাধীনতালাভের পূর্ব্বে আমাদের সর্ব্বপ্রথম আর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হবে, এই স্বাধীনতার বেদীমূলে যাঁরা আত্মদান করে শহীদ হয়েছেন, তাঁদের স্মরণ করা—সম্মান করা!

—হ্যাঁ—জাতির কাছে সে কর্ত্তব্য সকলের আগে। শুধু স্মরণ করা আর সম্মান দেখানোই যথেষ্ট নয়, ঠাকুরপো,—জাতীয় যৌবনশক্তির কাছে সেই জ্বলন্ত দেশভক্তি জাগ্রত রাখতে হবে আমাদের।

—হ্যাঁ, বৌদি, স্বাধীন ভারত যেন দেশের জন্য অমনি হাসিমুখে প্রাণ দিতে পারে। তাই আমরা ঠিক করেছি, আগামী ১৪ই তারিখে আমাদের বিপ্লবী নেতা সঙ্কর্ষণের মৃত্যু-বাৰ্ষিকী উদ্‌যাপন করবো। তোমাকে সেই যজ্ঞের ঋত্বিক হতে হবে—কারণ তুমি শুধু তাঁর কন্যাই নও, তুমি তাঁর জ্বলন্ত রক্তের জাগৃতি শক্তি! আমি আয়োজন করছি, বৌদি, তুমি সম্মতি দাও।

কথাটা শুনে স্বাহা কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল। নেতা সংকর্ষণের ন্যায্য সম্মান যদি আজ দেশবাসী দিতে চায়, তাতে আপত্তি করবার কোন অধিকার স্বাহার নেই। দেশের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে সংকর্ষণ শহীদ

হয়েছেন, কিন্তু তিনি স্বাহার পিতা। তাঁর মৃত্যু-বার্ষিকীতে স্বাহার পৌরোহিত্য করা কি ঠিক হবে! তাই সে বললো,

তোমাদের সত্যকার শ্রদ্ধা যদি জেগে থাকে তাঁর কাজে ঠাকুরপো, তাহলে তোমরা তা করতে পার—কিন্তু আমার পৌরোহিত্ব করা ঠিক হবে না··· আমি উপস্থিত থাকবো, এইমাত্র!

—বেশ বৌদি,—পুরোহিত আমি ঠিক করে নিচ্ছি। ওঁর ফটো আছে?

—না—জবা ফুলের রস পায়ে মাখিয়ে পদচিহ্ন তুলে নিয়েছিলাম!

—বাঃ, সে তো আরো ভালো, সেটা কৈ বৌদি?

স্বাহা দেখালো—সযত্নে তোলা মাল্যভূষিত পদচিহ্ন।

—আজ থাক বৌদি—আমি ১৪ই ওটি নিয়ে যাব। তোকেও যেতে হবে রে সেঁজুতি! বলে সুবোধ বেরিয়ে গেল। সেঁজুতি বললো—ওর কথাটা বিশ্বাস করলে বৌদি?

—হয় তো কন্যার দুর্ব্বলতা, কিন্তু সেঁজুতি, তাঁর সম্মান আজ কেউ যদি করে তো সেটা দেশের সকলের কাছেই মিথ্যে হবে না—তার সত্যতা অনস্বীকার্য্য!

ঊষাকালেই গাত্রোত্থান করলেন সন্ন্যাসী—ইন্দ্রজিত এবং অজয়কেও উঠতে হোল। প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ হওয়ার পর ইন্দ্রজিত ওঁকে প্রশ্ন করলো, তার এখন কর্ত্তব্য কি? অবশ্য ইন্দ্রজিতের উপর তার সঙ্ঘগুরুর আদেশ রয়েছে, তবু ইন্দ্রজিতের মনে হোল, এই জ্ঞানবিজ্ঞ তপস্বী শুধু অধ্যাত্মবিজ্ঞানেরই অনুশীলন করেন না, পার্থিব রাজনীতি এবং সমাজনীতিও এঁর কাছে শেখা যেতে পারে। বিশেষ, যে কাজের জন্য ইন্দ্রজিত এ দেশে এসেছে,—সেই বিষয়ে অনেক সন্ধানই উনি দিতে পারবেন। সন্ন্যাসী ধীরে বললেন,

—ভারতকে অখণ্ড রাখা সম্ভব হোল না বৃটিশের কূটনীতির জন্যই; আর দেশীয় রাজ্যের বর্ত্তমান জটীল সমস্যাগুলোও তাদেরই সৃষ্টি; বড়লাটের নতুন সর্ত্তানুযায়ী এবং কেউ কেউ হয়তো আরও কিছু অধিক সুবিধা আদায় করে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে পারেন, কিন্তু বৃটিশের কূটকৌশল তাতে ব্যর্থ করা যাবে না... সে ভারতকে এখনো বহুদিন করায়ত্ত রাখতে চায়।

—তা হলে দেশীয় রাজ্যের সম্বন্ধে আমাকে আপনি নিরাশ করছেন?—

—না—রাজ্য অর্থে শাসক নয়, যারা শাসিত তারাও। তারা যা চাইছে, তা তারা আজ না হোক, একদিন পাবেই। ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর বা কোচিন কিম্বা আর যে কেউ হোন—প্রজা নিয়েই জনপদের সৃষ্টি, জনপদ অর্থেই রাজ্য। জনমত যদি প্রবল হয় তো রাজ্যের রাজার শক্তি আর থাকে কেমন করে স্বমত বজায় রাখবার মত: তবে জনমত যতখানা প্রবল হওয়া উচিৎ ততটা সর্ব্বত্র হয়েছে কি না, দেখতে হবে!

কথায় কথায় ইন্দ্রজিত বললো—সেদিন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান বলেছেন "এই পৃথিবীতে শাসিতের অমতেই বহু শাসক শাসনকার্য্য চালাচ্ছে—" এবং আরো অনেক কিছু বলেছেন।

—কথাটার মধ্যে রাজনীতিবোধের সত্যতা যতটা আছে তার থেকে বেশি আছে মনুষ্যত্বের দীনতাবোধ! কিন্তু এই দীনতাবোধটা ঐ পশ্চিমী মনুষ্যত্বের এখনো অবচেতন স্তরে।

—কেন?—ইন্দ্রজিত অবাক হয়ে চাইল সন্ন্যাসীর মুখের পানে! উনি হেসে বললেন,

—যে সূত্রে উনি কথাটা বলেছেন, সেই সূত্রটা বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারবে। বলেছেন মার্শাল প্ল্যান ইউরোপে প্রচলিত করবার জন্য! এখন ভেবে দেখ, মার্শাল প্লানটি কি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলে ভাবা গিয়েছিল যে পৃথিবীতে শান্তি আসবে। এ্যাটোম-বোম্ দিয়ে জাপানকে ধ্বংস করে তারপর আবার চললো জার্ম্মাণ-জাপান যোদ্ধাদের বিচার—পৃথিবীর শান্তি

ভঙ্গের অপরাধে।—ফ্যাসিজ্যম্ ধ্বংস হোল, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের মূল শেকড় গেড়ে বসেছে বিশেষ করে প্রাচ্য ভূখণ্ডের উপনিবেশে। ক্ষমতালোলুপ রাজনীতি আজও তেমনি প্রতাপান্বিত; এখন ঐ ডলার সাহায্যের অন্তরালে একটা অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ রয়েছে কি না—ভেবে দেখতে হবে। ইউরোপ এখন আর্থিক সংকটে রক্তাক্ত। তার আজ প্রয়োজন শুধু ডলার নয়, অন্ন, বস্ত্র, অস্ত্র অর্থাৎ নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। ওদের নিজস্ব উৎপাদন-শক্তি প্রায় বিপর্য্যস্ত হয়ে গেছে—তাই ইউরোপের সমস্যা শুধু অর্থনৈতিক নয়, আরো ব্যাপক। যুদ্ধের ফলে ওদের শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং শ্রমশক্তির বিস্তর অপব্যয় হয়েছে; কারখানা, রেলপথ চুরমার হয়েছে—শ্রমিকরা মরেছে দলে দলে—তাই ওরা অভাবে অনটনে মৃত্যুপথ যাত্রী! কিন্তু এর থেকে পরিত্রাণের উপায় ইউরোপের আর্থিক সাহায্যে নয়, এশিয়ার উৎপাদন বৃদ্ধিতে। এশিয়ার শিল্প এবং খাদ্য আজ ওদের ভীষণ দরকার—এই ডলার-সাহায্য অবাধ বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদকে সক্রিয় ভাবে সাহায্য করছে। কতকগুলো তাঁবেদার সরকার জীইয়ে রাখা হচ্ছে—ভাবী যুদ্ধের ঘাঁটি তৈরী করা হচ্ছে, এবং সাম্রাজ্যবাদকে সুপ্রতিষ্ঠ করতে সাহায্য করা হচ্ছে।

ইন্দ্রজিত চুপকরে শুনে গেল ওঁর কথাগুলো। বড়ো গোলমেলে ব্যাপার এই অর্থনীতি—ওর মাথায় ঠিকমত ঢোকে না। ও সৈনিক—যুদ্ধক্ষেত্রই ওর প্রশস্ত স্থান। কিন্তু সন্ন্যাসী বললেন,

—আজ ভারতকেও এই নব-স্বাধীনতা লাভের শুভক্ষণে বিশ্বরাজনীতি এবং অর্থনীতির বিষয় সম্যক বুঝে চলতে হবে। নইলে ভারত রাজনৈতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হলেও অর্থ-নৈতিক পরাধীনতা বরণ করতে বাধ্য হবে। অবশ্য ভারতের বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে অবহিত আছেন—কিন্তু বর্ত্তমান জগৎ আজ নীতিগত অধঃপতনের যে কদর্য্য পঙ্কিলতায় এসে পড়েছে, তাতে ভারতের আরো সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। হয়তো একদিন সমস্ত জগতের উপর

ভারতই একমুদ্রানীতি চালিয়ে সমগ্র পৃথিবীর ধনসাম্য বিধান করতে পারবে—ভারতের ধনবল, জনবল এবং নৈতিকবল সবই এর অনুকূলে, কিন্তু যে দূরদর্শিতা এবং কঠোরতা এর জন্য প্রয়োজন, তা ভারতকে অবলম্বন করতেই হবে !

—কি করতে হবে !

—সর্ব্বাগ্রে এই হরেক রকম মতবাদের সমন্বয় সাধন ; তার সঙ্গে শিক্ষা, অর্থনৈতিক শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যবৃদ্ধির ব্যবস্থা : যে দেশের লোক বিশ থেকে মাত্র পঁচিশ বছর বাঁচে, সে দেশের আশা কি ? সর্ব্বাগ্রে দরকার মানুষের পরমায়ু বৃদ্ধি করা—খাদ্য-বস্ত্র-বিশ্রাম-ঔষধ-আরোগ্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলে তবে মানুষ বুঝবে, সে স্বাধীন—নইলে স্বাধীন-পরাধীনে তফাৎটা কোথায় ? কয়েক-জন স্বদেশীয়—লোকের হাতে রাষ্ট্রশক্তি বিধৃত থাকলেই তুমি-আমি স্বাধীন হব না !

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ! অজয় উৎফুল্ল হয়ে বললো কথাটা ; কিন্তু ইন্দ্রজিত প্রশ্ন করলো,

—পরমায়ু বৃদ্ধি করার কাজটাও কি রাষ্ট্রের ?

—নিশ্চয়ই ! এই ভারতেই একটি শিশুর অকালমৃত্যুর জন্য মহারাজ রামচন্দ্রকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল। সাম্রাজ্যের সম্পদ তার জনশক্তি এবং জনগণের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাদের পরমায়ু। ইংরাজ আমলের পূর্ব্বেও এ দেশে শতাধিক বছরের বৃদ্ধ বিস্তর ছিলেন। ইংরাজ অশিক্ষায় আর অপশিক্ষায়—অখাদ্যের আর অপখাদ্যের ব্যবসায়ে, উগ্রবীর্য্য আর নিবীর্য্য ঔষধের কারবারে, অভাবসৃষ্টির সঙ্গে অর্থহীনতার কূটনীতিতে এই অকালমৃত্যুকে এদেশে এমন করে স্থায়ী করে দিয়েছে যে মহাত্মা গান্ধী একশ পঁচিশ বছর বাঁচতে চান—শুনে আমরা হাসি ! কিন্তু ঐ সাধকের একশ পঁচিশ বছর বাঁচার ইচ্ছার মধ্যে যে অগ্নি-সাক্ষরিত নির্দ্দেশ রয়েছে—জাতি হয়তো এখনো তা বোঝে নি !

—সত্যিই ! এ কথাটা তো এমন করে তলিয়ে ভাবিনি !—ইন্দ্রজিত বললো।

—ওঁর বহু কথাই ভেবে বুঝতে এ দেশের মানুষদের সময় লাগবে। ঋষি

রবীন্দ্রনাথ মরণকে বাঁশীর সুরে ডেকেছিলেন কিন্তু জীবনকেও তিনি আহ্বান করেছিলেন পরম গৌরবে—

"যে পথে অনন্তলোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে,
সে পথ প্রান্তের—
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগযুগান্তের।

—সেকথা সত্যি। আজ মনে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ আরো বিশ বছর বাঁচলে জাতি এবং ভাষা কতই না সমৃদ্ধ হোত! ভারতের তিনি বাণীমূর্ত্তি; অখণ্ড ভারতের পরিকল্পনা তাঁরই—ইন্দ্রজিতের কণ্ঠস্বর বেদনার্ত্ত—তিনি আধুনিক ভারত-স্বত্বার পূর্ণরূপ। আজ আমরা যে আধ্যাত্মিক ভারতে বাস করছি, সেটা মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি।

—হাঁ—সন্ন্যাসী বললেন—প্রাচীন ধারাকে অনুসরণ করে ভারতের স্বতোবিরোধী, পরস্পর বিচ্ছিন্ন প্রদেশগুলি অন্তর্গূঢ় ঐক্যতানে আবদ্ধ হোক, এই ছিল তাঁর সাধনা। এও এক রকম রাজনীতি। কিন্তু এ রাজনীতি দম্ভে কলঙ্কিত পরদেশ-বিদ্বেষী কূট নীতি নয়—এ রাজনীতি মহত্তর মানবনীতি—রাজনীতির উর্দ্ধের দেবনীতি।

ইন্দ্রজিত কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করে একটু ভেবে বললো,

—রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'এই কথা আজ বলে যাব, প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা, মদমত্ততা, আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয়, তারি প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে –

অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

—খুবই সত্যি কথা—কিন্তু ক্ষমতা-মত্ততা পথ ঘুরে আসছে আজ আবার;

কবি পার্থিব দেহে থাকলে কি বলতেন, জানি না···আজকার ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ আক্রমণ, ইন্দোচীনে ফরাসী আক্রমণ, মিসরে ইংরাজের ক্ষমতা-মত্ততা এখনো চলেছে। কিন্তু ঋষির বাণী সত্য হবেই, তবে দেরীতে!

—ইন্দোনেশিয়ার ব্যাপার সম্বন্ধে জহরলালজী বলেছেন—'প্রাচ্যের মৃত্তিকায় পাশ্চাত্যের এই শান্তিভঙ্গের কিছুমাত্র অধিকার নেই!'—ভারতের গৌরব তিনি রক্ষা করেছেন এই কথা বলে।

—শুধু তাই নয় ইন্দ্রজিত—ঐ কথায় তিনি প্রমাণ করেছেন যে ভারত ন্যায় এবং নীতিরই পরিপোষক—অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার শক্তি তার কণ্ঠে অফুরন্ত! জহরলালজীর ঐ কথাটির মধ্যে রয়েছে ভারতের সুপ্রাচীন আত্মার বজ্র-গর্ভ ব্যঞ্জনা।

—পাশ্চমী সভ্যতার পক্ষে প্রাচ্য-জাতিগুলিকে এমন করে নির্বীর্য নিস্তেজ করে রাখবার চেষ্টা আর ফলবতী হবে না—এ সত্য ওরা এখনো বুঝতে পারছে না কেন প্রভু?...অজয় প্রশ্ন করলো।

—ওরা বোঝে; ওরা জেনেছে যে এশিয়ার নবজাগরণ পাশ্চাত্যের প্রাধান্যই শুধু খর্ব্ব করবে না, সমস্ত মানুষের মধ্যে থেকে প্রাধান্যস্পৃহাকে লুপ্ত করবে—সাম্য সংস্থাপন করবে পৃথিবীতে। ভারতই হবে তার অগ্রদূত। এই সত্য ভারত এর মধ্যেই প্রমাণ করতে আরম্ভ করেছে। ভারতের এই মুক্তি সমগ্র প্রাচ্যভূমিকে মুক্তি দেবে, এবং সমস্ত পৃথিবীতে প্রচার করবে মানুষের সমানাধিকার। শুধু সমাজে বা রাষ্ট্রে সমানাধিকার নয়, সমানাধিকার অন্তরের ঐক্যবন্ধনে,—ভ্রাতৃত্বের বোধনে—সমগ্র বিশ্বের সার্ব্বজনীন শান্তি-উৎসবের মহাপূজায়।

—পৃথিবীতে সত্যকার শান্তি কি কোনোদিন আসবে প্রভু? ইন্দ্রজিত অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করলো—মানুষ যেদিন ধনুতে জ্যা রোপণ করতে শিখেছে, যুদ্ধ সেই দিন থেকেই চলছে।

—চলছে! কিন্তু ভারত তার সেই যুদ্ধবিদ্যাকেও মহতোমহীয়ান করেছিল, সেই মৃত্যু-উৎসবকেও নৈতিক-শক্তিতে সুদৃঢ় করেছিল, তার ইতিহাস শোন,—সন্ন্যাসী বলে যেতে লাগলেন—পৃথিবীর অন্যান্য অংশের যুদ্ধে আর ভারতের ধর্মযুদ্ধে মূলগত পার্থক্য এত বেশি যে শুনলে বিস্মিত হতে হয়। যুদ্ধ যদি করতেই হয়—তো তার আদর্শ ভারতীয় আদর্শই হবে আগামী পৃথিবীতে। কয়েক শত বৎসর বিশ্বগ্রাসী শ্বেতপ্রাধান্যের অত্যাচার, অন্যায়, শোষণ আর উৎপীড়নের মানবত্ববিরোধী নীতিতে কলঙ্কিত ছিল পৃথিবী। মানব-মৈত্রী, জাতি-প্রেম ইত্যাদি মুখরোচক কথার আড়ালে চলছিল অশ্বেত জাতিগুলির উপর জলৌকার মত রক্তশোষণ—কিন্তু সে মুখোস আজ তাদের খুলে গেছে। এখন রুদ্র-দেবতার ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটিরূপ গণদেবতার জাগরণের অগ্নিতে চিতাশয্যা রচনা তাদের। মানুষের জয়যাত্রা আবার সুরু হোল ন্যায়ের পথে—নীতির রাজস্যন্দনে।

—পশ্চিমী সভ্যতা পৃথিবীর শান্তি স্থাপনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হচ্ছে—ওদের পররাজ্যলোলুপতা, সাম্রাজ্যবাদনীতি, লুণ্ঠন, শোষণ আর পীড়নের জন্য দুর্ব্বল প্রাচ্যজাতির উপর অছিগিরি আর ভগবদ্দত্ত দায়িত্ব ইত্যাদি হীন স্বার্থপূর্ণ স্বাজাত্যবোধক বাক্য পৃথিবীর শান্তি এবং নিরাপত্তার ধ্বংস করছিল এতদিন,—এবার ভারত পরিপূর্ণ গৌরবে এগিয়ে আসতে পারবে, তার আধ্যাত্মিক অবদান, তার অমোঘ ন্যায় আর নীতির বজ্র হাতে—ঈশ্বর আজ ভারতকে সেই সুযোগ দিলেন!

—ভারতের যুদ্ধনীতি কি ছিল প্রভু? ভারত কি সব যুদ্ধেই ধর্মনীতি অনুসরণ করতো?

—হ্যাঁ—প্রাচীন ভারতেও জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে এবং ভূগর্ভে যুদ্ধ হোত; সে যুদ্ধের মহত্ত্ব কোনোদিন অকারণ বীভৎসতায় কলুষিত করেনি তারা। কৌশল, কূটনীতি এবং চাতুর্য্য অবলম্বন করা যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য এবং অপরিহার্য্য অঙ্গ কিন্তু সেই নিষ্ঠুর লোকধ্বংসকারী সংগ্রামকেও ভারতীয়রা বৃহত্তর মানব-

কল্যাণের জন্যই নিয়োগ করতেন : স্বস্বার্থ সাধনোদ্দেশে যুদ্ধ করা ঘৃণ্য বলেই গণ্য হোত! তাছাড়া, যুদ্ধের ধ্বংস-মূলক কাজকেও নীতি এবং ন্যায় দ্বারা যতদূর সম্ভব লঘু করা হোত। নির্দ্দোষ, নিরস্ত্র, নারী, শিশু, বৃদ্ধকে কোনো সময়েই হত্যা করা হোত না। সমানে সমানে যুদ্ধ হোত এবং তার মধ্যেও বৃহত্তর মানবকল্যাণ-নীতি জাগ্রত থাকতো! সে যুদ্ধ-নীতি উন্নততর নৈতিক পবিত্রতা এবং শুদ্ধাচারের উচ্চ:বেদীতে অধিষ্ঠিত ছিল।

—আজকালকার যুদ্ধে তো কমাণ্ডারই ঈশ্বর, ধর্ম্ম, ন্যায়, নীতি, সবই—ইন্দ্রজিত বললো!

—হ্যাঁ—ঐখানেই তফাৎটা বড় বেশি! গোপন অস্ত্র, বিষাক্ত বাষ্প, বীজাণু-ছড়ানো, আনবিক শক্তি প্রয়োগ, কিছুই বাদ যায় না—তাছাড়া, একালের যুদ্ধের বৃহত্তম লক্ষ্য হচ্ছে, জনাকীর্ণ নগরী, শিল্পকেন্দ্র, শস্যক্ষেত্র অর্থাৎ ব্যাপকভাবে প্রতিপক্ষের ধ্বংস সাধন ব্যবস্থা—এর মূলে রয়েছে ঘৃণা, জিঘাংসাবৃত্তি, আর পরদেশলুব্ধতা। কিন্তু প্রাচীন ভারতের যুদ্ধ ছিল ধর্ম্মানুমোদিত নীতিতে গরীয়ান—জনপদ বা লোকাশিল্প প্রতিষ্ঠান বা শস্যক্ষেত্র ধ্বংসকরা ছিল নীতিবিগর্হিত! শত্রুপক্ষীয় আহত, ভূপতীত বা মৃত সৈনিকের সেবার ব্যবস্থা করা ছিল ধর্ম্ম—সবথেকে বেশী ছিল, যুদ্ধে নিঃস্বার্থ বুদ্ধি বজায় রাখা এবং হিংসার ভাব পরিত্যাগ করা; তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে দৈহিক বল অপেক্ষা, সত্য, দয়া, ধর্ম্ম, অধিক বলশালী, এবং জয়লক্ষ্মী ধর্ম্ম-পক্ষই অবলম্বন করবেন। প্রাচীন ভারতের প্রত্যেটি যুদ্ধের ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেয়।

ইন্দ্রজিত বললো—কথায় কথায় অনেক বেলা হয়ে গেল প্রভু! আমাদের এবার যেতে হবে। আপাততঃ বাংলাতেই ফিরে যাব।

—তাই যাও—বর্ত্তমানে সারা ভারতের মধ্যে বাংলা আর পাঞ্জাব অধিকতর বিপদগ্রস্থ!—দ্বিধা বিভক্ত হোল ঐ দুটি প্রদেশ—ওদের কৃষ্টিগত ঐক্য ধ্বংস

হতে বসেছে,—খাদ্যভাবে বাংলায় অশেষ দুর্গতি চলেছে, তাছাড়া বন্যা আর মহামারীতে মানুষের দুর্গতির সীমা নাই—বাংলাতেই ফিরে যাও : ভারতের দুঃখদুর্দ্দশার দিন শেষ হয়ে এল—তবে, যে কাজ আজও বাকি আছে তা করতে হবে।

—কি কাজ প্রভু ?—ইন্দ্রজিত সবিনয়ে শুধুলো।

—ভারতকে আবার এক এবং অখণ্ড করবার সাধনা করতে হবে তোমাদের। ভারতের ভৌগোলিক ঐক্য, ঐতিহাসিক ঐক্য, সাংস্কৃতিক ঐক্য শুধু রাজনৈতিক কলহে যদি বিভক্ত হয়ে যায়, তবে তার থেকে দুঃখের আর কিছু নেই! তারপর করতে হবে ভারতের সম্পদ বৃদ্ধি! তার অরণ্য-সম্পদ, খনিজ-সম্পদ, কৃষি-সম্পদ এবং শিল্প-সম্পদ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হতে পারে এবং হবে, শুধু প্রযোজন নিষ্ঠার।

—ভারত কি আবার অখণ্ডরূপ লাভ করবে প্রভু? —ইন্দ্রজিতের হাসিটা বেদনাময় অবিশ্বাসের হাসি,

—নিশ্চয়! এই বিভাগ বিদেশীর সৃষ্টি এবং একান্তই কৃত্রিম। পৃথক নির্ব্বাচন, সাম্প্রদায়িক বাটোয়ার ভেতর আজকার এই ভারত বিভাগের মধ্যে ইংরাজেরই কূটনীতি পরিস্ফুট। এক পক্ষের সুবিধা আর অন্য পক্ষের অসুবিধা নানা ক্ষেত্রে ঘটিয়ে—ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে ভাগ করে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ করে তোলা হোল; তার ফলে এক অংশ হোল বৃটিশের মুখাপেক্ষী। অবশ্য মুখে বৃটিশ বলতেন, অনুন্নতদের উন্নত করাই তাঁদের লক্ষ্য! কিন্তু লর্ড মর্লি তাঁর স্মৃতিকথায় স্পষ্টই বলে গেছেন এই বিভেদ সৃষ্টির মূল কারণটা কোথায়।

—আপনার অভিমত কি এই যে এই বিভক্ত ভারত আবার মিলিত হবে?

—হবেই! এই আশায় ভারত সন্তান বেঁচে থাকবে যে, আবার সিন্ধু থেকে ব্রহ্মপুত্র, হিমালয় থেকে কুমারিকা এক হয়ে, একাকার হয়ে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে পৃথিবীর আগামী সভ্যতার বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করবে।

কথাগুলি যেন ঐ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদ। ইন্দ্রজিত এবং অজয় তাঁকে প্রণাম করে উঠলো, যাবার জন্য। সন্ন্যাসী আবার আশীর্ব্বাণী দান করলেন—ভারতমাতার যোগ্য সন্তান হও।

ওরা বেরিয়ে পড়লো বাংলার পথে—১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বেই বংলায় এসে পৌছাতে হবে ইন্দ্রজিতকে—তাদের সঙ্ঘগুরুর আদেশ। তাছাড়া বিভক্ত বাংলার বেদনার্ত্ত অন্তরের সান্নিধ্যে এসে ওরা স্বাধীনতার উৎসব দেখতে চায; দেখতে চায়—স্বাধীনতা-যজ্ঞের সর্ব্বপ্রথম সমিধ বাঙালী, শহীদ বাঙালী, সর্ব্বত্যাগী বাঙালী আজো মরণোত্তর ভারতের শ্মশানশয্যায় জীবনায়নের অঙ্কুরকে অপরাহত রাখছে কি ভাবে। ইন্দ্রজিতের কণ্ঠে গান বেজে উঠল অকস্মাৎ :—

প্যারা ভারত দেশ হামারা,
ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা—
বিশ্ববিজয় করকে দিখলাবে,
তব্ হোবে প্রণ পূর্ণ হামারা
ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা।

অতিসুন্দর খামখানা হাতে নিয়ে কাবেরী শিরোনামাটা দেখছিল! চমৎকার খাম, এ বাজারে এত ভাল খাম পাওয়া সৌভাগ্যের কথা—কিন্তু একান্ত অপরিচিত হস্তাক্ষর! খুলে ফেললো চিঠি! স্বাক্ষরটাই প্রথম দেখলো—"বিনয়াবনতঃ সুবোধ"—কে এই সুবোধ? কাবেরী অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে চিঠিখানা পড়লো,—সুবোধ নিমন্ত্রণ করেছে তাকে 'সংকর্ষণ স্মৃতি-দিবসের' উৎসবে যোগ দিতে। স্বাহার কাছ থেকেই ঠিকানা জেনে নিয়েছে তার! অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গেই লিখেছে যে, একরাত্রে ঐ মহানেতার চিতাশয্যায় কাবেরী দেবী উপস্থিত ছিলেন, তাঁর এই মৃত্যুবার্ষিকীতেও যদি তিনি আসেন তো উদ্যোগীগণ

অত্যন্ত আনন্দিত হবেন।...যাক, কাবেরী যাবে কি না কিছুই ভাবছে না, হঠাৎ কোণের দিকে পুনশ্চ দিয়ে একটুখানি লেখা ওর নজরে পড়লো—"লকু আহত হয়ে কলকাতার হাঁসপাতালে রয়েছে।"

হাঁসপাতালে? কাবেরী যেন আত্মবিস্মৃতা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না— যেতে হবে লকুকে দেখতে! যাবে কেমন করে! বাবা-মা কিছুতেই এই হাঙ্গামার বাজারে তাকে ছেড়ে দেবে না! মুস্কিল!

কিন্তু মানুষের ঐকান্তিকতায় ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ থাকে। দোতালার বারান্দা থেকেই কাবেরী দেখতে পেল,—মলয়ের গাড়ী এসে দাঁড়ালো ফটকে। চমৎকার সুযোগ! ঐ লোকটাকে সারথী করে কাবেরী পৃথিবী ভ্রমণে বেরুলেও বাবা আপত্তি করবেন না; মা আপত্তি করলেও মা'কে বোঝানো যেতে পারবে। কাবেরী ত্বরিতে নেমে এল মলয়ের সঙ্গে কথা বলবার জন্য। মলয় ততক্ষণে বসবার ঘরে এসে বসেছে। কাবেরী আবির্ভূতা হয়েই বললো, —মানুষ যা চায়, যদি সব সময় এমনি করেই পেতো!......

—কেন? কী আপনি চাইছিলেন? বিস্মিত এবং মহা-আনন্দিত মলয় প্রশ্ন করলো।

—চাইছিলাম আপনাকেই! আমি একবার হাঁসপাতালে যেতে চাই; নিয়ে যেতে পারবেন?

—সানন্দে! কিন্তু কেন? কার অসুখ?

—সেই সাহিত্যিকের...বলে কাবেরী ফুসেকেও থেমেই মলয়ের মুখখানা দেখে নিয়ে হেসে বললো—ওর অসুখ, না গেলে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়—অন্য আর কোনো কারণ নেই।

আবার হাসলো কাবেরী। মলয় আশ্বস্ত হচ্ছে কি না, দেখছে সে। সোসাইটি-গার্ল কাবেরী ভালই জানে—মলয় নিজে যার চিত্তহরণ করতে চায়, সেই মেয়ে অন্য কোনো যুবককে এত বিপদ-আপদ অগ্রাহ্য করে দেখতে যাবে

হাঁসপাতালে, এটা নিশ্চয়ই মলয়ের প্রীতিকর হবে না! মলয় একটু থেমে থেকে বললো,

—কিন্তু রাস্তায় গোলমাল আছে। আপনাকে নিয়ে যেতে ভরসা পাই কি করে?

—একটু আগেই তো বললেন, সানন্দে নিয়ে যাবেন। এখন আবার ভরসাই হচ্ছে না! এইটুকু সাহস নিয়ে আপনি আমার রথের সারথ্য করতে চান?—

ওর কণ্ঠে বিদ্রূপমেশানো ভৎ´সনা—চোখে অনুরাগের আকুতি! মলয়ের মাথা মুহূর্ত্তে ঘুরে উঠলো। অতি-চতুর মলয় তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করে বললো,
—আমি আমার কথা বলছি না, আপনার বাবা-মার আপত্তি হবে।

—হবে না! আপনি তৈরী থাকুন, আমি কাপড়খানা বদলে আসি।

এ যেন আদেশের বড়—যেন অনিবার্য্য। মলয় মৃদু হেসে ঘাড় নাড়লো। মিনিট কয়েকের মধ্যেই কাবেরী বেরিয়ে এল। শাড়ী সে বদলেছে, কিন্তু শাড়ী খানা পুরোনো আর ছেঁড়া—একেবারে তুষারশুভ্র। মোহিতবাবুর মেয়ের এরকম বেশ আগে দেখেনি মলয়, বললো—এ কি রকম বেড়াবার বেশ হোল?

—খুব ভাল। রাস্তায় যা গুণ্ডার উপদ্রব!

মলয় আর কিছু বললো না; কাবেরীকে পাশে বসিয়ে গাড়ী চালিয়ে দিল। হাঙ্গামা আজ খুবই কম—কলকাতা সহর বহুকাল পরে যেন হাঁফ্ ছাড়ছে। কাবেরী গাড়ীর সীটে বসে দেখছে, লোকজন চলছে, রাস্তায় ট্রাম বাস, মানুষ—আর ফুটপাতে হরেকরকম পসরাও! পসরার মধ্যে পতাকাই বেশি, নানারকমের জাতীয় পতাকা—কিন্তু পতাকার এতো রকমারী কেন? অবাক হয়ে ভাবছে কাবেরী! জাতীয় মহাসভা তো নিশ্চিত নির্দ্দেশ দিয়েছেন, পতাকা কি-রকম হতে হবে! তা ছাড়া, জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ জাতীয় পতাকা ফুটপাতে এমন করে বিক্রিইবা কেন হয়? জাতীয় সরকার কি এর জন্য কোনো ব্যবস্থা করেন নি? পবিত্র খদ্দরের উপর

যথা-নির্দ্দিষ্টভাবে যা মুদ্রিত হবার কথা,—তাই তৈরী হয়েছে প্যারাসুট্-ছেঁড়া সিল্কের টুকরোতে! চমৎকার! এই জাতি—এই জাতীয়তা! কিন্তু কাবেরী তার ব্যবসায়ী বাপের বুদ্ধি কিছুটা পেয়েছে। তাই বুঝতে পারলো—পতাকা আর ব্যাজ বিক্রী করে বেশ দু-চার লাখ কামিয়ে নিচ্ছেন কয়েকজন ধনী। মানুষের ভাবপ্রবণতাকে ভাঙিয়ে খাবার বড় সুন্দর ব্যবস্থা এ!

কাবেরীর ইচ্ছা ছিল, একখানা পতাকা কিনে লকুকে উপহার দেবে গিয়ে, কিন্তু প্যারাসুটের পতাকা দিয়ে সে লকুর অপমান তো করবেই না, পতাকারও অসম্মান করবে না! কাবেরী দাঁতে ঠোঁট কামড়ে মালয়কে বললো—জোরে চালান! একটা মোড়ের কাছে গাড়ীর গতি কিছু মন্দীভূত হোয়ে, পুলিশের হাত উঠানোতে থেমে গেল! ফুটপাত থেকে একজন এসে গাড়ীর মাথায় একটি পতাকা বসিয়ে দিয়ে সেলাম করলো কাবেরীকে! কাবেরী মুখ ফেরাচ্ছে, কিন্তু মলয় ঝাঁ করে বুক পকেট থেকে মণি ব্যাগ বের করে পাঁচটাকার একখানা নোট ফেলে দিল লোকটার হাতে!

—হাঁসপাতালের ফাণ্ডে দিলে কাজে লাগতো—কাবেরীর কণ্ঠে তীক্ষ্ণতা।

—হ্যাঁ, কিন্তু গাড়ীখানা নতুন কিনলাম, দেশী গাড়ী। একটা পতাকাও তো লাগাতে হবে!

—দেশী গাড়ী! ফুল্! ওসব বাবার কাছে শুনেছি আমি—এর ভেতরের অস্থি-মজ্জা-রস-রক্ত সব বিদেশী—উপরে শুধু দেশী খদ্দরের ধুতিপাঞ্জাবী চড়ানো হয়েছে, আর ঐ যে দেশী কোম্পানী মার্কা লেবেলটা, ওটা গান্ধীটুপী!

প্রতিবাদ করবার উপায় নেই, কারণ মলয়ও জানে ব্যাপারটা! বিদেশীকে দেশী সাজিয়ে একদল ধনিক সাধারণের দেশপ্রীতি আর ভাবপ্রবণতার সুযোগ গ্রহণ করছে! ওরা শুধু এই দেশেরই শত্রু নয়, ওরা মানুষের শত্রু! কিন্তু মলয় বললো—একদিনেই কি সব দেশী হবে? হবে ধীরে ধীরে—

—হবে না। যে দেশের শিকারী-মানুষ মানুষের ভাবের মহিমায় মুনাফা

শিকার করে—উপাসনার বেদীতে করে বিত্ত সঞ্চয়, তাদের ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত কোনো আশা নেই !

—মোহিত চাটুজ্যের মেয়ের মুখে একথা মানায় না—পুরোনো এবং ছেঁড়া শাড়ী পরলেও না !—মলয় বলতে বলতে হাসলো—যেন নিতান্তই রসিকতা করছে।

ওর পুরোনো এবং ছেড়া শাড়ীর জন্য মালয়ের অন্তর নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ ছিল, তাই আকস্মিক্ ভাবে কথাটা প্রকাশ হয়ে গেল। ওর নিশ্চয় আশা ছিল, কাবেরী অপরূপ বেশে সেজে তার সঙ্গে বেড়াতে বেরুবে। এই ক্ষোভটা প্রকাশ পেল উগ্র ভাষায়, যদিও এই উগ্রতার অনেকটাই সে জুড়িয়ে দিয়েছিল হাসি দিয়ে। কাবেরী দৃঢ় কণ্ঠে বললো,

—হয়তো মানায় না ! কিন্তু কারো মেয়ে হয়ে জন্মানোর জন্যই জাতকের স্বাধীন মত্ অগ্রাহ্য করা যায় না। কৃপণ বাপের খরচে ছেলেও হতে পারে।

হয়তো কথাটা বলে খুবই অন্যায় করে ফেলেছে মলয়—কাবেরী রাগ করলো নাকি ! সামলাবার জন্য বললো—লক্ষীটি, রাগ করবেন না, আমি রসিকতা করছিলাম...

—তা জানি,—কাবেরী আস্তে বললে—যদি সত্যিই আমাকে ওকথা বলবার সাহস থাকতো আপনার, তা হলে আমার সব সঙ্কোচ ঘুচিয়ে আজ এইখানেই আপনার গলায় মালা দিয়ে ধন্য হয়ে যেতাম...কাবেরীর কণ্ঠে বিষাদ-রাগিণী বাজলো।

গাড়ী হাসপাতালের দরজায় পৌঁছে গেছে। কাবেরীর কথার নিগূঢ় অর্থ বুঝবার আগেই কাবেরী নিজের হাতে দরজা খুলে নেমে পড়লো—ফিরে বললো :

—যদি আসতে চান তো আসুন ; বেড্ নম্বর এইট্টী ফোর—ও এগিয়ে চলে গেল ভেতরে। মলয় হাঁ করে চেয়ে রইল এই রহস্যময়ীর গমনপথ-পানে ! তারপর গাড়ীখানা নির্দ্দিষ্ট যায়গায় রেখে ভাবতে লাগলো—মোহিতবাবুকে

আক্রমণ করে বলা কথাটা সত্যি হলেই কাবেরী তার গলায় মালা দিত—এ কী রকম কথা? এ কোন্ রহস্য? কিন্তু নারীকে বুঝবার মত বুদ্ধি মলয়ের নিতান্তই কম! একটা সিগারেট ধরিয়ে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টানতে লাগলো। ভেতরে যাবে, একটু পরেই যাবে।

—গণতন্ত্রের কেন্দ্রগত বাণী হচ্ছে গুণতান্ত্রিকতা—যাতে জন্মগত বা বিশেষ শ্রেণীগত কোনো দোষ বা গুণ স্পর্শ করবে না কখনো—লোকাধীশ আস্তে বলছে কৃষ্ণাকে। শুভ্রাও রয়েছে। তাহলে ভাল আছে লোকাধীশ! কাবেরী হাসিমুখে হাত তুলে অভিবাদন জানালো।

—আসুন—আপনি কেমন করে খবর পেলেন?—লোকাধীশ প্রশ্ন করলো হেসে। কাবেরী বলল,

—সে হবে এখন—আপনি কি বলছিলেন, যদি কষ্ট না হয় তো বলুন।

—না—ভাল হয়েই উঠলাম। যে গুরুদায়িত্ব আমার মাথায় চাপিয়ে গেছেন নেতা সংকর্ষণ—ঈশ্বরের ইচ্ছা, সেই দায়িত্ব আমিই পালন করি—তাই বেঁচে গেলাম।

—কি করে এমন হোল?

—সে অনেক কথা, পরে শুনবেন—বলে লোকাধীশ প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে আগের কথাটাই বলতে লাগলো—গুণতান্ত্রিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র এই ভারতে একদিন পরীক্ষিত হয়েছিল—প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্বয়ং বুদ্ধদেব জন্মেছিলেন গণতান্ত্রিক রাজ্যে।

—তুমি আর একটু আস্তে কথা বলো।—কৃষ্ণা আবেদন করলো!

—ওঃ আচ্ছা। কিন্তু কথা বলে খুব আনন্দ পাচ্ছি আজ কৃষ্ণা। ভেবেছিলাম, এ জীবনের মত কথা বলা বুঝি শেষ হয়ে যাবে! আনন্দই হচ্ছে অমৃত লোকের অবদান! মানুষ যদি আনন্দের মধ্যে মরতে পারে, তাহলে জীবন

তার হয় স্বার্থক। মৃত্যুর সেই ক্ষুদ্র ক্ষণটিকেই আনন্দময় করবার সাধনা করে মানুষ জীবনভোর—কবি বলেছেন :—

জীবনের দিক্‌চক্রসীমা, লভিয়াছে অপূর্ব মহিমা
অশ্রুধৌত হৃদয় আকাশে, দেখা যায় দূর স্বর্গপুরী ;
তুমি মোর জীবনের মাঝে মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।

এই আনন্দ যেখানে লোকোত্তর—মৃত্যু সেখানে শুধু মধুর নয়, মৃত্যু সেখানে মৃত্যুহীন ;—

আমি যাবো—যেথা তব তরী বয়, ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়, আমি করিব নীরবে তরণ
সেই মহা বরষার রাঙা জল,—ওগো মরণ, হে মোর মরণ......

—কিন্তু আপনার কাছে আমরা আজ জীবনের গানই শুনতে এসেছি। মৃত্যুকে মহান করবার জন্য আরো অনেকদিন আপনার বাঁচা দরকার।

কাবেরী বললো হাসিমুখে। লকুও হেসেই জবাব দিল তার কথার,

—বাঁচবো! মৃত্যুকে পরাহত করে জীবনের অভিযানে জয় লাভ করেছে আজ বীর ভারত—আজ মরণের কথা মনে করতে নেই—আজ বলুন—

—এলো মহা জন্মের লগ্ন,—
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন—

মলয় এসে হাত তুলে নমস্কার করলো ওদের সকলকে!

লকু সানন্দে প্রতি নমস্কার করে বললো—আসুন! বেঁচে থাকলেই আবার দেখা হয়! তাই মনে হচ্ছে—মানুষের বা জাতির বেঁচে থাকাটাই দরকার। ভারতীয় হয়ে বেঁচে থাকতে পেরেছি বলেই আজ আমরা স্বাধীনতার দুর্গতোরণ-দ্বারে পৌছালাম।—লকু হাসলো।

—এতক্ষণ মৃত্যুর প্রশস্তি গেয়ে এবার বুঝি জীবনের প্রশস্তি আরম্ভ করলেন? কাবেরী বলল।

—প্রশস্তিটা জীবনের জন্যই প্রয়োজন—মৃত্যু কোনো প্রশস্তির অপেক্ষা রাখে না। এই পৃথিবীতে বহু জীব, বহু জাতি, বহু ধর্ম্ম, বহু সভ্যতা মৃত্যু বরণ করেছে তাদের কোনো দাবীদাওয়া না রেখেই! বেঁচে যারা আছে, তাদেরই দাবীতে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস প্রশস্তিমাখা। মৃত্যু কঠোর এবং নিষ্ঠুর সত্য কিন্তু জীবনের সত্যতা মহান, আরো সঙ্গীতময়, আরো সুন্দর!

কয়েকদিন বিছানায় পড়ে থাকবার জন্য ওর কথা বলার স্পৃহা নিশ্চয়ই খুব বেড়ে গেছে—সবাই বুঝতে পারছে। মৃত্যুর মুখোমুখী গিয়ে ফিরে-আসা জীবনের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক শক্তি থাকে কিছুদিন পর্য্যন্ত—যে শক্তি তাকে সবল, সুস্থ, সাধারণ হয়ে বেঁচে উঠবার শক্তি যোগায়। কিন্তু ওকে বেশি কথা বলতে মানা করেছেন ডাক্তার। তাই কাবেরী একেবারে কাজের কথা পাড়লো—নিমন্ত্রণ পত্র পেলাম একখানা আজ ডাকে। চোদ্দই তারিখে নেতা সংকর্ষণের স্মৃতি দিবস উদযাপন হবে··· আপনি নিশ্চয় ভাল হয়ে উঠবেন তার আগে···আমার যাবার খুব ইচ্ছে, কিন্তু যাই কার সঙ্গে! আপনি ভাল হয়ে উঠলে ··

—উঠবো! আমি যাব, কৃষ্ণা যাবে, আর সনৎ, শুভ্রা আমাকে রাখতে যাবে। আপনি অনুগ্রহ করে যদি যান আমাদের সঙ্গে তো পরম আনন্দিত হই!—লকু বললো!

—কোথায়? কলকাতায়?—মলয় প্রশ্ন করলো!

—না—আমাদের দেশে। লকু বললো—বিপ্লবযুগের আদিম দিনের নেতা সংকর্ষণের নাম শুনেছেন বোধ হয়? এই কাজের যে উদ্যোগী, সেই সুবোধকে আমি কোনো দিন ভাল চোখে দেখিনি—কিন্তু আজ বোধ হয় সে সত্যি একটা ভালকাজ করতে যাচ্ছে!

—মোটর যাবার রাস্তা থাকলে আমারও যাবার ইচ্ছা আছে—মলয় সহাস্যে জানালো!

—রাস্তা আছে—কাবেরী বললো—বাবার সঙ্গে আমি মোটরেই গিয়েছিলাম ওখানে!

—আপনি গেলে আমরা বিশেষ রকম আনন্দিত হব—লকু বললো,—সুবোধ আমার কাছে অনেকগুলো নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছে এখানকার বন্ধুদের দেবার জন্ত—দে তো ভাই কৃষ্ণা ওঁকে একখানা পত্র!—কৃষ্ণাকে আদেশ করলো লকু!

বালিশের নীচে রাখা পত্রের গোছাটা বের করে কৃষ্ণা মলয়ের নাম লিখে তার হাতে দিল একখানা! মলয় খুশী হয়ে শুধুলো—তাহলে যাবার ব্যবস্থাটা সকলেই মোটরে করলে হয় না? ছয় জন লোক নিশ্চয় গাড়ীতে কুলিয়ে যাবে; তা ছাড়া আপনার অসুখ শরীর—ট্রেণে যেতে অসুবিধাও হতে পারে!

—গাড়ী দুখানাই হবে! উৎপলাও যাবে, বলেছে! তারই গাড়ীতে আমি যাব!

অতঃপর যাবার ব্যবস্থা সব ঠিক হয়ে গেল। উৎপলার গাড়ীতে যাবে, লকু, কৃষ্ণা আর উৎপলা। মলয়ের গাড়ীতে যাবে সনৎ, শুভ্রা, কাবেরী আর মলয়। দুই গাড়ীই এক সঙ্গে আগে পিছে চলবে।

সব ঠিক হয়ে যাবার পর কাবেরী আস্তে বললো—সেই শ্মশানের দৃশ্যটা মনে পড়ছে। যেন সেদিনের কথা! আর একজন ছিল সেখানে, যে আজ আমাদের দলে নেই!

—ইন্দ্রজিতের কথা বলছেন?—লকু হেসে বললো—সে তো সন্ন্যাস নিয়েছে!

—জানি—কাবেরীর ঠোঁটে হাসি কিন্তু অন্তরে কিসের যেন আবর্ত্ত ফেনিয়ে উঠছে। বললো,—সন্ন্যাস ওকে নিতে হয়নি, ও জন্মসন্ন্যাসী—কে জানে কোথায় আছে!

ওর কণ্ঠের নৈরাশ্য যেন বাতাসকেও বেদনাতুর করে তুলেছে। মলয়ের মুখখানা মলিন হয়ে উঠলো। কে ইন্দ্রজিত? ও চেনে না তাকে, কিন্তু কাবেরীর

মুখের পানে চেয়ে দেখলো, সে মুখে কোন্ দূরশ্রুত দিনের একটা রাগিণীর ঝঙ্কার যেন স্বপ্নময় আবেশ এনেছে। কে এই ইন্দ্রজিত?—মলয় ইচ্ছা সত্বেও শুধুতে পারলো না।

রাণী বড়ই বিপন্ন হয়ে পড়েছে কদিন থেকে। চাল-ডাল ফুরিয়ে গেছে—বনের ফল বিশষ কিছু আজকাল পাওয়া যায় না। শালগাছের তলায় গজানো ব্যাঙের ছাতার ঝোল খেয়ে আছে দুদিন—কিন্তু আজ বড় গা-বমি-বমি করছে সকাল থেকে। আজ একমুঠো ভাত তার একান্তই দরকার।

ভিক্ষা ছাড়া উপায় নাই! গুরুদেব সেই যে গিয়েছেন, আজও ফিরলেন না—তাঁর শিষ্যদেরও কেউ এর মধ্যে আসে নি এখানে।—রাণী পাহাড়ের একটা উঁচু যায়গায় ক্লান্তভাবে বসে ভাবছিল। কিন্তু ভাবলেই এই জঙ্গলে কেউ তাকে খাবার দিতে আসবে না। ভিক্ষা করতেই যেতে হবে। রাণী আর দেরী করলো না—ঝোলাটা নিয়ে উঠে পড়লো। যে গাঁয়ের কেউ ওকে চেনে না, সেই গাঁয়েই ভিক্ষা করতে যাওয়া সুবিধা। কিন্তু নদীর ওপারে গিযে খানিকটা হাঁটলে নকুদের গ্রাম পাওরা যায়। বেশিদূর হাঁটতেও পারবে না রাণী! স্বাহার কাছে গিয়েই এবেলা দুটি ভাত খেয়ে আসবে।

অতি কষ্টে বেলা বারটা নাগাদ রাণী এসে পৌছালো স্বাহার বাড়ীতে, কিন্তু কেউ নাই—অথচ দরজা খোলা! চোর ডাকাত ঢুকেছে নাকি! রাণী তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে ডাকদিল—মা—মা আছো?—

—কে? রাণী! আয়!—সাড়া দিলেন নকুর বৃদ্ধা মা। তিনিই একমাত্র আছেন বাড়ী আগলে।

ক্লান্ত রাণী বারান্দার কোণায় বসে পড়লো। মা বললেন,—ওরা সব গেছে ও গাঁয়ে! আজ যে তোর বাবার মৃত্যুতিথি! ওখানে খুব উৎসব হচ্ছে, তুই খবর পেয়েছিস তো?

—না—রাণী চমকে উঠলো!—কোথায় উৎসব, কে উৎসব করছে? ব্যগ্রভাবে শুধুলো রাণী।

মা ওকে সব কথা বললেন এবং বললেন যে তুই কোথায় থাকিস, কেউ জানে না, বলে তোকে খবর দেওয়া হয় নি! ওঁর মরণকালে তুই মেয়ের কাজ করেছিস—যা ওখানে।

—যাবো—রাণী উঠে দাঁড়ালো। মা ওকে কিছু খেতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু রাণী বললো,

—উপোস দিয়েই ওখানে যেতে হবে মা, বাবার এইরকমই ইচ্ছে। তাই আমার আজ সকালথেকেই খাওয়া হয় নি—আমি চললাম।—রাণী উঠে বেরিয়ে গেল!

ওর শরীরে যেন সিংহিনীর শক্তি জেগে উঠছে! ওর বাবা নন সংকর্ষণ, কিন্তু বাবার বেশী; ওর পালক, ওর গুরু, ওর ঈশ্বরতুল্য—রাণী অত ভাল ভাল কথা ভাবতে পারে না—কিন্তু তার অশিক্ষিত মনে এক অদ্ভুত প্রেরণার উৎস যেন খুলে গেছে—আজ তার অবহেলিত, অবজ্ঞাত কারাবাসী পালক-পিতার মৃত্যুকে মণিমূল্য দান করা হবে—অমর্ত্ত্য গৌরবে ভূষিত করা হবে—রাণী দেখতে যাচ্ছে! না—তীর্থস্নান করতে যাচ্ছে রাণী—রাণী যাচ্ছে পূজারিণী সেজে!

মানুষের অন্তরানুভূতি শিক্ষা-অশিক্ষার অপেক্ষা রাখে না। উত্তেজনার মুহূর্ত্তে এতখানা রাস্তা এই দুর্ব্বল শরীর নিয়ে চলতে পারবে কি না, চিন্তাও করলো না। ওর মনে হচ্ছে, এখনি পৌছুতে না পারলে ওর যাওয়াই যেন ব্যর্থ হয়ে যাবে—পূর্ণাহুতিটাই দেখা হবে না। রাণী অত্যন্ত দ্রুত চলতে লাগলো। শ্রাবণ মাসের প্রখর রোদ—মেঘের লেশ মাত্র নেই আজ আকাশে, অথচ মেঘ তো থাকবার কথা! রাণীর মনে হতে লাগলেলো—সূর্য্যদেব যেন তাকে অগ্নিশুদ্ধ করে নিয়ে যাবার জন্য এমন আগুন ঢালা কিরণ আজ বর্ষণ করছেন! কিন্তু নদীর ওপাশে ছোট সেই বন পর্য্যন্ত যেতই রাণী অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লো একটা গাছতলায়। গাটা জ্বর জ্বর বোধ হচ্ছে ওর। তবে কি ও

যেতে পারবে না? ওর জীবনের এমন পবিত্র দিনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে! রাণী কেঁদে ফেললো ঝরঝর করে।

বিস্তর আয়োজন করেছে সুবোধ, "সঙ্কর্ষণ-স্মৃতি দিবসের" জন্য। পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ-করে-আসা বিপন্ন দেশবাসীর রক্তশোষণ করে প্রায় লাখ দেড়েক টাকা সে কামিয়ে নিয়েছে তার পতিত জমিতে তাঁদের বাসকরবার ব্যবস্থা করে দিয়ে। সুযোগ-সন্ধানী সুবোধ ঐ টাকার কিঞ্চিৎ অর্থাৎ প্রায় হাজার পাঁচ আজকাল এই স্মৃতিদিবস, তার সঙ্গে স্বাধীনতা উৎসবের জন্য খরচ করছে—নাম যশ এখন কিছু বাড়ানো দরকার তার। কলকাতা থেকে জন কয়েক রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফার আনানো হয়েছে। চতুঃপার্শের বিশ-পঁচিশ খানা গ্রামে ঢোল সহরৎ করে জানানো হয়েছে উৎসবের কথা—সাতটা বড় বড় তোরণ তৈরী করা হয়েছে—পৃথ্বিরাজ তোরণ, শিবাজী তোরণ, সিপাহী-বিদ্রোহ তোরণ, ইত্যাদি ঐতিহাসিক নাম দিয়ে, সব শেষে সংকর্ষণ তোরণ! বুদ্ধি সুবোধের কম নেই—কাজেই ব্যাপারটাও বিরাটত্বে পরিণত হয়েছে! শাঁখ-উলু আলপনা,—কদলী, কলসী, রোচনা—তারসঙ্গে সপ্ত তোরণ, গ্রাম খানা প্রাচীন ভারতের অবন্তী-উজ্জয়িনীর মত করে তুলেছে। বিরাট একটা তলতা বাঁশের আগায় পতাকা তোলা হবে—সেটাও বসানো হয়েছে—শুধু কলকাতা থেকে প্যারাসুট-সিল্কের পতাকা এখনো এসে পৌছায় নি, আর পৌছান নি উৎপলা দেবী, যিনি এই পতাকা উত্তোলন করবেন। উৎপলা দেবীকে কখনো দেখেনি সুবোধ; লকুর চিঠিতে নাম জেনেছে। কোনো সুন্দরী নারীকে নেত্রী করতে পারলে মানুষকে প্রভাবিত করার বিশেষ সুবিধা তো হয়ই—সভায় লোক সমাবেশেরও সুবিধা হয় যথেষ্ট!—সুবোধ এ তথ্য ভালই জানে।

স্বাহা-সেঁজুতি এবং গ্রামের আরো কয়েকটা মেয়েকে সে সকালেই আনিয়েছে এখানে। তারা সব আয়োজন করছে। ওদিকে মোড়লের উপর

ভার পড়েছে খিচুড়ী রান্না করাবার। উপস্থিত সমস্ত লোককে সুবোধ আজ ভোজন করাবে। মোড়ল এসে বলল,

—বারো মণ চাল আর আট মণ ডাল খিচড়ীর জন্যে দিলাম; আর কি দরকার হবে?

—বলতে পারছি না—যেমন যেমন লোক হবে, তেমনি দরকার হবে। এখন আর থাক। দরকার হয় তো আবাব রান্না চড়িয়ে দিও—রসগোল্লাটা পৌঁছে গেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—পাঁপর ভাজাও হচ্ছে—তবে মাছ যোগাড় হোল না।

—না হোক! স্বাধীনতা উৎসবের দিন জীব হত্যা বন্ধ করেছে কংগ্রেস থেকে। মাছও তো জীব!

—আজ্ঞে নিশ্চয়ই!—মোড়ল হেসে বললো—বেগুনে কচুতে একটা তরকারী করেছি।

—বেশ! বহুটাকাই তো রোজগার করা গেছে ওদের ঘাড় ভেঙে,—ভালকরে আজ খাইয়ে দাও মোড়ল—পরকালের জন্য কিছু জমা থাকবে।

—আজ্ঞে, ইহকালেও আগামী নির্ব্বাচনে দাঁড়ানো যেতে পারে। তবে একটা কথা বলছিলাম…।

—কি—বলো!

—ব্যাপারটা একটু খানি 'হরিজনিক' করলে হয় না? অর্থাৎ, আজকার এই পরম শুভ স্বাধীনতার দিনে আমরা সকলেই হরিজন—আপনি, আমি, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, চণ্ডাল…।

—পারবে করতে? খুবই ভাল হয় যদি পার!

—আজ্ঞে খোকাবাবু, পারি না, এমন কাজই নেই—তবে আপনাকে একটা জোর বক্তৃতা দিতে হবে জাতি-বৈষম্য সম্বন্ধে—আর আপনাকেও খেতে হবে ওদের সঙ্গে।

—আমি খাব!—সুবোধ মহা উৎসাহিত হয়ে উঠলো; বললো,—আমার

কলোনীর লোকরা আসবেন—ওঁদের অনেকেই হরিজন আছেন—চমৎকার প্ল্যান করেছ মোড়ল—তোমার মাথাখানা লক্ষ টাকায় বিক্রী হওয়া উচিৎ।

—এজ্ঞে, এ আর কি এমন। বেঁচে যদি থাকি আর বছর কতক, তো আপনাকে গভর্ণর করে আমি হব মন্ত্রী—মোড়ল হা-হা করে হাসতে লাগলো। সুবোধও হাসছে, হঠাৎ মোড়ল বললো—শুনেন, আর একটা কথা, ঐ যে সোস্যালিজম—সমাজতন্ত্র—মানে, ধনতন্ত্রের বিপরীত, ওর সঙ্গে গোটাকতক চমৎকার চমৎকার কথা বলতে হবে! কৃষক, প্রজা, মজদুর রাজ—শ্রেণী সাম্য, শিল্পকে জাতীয় কারণ—জীবনকে উপভোগ্য করণ,—ইত্যাদি—ভেবে রাখুন, কি কি বলবেন।

মোড়ল উপদেশ দিয়ে উঠে গেল। সুবোধ ভাবতে লাগলো,—আশ্চর্য্য এই লোকটার বুদ্ধি!—কোনো রাজার মন্ত্রী হলে রাজত্ব সে ভালই চালাতে পারতো। গত মন্বন্তরে ওরই সহায়তায় সুবোধ বহু টাকা কামিয়েছে। এখনো ব্ল্যাকমারকেট চালাচ্ছে ওরই সাহায্যে। লরীর ড্রাইভার এসে জানালো যে কলোনীর লোকদের এবার আনতে যাবে কি না। সুবোধ পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখলো বেলা সাড়ে পাঁচটা—বললো,

—দু'খানা লরী দুটো ট্রীপ দেবে; কিন্তু আমাদের একজন যাওয়া দরকার ওঁদের অভ্যর্থনা করে আনবার জন্য। কে যাবে?—সুবোধ এক সেকেণ্ড ভেবেই উঠে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল,

—সেঁজুতি! তুই যা-না লক্ষ্মীটি, ওঁদের অভ্যর্থনা করে আন গিয়ে। যাকে তাকে তো আমি পাঠাতে পারি নে ওঁদের কাছে—তুই যা, নইলে আমাকেই যেতে হয়।

সেঁজুতি নীরবে গিয়ে লরীতে উঠলো। লরী চলেছে সুবোধের কলোনীর দিকে। নদীর কিনার ধরে রাস্তা। গাছের তলায় কে একটা মেয়ে বসে বসে কাঁদছে। সেঁজুতি গাড়ী থামাতে বললো। গাড়ী থেকে নেমে কাছে গিয়ে দেখলো রাণী—আশ্চর্য্য!

—রাণী!

—হ্যাঁ, দিদিমণি—দিদিমণি তুমি কোথায় যাবে? আমাকে বাবার আখড়ায় পৌঁছে দাও।

করুণ আবেদন—সেঁজুতি হেসে বললো—আয়, ওঠ গাড়ীতে। রাণী মহাউৎসাহে এসে উঠলো! গাড়ী চলে গেল কলোনীর দিকে।

সেঁজুতিকে পাঠিয়ে দিয়ে কিন্তু সুবোধের আফ্‌শোষ হতে লাগলো, কেন অতটা পরিশ্রম করতে পাঠালো ওকে! তাছাড়া, সোস্থালিজম কিম্বা ছুৎমার্গ সম্বন্ধে বক্তৃতার কথাগুলো সে সেঁজুতির কাছ থেকেই শিখে নিতে পারতো। ও চমৎকার বলতে পারে ওরকম কথা। কিন্তু স্বাহা আছে। সুবোধ স্বাহার কাছে গিয়ে দেখলো,—তমাল গাছতলার বেদীতে স্বাহা লিখছে—

"হে অগ্নিহোত্রী, তোমায় নমস্কার!"
"সুরলোকে বেজে উঠে শঙ্খ, নরলোকে বাজে জয় ডঙ্ক
এলো মহাজন্মের লগ্ন—
আজি অমারাত্রির দুর্গ তোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন!"

—বাঃ সুন্দর লিখেছো বৌদি!—সুবোধ গিয়ে সপ্রশংস ধ্বনি করলো! আমার মাথায় এসব কথা কিছুতেই আসে না বৌদি আজকার সভাতে কিছু বলতে তো হবে আমায়? কি বলা যায়, বলোতো?

—বলবার বা লিখবার ক্ষমতাটা ঈশ্বরদত্ত ঠাকুরপো—তবে অভ্যাসের দ্বারাও কিছু কিছু বলা সম্ভব। বলতে চেষ্টা কর, ঠিক বলতে পারবে।

—দু-একটা ভাল কথা শিখিয়ে দাও!

স্বাহা হাসলো, বললো,—কথা মাত্রই ভালো, যদি ভালো অন্তর দিয়ে তাকে উচ্চারণ করা হয়। মানুষের আত্মার শক্তি সব সময়েই অগ্নিধর্মী—ঠাকুরপো, তার গতি উর্দ্ধদিকেই। নিজকে জল-ধর্ম্মী ভাবছো কেন? জলের গতি নীচু

দিকে—কিন্তু মানুষ এই শত শতাব্দি ধরে উর্দ্ধগতির উন্নতিপথেই এগিয়ে এল। মানুষের অগ্রগতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, তার সাহিত্য, তার ভাষা, তার কথা বলার শক্তি। তুমি যখন সেই অগ্রগামী মানুষের বংশধর, তখন কথাকেও অগ্রগামী করতে পারবে—কথা বলবার সময় নিজকে মানুষের সত্যে ধৃত রেখো, মানুষের কথাই বোলো।

বেশ লাগছিল সুবোধের, কিন্তু একজন এসে খবর দিল—কলকাতা থেকে দু'খানা মোটর এসেছে। উৎপলা দেবী, লকু এবং আরো কয়েকজন এসেছেন তাতে। স্বাহা আর সুবোধ তাড়াতাড়ি উঠে গেল ওদের অভ্যর্থনার জন্য!

বিরাট জন-সমাবেশ;—এদেশের মানুষ কখনো দেখেনি এমন উদ্দীপনা। সংকর্ষণের স্মৃতি উদযাপন শুধু নয়, সহস্রাব্দি পরে ভারতভূমি স্বাধীন হচ্ছে—বিদেশী বণিকের শোষণ থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে—এ উদ্দীপনা তারই অভিব্যঞ্জনা। দলে দলে এখনো আসছে লোক 'বন্দেমাতরম্' আর 'জয় হিন্দ্' ধ্বনি করতে করতে। ভারতের ইতিহাসে এ দৃশ্য অভিনব।

সেঁজুতি লরীবোঝাই করে কলোনীর লোকদের সঙ্গে রাণীকেও আনলো। সুবোধ ওকে প্রায় চেনেই না; কিন্তু স্বাহা সস্নেহে গ্রহণ করলো ওকে। সেঁজুতি নিজের জন্য আনা খদ্দরের গৈরীক বর্ণ শাড়ীখানা পরিয়ে দিল। কিন্তু রাণী এখনো জলস্পর্শ করে নি। সে বললো, বাবার পায়ে ফুল না দিয়ে সে জলগ্রহণ করবে না! এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলো রাণী নিশ্চুপে। ওর উপবাস-ক্লিন্ন মুখকান্তিতে অতীত যুগের পবিত্রতা। ও ঠিক ঋষিকন্যার মত যেন বলছে—

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনেমি—ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ!

এ সভাটা সংকর্ষণের স্মৃতিপূজার সভা—পতাকা উত্তোলনের সভা হবে, কাল সকালে মণ্ডলের ঘরে একদফা এবং সুবোধের গৃহপ্রাঙ্গনে হবে আর একদফা। সভা হবার কথা সাড়ে ছয়টায়—আরো মিনিট দশ দেরী রয়েছে। মণ্ডল

মশাই পুরো দস্তুর খদ্দরে ভূষিত হয়ে পৌঁছালো। লোকাধীশ শুধু ভ্রূকুটি করলো একবার। কিন্তু মণ্ডল মশাই এসেই তীক্ষ্ণ তীর্যক দৃষ্টিতে দেখে নিল সভাটা—তারপর বেদীর কাছে সরে এল যেখানে স্বাহা, সেঁজুতি, উৎপলা, শুভ্রা, কৃষ্ণা এবং সুবোধ, লকু আর কলোনীর বিশিষ্ট কয়েকজন রয়েছেন। কয়েকটি মেয়ে গান আরম্ভ করলো—'জনগণ মন'

এইবার বেদীতে অর্ঘ্য অর্পণের জন্য প্রথম কার নাম প্রস্তাব করা হবে! সুবোধের ইচ্ছা, প্রস্তাবটা সেই করবে এবং উৎপলার নাম প্রস্তাব করবে, কিন্তু মণ্ডল ওর কানে কানে বললো—প্রস্তাবটা আমিই করি—আমি এই গ্রামের অধিবাসী!—সুবোধের সম্মতির অপেক্ষা না করেই মণ্ডল উঠে দাঁড়ালো, তারপর আরম্ভ করলো,

—ভারতজনীর সমবেত সন্তানগণ,—

অগ্নির পথ বেয়ে আমাদের যে অগ্রজগণ আমাদিকে আজ স্বাধীনতার সিংহদ্বারে পৌঁছে দিলেন, তাঁদেরই একজন এইখানে, এই শ্যাম-তমালকুঞ্জে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন—সে নিঃশ্বাস অগ্নিস্রাবী আহিতাগ্নি, সে মৃত্যু বীরের—চির বাঞ্ছিত যুদ্ধ-মৃত্যু! সেই আমাদের মহাবিপ্লবী, মহারথী নেতা-সংকর্ষণের সর্ব্বশেষ ক্ষণ পর্য্যন্ত যে মহীয়সী নারী তাঁর সেবাধিকার লাভ করে ধন্য হয়েছেন—আজকার এই পরম লগ্নে তিনি এখানে উপস্থিত হয়েছেন—ঐ গৈরিকবাসা তপস্বিনী। কন্যারূপে যিনি নেতা সংকর্ষণের শেষ কৃত্য সম্পন্ন করেছেন তিনিই। আমি মনে করি—মহানেতা সংকষণের পাদমূলে অর্ঘ্যদান করবার সর্ব্বপ্রথম অধিকার তাঁরই! ঐ অবহেলিতা, উপেক্ষিতা, রজককন্যা আজ শুধু আমাদের শ্রদ্ধার পাত্রীই নন—আজ উনি আমাদের নমস্যা দেবী। আশা করি আপনারা সকলেই আমার প্রস্তাব সমর্থন করবেন! নেতা সংকর্ষণ ওঁর হাতে খাদ্যপানীয় গ্রহণ করে ওঁকে ধন্যা করেছেন—আজ আমরাও ওঁর পরিবেশিত অন্ন গ্রহণ করে জীবন ধন্য করবো!

—অমরা সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করি—সমর্থন করি—চতুর্দ্দিক থেকে ধ্বনি

উঠলো,—তার সঙ্গে জয়-হিন্দ্ আর বন্দেমাতরম্। রাণী থরথর করে কাঁপছে। একি ব্যাপার তাকে নিয়ে! কিন্তু উৎপলা আর স্বাহা সাদরে ওকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য দেবার জন্য!

সুবোধ ক্রুদ্ধ হতে গিয়েও প্রশংসা করতে বাধ্য হচ্ছে মণ্ডলের মাথাটার। উঃ! মণ্ডল যদি ভাল লেখাপড়া জানতো, তো, সত্যি ও মন্ত্রী হতে পারতো। কিন্তু সুবোধ নিজের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলো! এতো নির্ব্বোধ সে! এমন একটা নাম করবার সুযোগ সে আহাম্মুকী করে হারালো? ছিঃ! কিন্তু ও সামলে নিল। মণ্ডলের প্রস্তাব ভাল করে সমর্থন করবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে আরম্ভ করলো—

'জননী ভারতের জাগ্রত জন-সঙ্ঘ':—আরম্ভটা ভালই হয়েছে, নিজে নিজেই উৎসাহিত হয়ে উঠলো সুবোধ; বলছে,

"স্বাধীনতার এই নব-প্রভাতে (কিন্তু তখন সন্ধ্যা আর স্বাধীনতা রাত বারটার পর আসবে—কেউ কোনোদিকে হাসছে নাকি?) আগামী প্রভাতে যে নবীন সূর্য্য উঠবেন আমাদের আকাশে, সে সূর্য্য স্বাধীন ভারত-মাতাকে আলোকিত করবেন—কিন্তু সেই স্বাধীনতা যাঁরা এনেছেন—নেতা সংকর্ষণ তাঁদের পুরোভাগে। আজ সংকর্ষণের স্মৃতিবাসরে তাঁর চির পূজারিণী রাণীদেবীর প্রথম পুষ্পার্ঘ্যদান-প্রস্তাব আমি সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করি"—সুবোধ বসে পড়লো। বেশী কিছু বলতে ওর ভয় করছে, যদি বেফাঁস কিছু বলে ফেলে, এই আশঙ্কা।

উৎপলা রাণীকে টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললো কয়েকটি কথা,

—আজ আমাদের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য সেই অগ্নিযুগের ঋষি-কুমারদের পূজা করা। নেতা সংকর্ষণ সেই মহাযজ্ঞে একজন ঋত্বিক—এবং রাণীদেবী তাঁর শ্রেষ্ঠা পূজারিণী—। ঐ মহানেতার চরণমূলে প্রথম অর্ঘ্য দেবার অধিকার তাঁরই—আমি তাঁকে অর্ঘ্য দিতে অনুরোধ করি।

কিন্তু রাণী কি বলবে? কি মন্ত্র বলে সে দেবে তার দেবতার চরণমূলে এই

পুষ্পমাল্য ? অভাগী রাণীকে নিয়ে কেন এই হাস্যকর ব্যাপার করছেন এঁরা ? কিন্তু রাণী আত্ম-সম্বরণ করলো, ওর চোখের জল আলোর মত জ্বলছে। বললো,

—আমার ভাইরা আর বোনেরা, বাবার পায়ে ফুল দেবার যুগ্যি আমি কখনও নই, তবু আপনারা আমাকে দয়া করে ফুল দিতে বলছেন—আমি আমার চোখের জল দিয়েই এতকাল বাবার পূজো করেছি—আজ ফুল দিব আমার চোখের জল মিশিয়ে। আমি ধোপার মেয়ে—বাবা তাই বলতেন আমাকে,—'যে তোর কাছে আসবে তার মনের ময়লা পরিষ্কার করে ধুয়ে দিস রাণী-মা—তোর কাছ থেকে যেন কেউ ময়লা মন নিয়ে ফিরে না যায়।' আমার ভাইরা-বোনরা—আপনাদের মনের গঙ্গাজল দিয়ে আজ বাবার পূজো করুন, দেশমায়ের পূজো করুন—দেশনেতাদের পূজো করুন—দেশের মানুষের পূজো করুন, সেবা করুন দেশের সকলের। বাবার শেষের কথাটাই আপনাদের আজ বলি—উনি বলেছিলেন, 'রাণীমা,এই তমাল তলার নির্জন ছায়ায় আমি তোর কোলে মাথা রেখে মরলাম, কিন্তু যার জন্য আমরা মরলাম সে একদিন আসবেই—তার নাম স্বাধীনতা। যে-দিন সে আসবে, সে-দিন তুই যতখুসী কাঁদিস আমার জন্য—আজ নয়—আজ তোর চোখে আগুন জেলে রাখ।' আজ সেই স্বরাজ এসেছে : ভাইসব, বোনসব, আজ আমার বাবার জন্য কাঁদবার দিন…!

ঝর ঝর জল ফুলের উপর পড়ছে রাণীর গালবেয়ে। থরকম্পিতা রাণীর হাতের ফুল ধীরে ধীরে পড়তে লাগলো রক্তবস্ত্রাবৃত বেদীর উপর! সমবেত জনসঙ্ঘ নির্ব্বাক হয়ে রয়েছে—পূজারিণী রাণী প্রদীপশিখার মত কাঁপছে।

সেঁজুতি আর কৃষ্ণা শাঁখ বাজিয়ে দিল। শুভ্রা, উৎপলা, স্বাহা জয়ধ্বনি করলো। তারপর হোল বড় বড় বক্তৃতা,—বহুবিচিত্র কথার গাঁথুনী—বহু ছন্দোবদ্ধ কবিতা, কিন্তু যাঁরা সেখানে ছিল, তারা সকলেই অনুভব করলো—রাণীই সত্যি পূজো করেছে, অর্ঘ্য দিয়েছে।

অতঃপর রাণীকেই পরিবেশন করতে হবে। অবশ্য পরিবেশক বিস্তর

আছেন—শুধু অস্পৃতা-বর্জ্জনের জন্য রাণীর পরিবেশন করা দরকার। করলো রাণী। কোথা থেকে যে ও শক্তি লাভ করলো, কে জানে—কিন্তু সে পংক্তিতে পংক্তিতে ঘুরে খিচুড়ী পরিবেশন করলো। ওর সঙ্গে আরো কয়েকটি হরিজন-কন্যা যোগ দিয়েছিলেন।

—সর্ব্বাগ্রে এই অস্পৃশ্যতাকে বর্জ্জন করতে হবে আমাদের। এইটাই জাতিকে দুর্ব্বল করছে। সুবোধ বলেছিলো—জাতিত্ব কি আবার! ব্রাহ্মণ, শুদ্র, কায়স্থ, মুচি, নমশূদ্র কিছুই থাকবে না আমাদের মধ্যে; আমরা শুধু, সুবোধ, অবোধ, হরি, যদু, রাম, শ্যাম! জাতিগত উপাধীকে সকলের আগে বর্জন করা দরকার আজ।

কথাটা কাগজ থেকে ধার করা, তবু সুবোধ ঘনঘন হাত-তালি পেয়েছে ঐটা বলে, কিন্তু মণ্ডল আর এককাঠি উপরে উঠে বললো, যে, শুধু হাতে খাওয়াই নয়,—পরস্পরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন না হওয়া পর্য্যন্ত স্বাধীন ভারতের চল্লিশকোটি সন্তান নিরস্ত হবে না। শ্রেণীগত ঐক্য, জাতিগত ঐক্য, ধনগত সাম্য এবং ধর্ম্মগত মিলন যতক্ষণ না প্রতিষ্ঠিত হবে, ততক্ষণ কিছুই হোল না বলতে হবে। আমরা সকলেই মানুষ, এবং সকলেই ভারত-মাতার সন্তান—'সবার উপর মানুষ সত্য' অতএব আমাদিগকে সত্য মানুষ হতে হবে—মানুষের সত্যতায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

ঘনঘন করতালি আর হুহুঙ্কার পেল মণ্ডল। আজকার মত সকলে বাড়ী যাবে, শুধু রাণী বললো সকলকে করযোড়ে—

আজকার রাতটা আমাকে এখানেই থাকতে দাও—তোমরা যাও সব!

স্বাহা এক মিনিট ওর মুখপানে চেয়ে বললো,

—আমি মেয়ে হলেও তুই-ই ওঁর মানসকন্যা, থাক।

ওরা সকলে চলে গেল রাণীকে রেখে।

পুরোনো পাঁজিটাই উল্টে দেখবে,—সে বরং বেশ হবে। কিন্তু নিতান্তই ছোট ওর জীবন—ঘটনা মাত্র দুতিনটির বেশী নয়—দূর ছাই! ওতে আবার ভাববার মত কি আছে!

আবার শুলো কাবেরী! কিন্তু ভাববার মত কিছু কি নেই ওর জীবনে? আছে! ঐ যে লোকটি, যে একদিন কাবেরীকে সসম্মানে বাড়ী পৌঁছে দিয়েছিল গুণ্ডার হাত থেকে রক্ষা করে—যে একদিন নির্ব্বিচারে ফেলে চলে গেল কাবেরীর বাবার বিপুল সম্পত্তির সঙ্গে কাবেরীর অন্তঃসলিল অনুরাগ—সেই যে কাবেরীর জীবনে এক মহা সমস্যা! কিন্তু সে তো চলেই গেছে। তার কথা ভেবে আর লাভ কি কাবেরীর? তার চেয়ে মলয়ের কথা ভাবলে কাবেরীর বাবা খুসী হবেন।

মলয়ের কথা ভাবতে হয়তো বাধ্য হতে হবে কাবেরীকে। হয়তো অনতি-বিলম্বেই সে-ভাবনা বিবাহ-বন্ধনের নৈতিকতায় এসে আদেশ করবে তাকে মলয়ের কথাই ভাববার জন্য—পৃথিবীর আর কারো জন্য নয়। তার আগে যেটুকু সময় আছে, সেটুকু সময় সে স্বাধীনা—অতএব মলয়ের কথা এখন থাক।

কিন্তু যার কথা সে ভাবতে চাইছে, সে কোথায়, কত দূরে—কিছুই জানা নেই। সেই শ্মশানে শেষ দেখা…তারপর কে জানে, সে কোন্ শবসাধনায় নিযুক্ত হয়ে কোন্ মৃত্যুঞ্জয়-মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করছে!

হয়তো ইহজীবনে আর দেখাই হবে না, কিম্বা হবে দেখা—যেদিন আর কাবেরীর অধিকার থাকবেনা তার কথা ভাববার, তার কথা শোনবার, তার পানে চাইবার! কিন্তু তা কেন হবে! সে তো দেশসেবক, সে বীর, সে সৈনিক! ভারতব্যাপী আজকার এই বীরপূজার দিনে কাবেরীরও নিশ্চয় অধিকার থাকবে তাকে পূজা করবার, প্রণাম করবার, হোক না সে মলয়ের স্ত্রী:—না, মলয়ের স্ত্রী কেন সে হতে যাবে? বাবার যতই ইচ্ছে থাক, মা ওটা হতে দেবে না—জানে কাবেরী। কিন্তু—মা তো বলেছে, "যাকে ভালবাসিস তাকেই বিয়ে করা উচিত"—তাহলে? তাহলে সেই সন্ন্যাসীকে সংসারী করবার সাধনাই কি করবে কাবেরী সারাজীবন! কেমন করে করবে? পৃথিবী যে বড় বেশী বাস্তববাদী!

উঠে বসলো কাবেরী আবার; ঘর থেকে বেরিয়ে এলো বারান্দায়! কৃষ্ণা ছিল পাশের ঘরটাতেই—হয়তো কাবেরীর পায়ের সাড়া পেয়েই জেগে বললো,

—কে ? ওমা ! আপনি ঘুমুন নি ?—

—ন্-না ! ঘুম আসছে না ভাই ! চলুন না, একটু বেড়িয়ে আসি।

কৃষ্ণা পল্লীর মেয়ে। এমন ভোর রাত্রে বেড়াতে বেরুবার মত দুরন্ত সখ তার নেই, কিন্তু কাবেরীর কণ্ঠস্বর যেন করুণ। কৃষ্ণা উঠে এসে বলল সস্নেহে,

—কলকাতার মানুষ, পাড়াগাঁয়ে ভূতের ভয় করছে ? আসুন, আমার ঘরে শোবেন। কিন্তু কৃষ্ণা ভোর রাত্রির তরল আঁধারে দেখতে পেল—কাবেরীর চোখে কাবেরীর জলধারা।

—কি হয়েছে কাবেরী দিদি ? ও শুধুলো।

কিন্তু কাবেরী কোনো কথা না বলে ধীরে নামতে লাগলো সিঁড়ি দিযে। অগত্য কৃষ্ণাও ওর পিছনে চললো।

'নিশী'তে পেয়েছে নাকি মেয়েটাকে ! কৃষ্ণা ভাবতে ভাবতে আসছে। রাত্রিশেষের বাতাসে যেন উৎসব-জাগানো উল্লাস কিন্তু কাবেরীর চোখে ও কিসের উৎস ? কিসের উচ্ছ্বাস ?

রাত্রির অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে ছুটে আসছে ট্রেণখানা। কয়েকটা ষ্টেশন আগেই অজয় নেমে গেছে : তার বাড়ী সেখান থেকে কাছে পড়ে। ইন্দ্রজিৎ একা ; কিন্তু গাড়ীর কামরায় আরো অনেক লোক—কারো সঙ্গে আলাপ করেনি ইন্দ্রজিত।

একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ী এসে দাঁড়ালো—বিচিত্র সজ্জা ষ্টেশনটার…পত্র-পুষ্পে আকীর্ণ ! বড় ঘরখানার চূড়ায় জাতীয়পতাকা টানাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে…মহোৎসাহে মত্ত লোকগুলো উচ্চকণ্ঠে বলছে, 'বন্দেমাতরম্—জয়হিন্দ্ ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা।'

আজ ১৪ই আগষ্ট—বহু কষ্টার্জিত স্বাধীনতার পূতঃ পবিত্র উদয়ক্ষণ ! ইন্দ্রজিত জননী ভারতের চরণোদ্দেশে নমস্কার জানালো…বন্দে—বন্দে—মাতরম্…মাতরম্ বন্দে !

গাড়ী আবার চলতে লাগলো—গভীর অন্ধকারময় রাত্রি—এখনো আসেনি স্বাধীনতা, তাই অন্ধকার। এই রাত্রিরূপা জননীর গর্ভ থেকে প্রসূত হবেন স্বাধীনতা-সূর্য্য—প্রসূতি রাত্রি জননীকে নমস্কার ! অথা নঃ সুতরা ভব—শুভঙ্করী হও মাতা রাত্রিদেবি। রেলপথের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম থেকে সঙ্কীর্ত্তন, সঙ্গীত ভেসে এলো, তার সঙ্গে শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি…বন্দেমাতরম্ ! গাড়ীর সমস্ত

লোক মুহূর্তে উচ্চকিত হয়ে উঠলো যেন···সকলেই যেন রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছিলো এই মহাক্ষণটির—বন্দেমাতরম্‌ !!! ট্রেণের প্রত্যেক যাত্রীর মুখ থেকে উল্লাসধ্বনি বের হোল—ইন্দ্রজিতেরও।

আনন্দম্‌! দীর্ঘ—সুদীর্ঘ দিন পরে এই বিপুল আনন্দ ভারতের মানুষ আজ ধরতে পারছে না তার রোগজীর্ণ, তৃষাদীর্ণ বুকে—তার শোনিত-ক্ষরিত, শোকতপ্ত অন্তরে! ইন্দ্রজিত আবার নমস্কার করলো—অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু!

গাড়ী চলেছে;—দুপাশের অগন্য পল্লীর উৎসবকল্লোল আকাশ-বাতাসকেও উৎসবময় করে তুলেছে—রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত। ইন্দ্রজিত এসে পৌছাল সেই ছোট ষ্টেশনটায়, যেখানে নেমে ওর সঙ্ঘগুরুর আশ্রমে পৌছাতে হবে। হেঁটেই চলে যাবে ইন্দ্রজিত, কিন্তু বহুলোক এই ছোট ষ্টেশনে—কেউ এই গাড়ীতে উঠলো। কেউ বা ডাউন গাড়ী ধরবার জন্য অপেক্ষা করছে। এত ছোট ষ্টেশনে কেন এত লোক? ইন্দ্রজিত একজনকে শুধুলো—এখানে কি মেলা ছিল নাকি?

—আজ্ঞে না, এখানে আজ নেতা সকর্ষণ-দিবস হোল—সেখান থেকেই আসছি আমরা!

"নেতা সঙ্কর্ষণ দিবস!" ইন্দ্রজিতের মনে পড়ে গেল সেই বৃদ্ধের চিতাশয্যা—জবা ফুলের রস নিংড়ে পদচিহ্ন তুলে নেওয়া—সেই স্বাহা, সেঁজুতি, কাবেরীর কথা! ওঃ—ইন্দ্রজিত ওদের কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলো! কিন্তু নেতা সংকর্ষণের কথা ভোলা কি তার উচিৎ হয়েছে! ধিক তাকে! ইন্দ্রজিত আর কোনো কথা না বলে, সটান হাঁটতে লাগলো গ্রামের দিকে, যেখানে আছে সংকর্ষণের ভিটা। মাঠের পথে আসছে ইন্দ্রজিত; রাস্তা ওর চেনা, কিন্তু দু'পাশে ধান ক্ষেতগুলি নতুন ধানের চারায় ভর্ত্তি হয়ে রয়েছে—অন্ধকারে ভাল দেখা যাচ্ছে না—ক্ষেত থেকে ক্ষেতে জল গড়িয়ে যাবার কুলকুল ধ্বনিটাই কিন্নরকণ্ঠী বর্ষারাণীর সঙ্গীতের মত কানে আসছিল—উনিও যেন আজ উৎসব করছেন—স্বাধীনতার উৎসব!

ইন্দ্রজিত প্রকাণ্ড প্রান্তরটা পার হলে, তারপর আমবাগান, তারপরই গ্রাম; আর দূর নাই, এসে পড়েছে প্রায়। প্রান্তরটায় বিস্তর রক্তকরবী গাছ, ওর মাঝ দিয়ে গ্রামে যাবার পথ। অন্ধকারে ভাল দেখতে না পেলেও ইন্দ্রজিত বুঝতে পারলো, প্রত্যেকটি করবী গাছে গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকুসুম ফুটে রয়েছে—

মাতা ধরিত্রীর হৃদয়-শোণিত বুঝি—কিম্বা অনন্ত শহীদের বক্ষরক্ত ঐ ফুল। না—না—আজ উৎসবের দিন,—মৃত্তিকামাতা উৎসবের হোমাগ্নি জ্বেলেছেন ঐ রক্তকরবীর শিখায় শিখায়—ইন্দ্রজিত স্পর্শ করলো সেই সুপবিত্র হোমশিখা! ললাটে লেপন করলো সেই আহুতির অক্ষয় তিলক!

কিন্তু ওঁকেও দিতে হবে—নেতা সংকর্ষণকে। ইন্দ্রজিত একটা বুনো কচুপাতা ছিঁড়ে ঠোঙ্গা বানালো, তারপর সযত্নে তুলে নিল রক্তকরবীর আহিতাগ্নি।"

ওর অন্তর ভরে গান বেজে উঠছে—"আজি এসেছো ভুবন ভরিয়া......"

চলেছে ইন্দ্রজিত নেতা সংকর্ষণের ভিটার উদ্দেশে। অন্ধকার—কিন্তু অন্ধকার তো থাকবে না আর। আগামী প্রভাতের সূর্য্য তো স্বাধীন হয়েই উঠবেন—আজকার রাত্রিমাতাও তো আর বন্দিনী নেই—অগণ্য সন্তান তাঁর আজ মুক্ত, স্বাধীন! উল্লাসের শঙ্খধ্বনি ভেসে এলো কোন্ দূর গ্রাম থেকে—শানাই, শঙ্খ, ঢাক-ঢোল; হাওয়াই এর হাসি, তুবড়ীর কাকলি, ফানুসের আকাশ-অভিযান... এখনো চলছে উৎসব, চলবে—শত শত শতাব্দি ধরে চলুক এই উৎসব, আজ রাত্রি দ্বিপ্রহরে যে উৎসব আরম্ভ হোল মরণোত্তর ভারতের মৃত্তিকায়।

হাতযোড় করে ইন্দ্রজিত প্রার্থনা করতে চাইল, কিন্তু হাতে তার রক্তকরবীর অঞ্জলি। কিন্তু প্রার্থনা আবার করবে, শতশত বার করবে প্রার্থনা। ইন্দ্রজিত হাঁটতে লাগলো; বাঁ'দিকে নদী, রেলের সেই ব্রিজটা—একখানা গাড়ী ঝমঝম্ শব্দে পার হয়ে গেল—শব্দটাও যেন 'জয়হিন্দ' বলছে। আকাশে বাতাসে আজাদ—বিরাট ব্যোম্ ব্যাপ্ত করে বাজছে "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত, নদীপ্রান্তর পার হয়ে পর্ব্বতভূমিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে "জয়হিন্দ" জয়ধ্বনি!

নদীকূলে শিবাগণ একসঙ্গে চীৎকার করে উঠলো,—হুক্কাহুয়া—হবে জয়, জয় হবে—হয়েছে! চল্লিশকোটি মানবসন্তান আজ জয়লাভ করেছে স্বরাজ-সংগ্রামে। রক্তপাতে নয়,—ধ্বংসের জঘন্যতায় নয়, বিপ্লবের বহ্নিতে নয়,—আলাপে আলোচনায় বন্ধুত্বের মধ্যে দিয়ে আজ অর্জিত হোল স্বাধীনতা—স্বরাজ্য! পৃথিবীর এই বিস্ময়কর সত্যকে যিনি রূপ দান করলেন—ইন্দ্রজিৎ আজ বুকের সমস্ত উচ্ছ্বাস দিয়ে একবার তাঁর নাম উচ্চারণ করে ধন্য হবে—

—মহাত্মা গান্ধীজীকি জয়!—ইন্দ্রজিত উচ্চৈস্বরে উচ্চারণ করলো।

হুক্কাহুয়া—সমবেত কণ্ঠের শিবারব! ওরাও বুঝি আজ উসব করছে!

শ্মশানে সমবেত হয়েছে সকলে! ওরা হয়তো অর্ঘ্য দিচ্ছে শত শত শহীদের আত্মার উদ্দেশে—তর্পণ করছে ভারতের বীর সৈনিকদের মৃতাত্মার।

মৃতাত্মার! না, ওঁরা কোনদিন মরবেন না। যুগের ইতিহাসে ওঁরা অমর, ওঁরা মৃত্যুঞ্জয়:—ইন্দ্রজিত থামলো ওঁদের উদ্দেশে নতি জানাবার জন্য। শৃগালের কণ্ঠে আবার জয়ধ্বনি! ওখানে গেলে হয় না—ঐ শ্মশানে! ওখানেইতো নেতা সংকর্ষণকে রেখে এসেছিল ইন্দ্রজিত—। ঐখানেই তিনি আছেন—কেউ হয়তো ওখানে যান নি, ইন্দ্রজিত যাবে; কিম্বা সকলেই হয়তো ওখানেই গিয়েছেন, ইন্দ্রজিতও যাবে।

ইন্দ্রজিত শ্মশানের পথ ধরলো। ধানক্ষেতের সরু আল-পথ; অন্ধকার। কিন্তু ইন্দ্রজিতের গতিশক্তিও আজ দুর্বার; সে চলে এলো নদীতীরে শ্মশানে।

অগণিত চিতার অঙ্গারে পরিপূর্ণ শ্মশানভূমি—ইন্দ্রজিত অন্ধকারে ঠিক করতে পারছে না, কোনটায় নেতা সংকর্ষণের নশ্বর দেহকে অগ্নিতে অবিনশ্বর করা হয়।—নাইবা চিতা চিনতে পারলো ইন্দ্রজিত, এখানে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা সকলেই তো এই দেশমাতার সন্তান—সকলেই ইন্দ্রজিতের আত্মীয়। আজকার স্বাধীনতা লাভের এই মহামহেন্দ্রক্ষণে ওঁদের সকলকেই নমস্কার জানানো উচিৎ। ইন্দ্রজিত সমস্ত শ্মশানভূমি প্রদক্ষিণ করে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলো,

—'আজ এই জন্মভূমির স্বাধীন মৃত্তিকায় তোমাদের পবিত্র আত্মার পূর্ণ তৃপ্তি লাভ হোক—হে সহস্রাব্দির মৃত সৈনিকদল—এই মহাকুরুক্ষেত্রের যজ্ঞ-ভূমিতে,—আমি তোমাদের বংশধর,—তোমাদের উদ্দেশে অর্ঘ্য অর্পণ করি—গ্রহণ করো। গ্রহণ করো পলাশীর প্রান্তরে মৃত সৈনিকগণ, সিপাহীবিদ্রোহের শহীদগণ, বিপ্লব-যজ্ঞের মৃত পুরোহিতগণ—আগষ্ট-বিদ্রোহ, আজাদ-হিন্দ দলের মৃত্যুমহিমান্বিত অমরগণ—আমার পুষ্পার্ঘ্য গ্রহণ করো! গ্রহণ করো!! গ্রহণ করো!!!

ইন্দ্রজিত যেন অসীম তৃপ্তি লাভ করছে। সমস্ত শ্মশানভূমি বারম্বার ঘুরে ঘুরে সে ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করে ফিরতে লাগলো হাতের ফুল ছিটিয়ে; কিন্তু নেতা সংকর্ষণের ভিটেতেও একবার যাওয়া দরকার। আত্মবিস্মৃত ইন্দ্রজিত যেন সম্বিত পেল রাত্রি শেষের পাখীর কাকলিতে। দূরের প্রকাণ্ড শিমূল গাছটায় পাখী ডাকছে—"জয় হিন্দ......"। ধীরে ধীরে আবার গ্রামের পথ ধরলো ইন্দ্রজিত। তখনো ভোর হতে দেরী আছে, তবে আলোর আভাস জেগেছে

পূর্ব্বাকাশে—ইন্দ্রজিত পথের ধারে ফোটা জবা, আকন্দ, অপরাজিতা ফুল তুলে নিল আবার একটা কচু পাতার ঠোঙায়।

বিরাট শ্বেত পর্ব্বতের মত ষাঁড়টা দাঁড়িয়ে রয়েছে পথ আগলে। ইন্দ্রজিত ওকে চেনে; ঐ চক্র-ত্রিশূল চিহ্নিত ধর্ম্মপিতাকে ভালই চেনে ইন্দ্রজিত। সর্ব্বাগ্রে ওর দর্শনলাভ করে নিজকে সে ধন্য মনে করলো—নমস্কার করলো। ওর গায়ে, গলকমলে হাত বুলিয়ে আনন্দ-সম্ভাষণ জানালো ইন্দ্রজিত—

—আজ সব মধুময়, মধুর আকাশ বাতাস, মধুর সিন্ধু-সরিৎ, মধুর চন্দ্র-সূর্য্য-তারকা, মধুর আমাদের গো-সম্পদ, মধুর আমাদের মানব-সম্পদ, মধুর আমাদের শস্য-সম্পদ···

ওকে ছেড়ে ইন্দ্রজিত এসে উপস্থিত হোল সংকর্ষণের ভিটের দরজায়। প্রকাণ্ড সেই তমাল গাছটার শ্যামল পাতার তলায় রক্তবেদী; অন্ধকারে বর্ণ বৈচিত্র্য বা অলঙ্করণ অবশ্য ভাল দেখা যাচ্ছে না, তবু বোঝা যাচ্ছে: স্তূপীকৃতি পুষ্পে আচ্ছন্ন ঐ বেদী। ইন্দ্রজিত পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগলো স্তোত্র গেয়ে:—

"হে তপস্বী, ডাকো তুমি সামমন্ত্রে জলদ গর্জনে
'উত্তিষ্ঠত নিবোধত।' ডাকো শাস্ত্র-অভিমানী জনে
পাণ্ডিত্যের পণ্ড তর্ক হতে। সুবৃহৎ বিশ্বতলে
ডাকো মূঢ় দাম্ভিকেরে। ডাক দাও তব শিষ্যদলে—
একত্রে দাঁড়াক তারা তব হোম-হোমাগ্নি ঘিরিয়া,
আরবার এ-ভারত আপনাতে আসুক ফিরিয়া,
নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে—বসুক সে অপ্রমত্ত চিতে
লোভহীন, দ্বন্দ্বহীন, শুদ্ধ, শান্ত গুরুর বেদীতে॥"

ইন্দ্রজিতের চোখে জল, কণ্ঠের আবেগমাখা স্বর সঙ্গীতের মত! নিঃশেষে ফুলগুলি উজাড় করে দিল বেদীর উপর—এবার প্রণাম করবে—কিন্তু কে যেন ঐ বেদীর পাশেই আস্তে উঠে বসছে—কে ও? কে! মাতা-ধরিত্রীই নাকি? ইন্দ্রজিত নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে রইলো সেই শীর্ণা মূর্ত্তির পানে।

—দাদাবাবু!···তুমি এতো দেরী করে এলে দাদাবাবু?

—রাণী !—স্তম্ভিত ইন্দ্রজিতের নিশ্বাসটা ধীরে ধীরে বের হোল বুক থেকে।

—হ্যাঁ—দাদাবাবু ..আমি বাবার বেদী আগলে শুয়ে আছি। আরো অনেক লোক এসেছিলেন—ওঁরা সবাই মোড়লের বাড়ীতে শুয়েছেন গিয়ে। বলো দাদাবাবু, কি বলছিলে। বড় ভাল লাগছে! তোমার কথা এঁরা সব ভুলেই গিয়েছেন।

তা যান ; এঁকে তো ভোলেন নি! কত দূর দেশ থেকে, কত পান্থ আজ এই মহা-তীর্থে এসে মিলেছেন রাণী, আমাকে তাঁরা নাইবা মনে করলেন! আমিও একজন তীর্থযাত্রী। আয়, ভাইবোনে একসঙ্গে আজ প্রণাম করি—

রাণীর হাতধরে ইন্দ্রজিত তাকে কাছে টেনে আনলো, কিন্তু কে যেন আসছে—ধীর মৃদু তার গতি, যেন সঞ্চারিণী লতা—কে আবার আসে ?

—আমাকেও সঙ্গে নিন…!

—কাবেরী !—ইন্দ্রজিত অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো।

—হ্যাঁ—আমি এলাম : কে যেন আমাকে ডেকে আনলো।

—বেশ তো, এসো, কিন্তু কি জন্য ডাকলো ? শুনেছো ?

—শুনেছি ; রাত্রি জননী যেন বলছেন, 'আগামী প্রভাতে আমি স্বাধীন সূর্য্যকে প্রসব করবো—তোরা ঘুমাসনে, তোরা জেগে ওঠ, তোরা শাঁখ বাজা—সহস্র শরতের পরমায়ু দিয়ে তাকে বরণ কর।—'

কৃষ্ণা অচেনা ইন্দ্রজিতকে দেখে আড়ালে দাঁড়িয়েছিল, এতক্ষণে কাছে এল। পূর্ব্বদিক পানে চেয়ে দেখলো ওরা সকলেই—রাত্রিমাতার অঙ্গে অঙ্গে গৌরব-শোণিমা,—সবিতৃদেব প্রস্তুত হচ্ছেন! সেই আলোতে কাবেরী চাইলো ইন্দ্রজিতের মুখপানে, আর ইন্দ্রজিত চাইলো কাবেরীর কালো চোখের অন্ধকার আকাশের পানে।

কাবেরীর চোখের আকাশে ইন্দ্রজিতও সূর্য্যের মত উদিত হচ্ছে।

বিশ্বে নতুন আলো নামলো ; ওকে নমস্কার!